প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর—১৯৬০

প্রগতি প্রকাশনী ২৮এ পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীমতি আলোরানী পাত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ জয়তারা প্রেস ২৭বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে শ্রীজয়দেব আঢ্য কর্তৃক মুদ্রিত।

হাসপাতালের বিকেলের ভিজিটিং আওয়ার্সটুকু আমাদের ডিউটি ভারাক্রান্ত চাকরির সবচাইতে নির্ভার দায়মুক্ত যেমন খুশি খরচ করবার সময়। অবশ্যই মাত্র দু'ঘণ্টা। এসময় হাসপাতালের রোগীদের আত্মীয়স্বজনরা আসে দেখাসাক্ষাৎ করতে। জরুরী প্রয়োজনে ছাড়া এসময়টা আমরা প্রায় সকলেই নার্স কোয়ার্টারে চলে আসি। বয়স্করা চুপচাপ গা এলিয়ে বিশ্রাম করে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। যাদের বয়েস অল্প তারা হাসে, একে অন্যের সঙ্গে খুনসুটি করে, প্রাণের আনন্দে গা ধুতে ধুতে গলা ছেড়ে প্রেমের গান গায়, কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে মনের মানুষের চিঠি পড়ে, চিঠি লেখে, পরস্পর ঝগড়াঝাঁটিও করে। কেউ কেউ আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পিণ্ডি চটকায়। কত অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হয় একসঙ্গে কত পেশেন্টএর চাহিদা ঝুটঝামেলার মোকাবিলা করতে হয়। এত পরিশ্রমের কাজের বিনিময়ে যা মাইনে তাতে নিজের খরচই চলে না তার আবার বাড়িতে পাঠানো।

আমি কিন্তু বরাবরই এইসময়টা বিছানায় গা এলিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকি। আকাশপাতাল ভাবি। নিজের জীবনের কথা, চাকরীর উন্নতির কথা, সদ্যদেখা কোন সিনেমার গল্পের কথা আরো কত কী। কোন কোনদিন আধ পড়া কোন বই শেষ করি, পত্রপত্রিকা যা পাই পড়ি। আজকে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলাম। আজকে কেন জানি খুব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। পূর্ব বাংলার যে শহরে ছোটবেলা কেটেছে সেখানকার রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি লোকজন, বান্ধবীরা। সেইসব বান্ধবীরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে এসব সাত পাঁচ ভাবছিলাম। একটি অল্পবয়সী নার্স নার্স এসে ডাকল—

—সন্ধ্যাদি তোমার ফোন এসেছে।

—কোত্থেকে? আমি চোখ না খুলেই বললাম!

—হাসপাতাল থেকে। অগত্যা উঠতে হল। ভগবান জানে হয়তো কোন অপারেশনের কেস। রাতটা বোধহয় অপারেশন থিয়েটারেই কাটবে। হয়তো কোন স্পেশাল ডিউটি। এসব ভাবতে ভাবতে কোয়ার্টারের বারোয়ারী

ফোনটা গিয়ে ধরলাম। তারের ওপার থেকে হাসপাতালের টেলিফোন অপারেটর বলল—ডাঃ খাসনবীশ আপনাকে ডাকছেন। আপনি এখুনি তাঁর রুমে আসুন।

আটপৌরে পোষাক ছেড়ে নার্সের ধড়াচূড়া পরে চললাম হাসপাতালে। জরুরী তলব। তেতলায় ডাঃ খাসনবীশের ঘর। উনি ফিরেছেন জানতাম। প্রায় এক সপ্তাহ উনি এখানে ছিলেন না। ভুবনেশ্বরে এক মেডিকেল কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। গতকাল ফেরার কথা ছিল।

দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে ডাঃ খাসনবীশের ভারী গলা শুনলাম—কাম ইন। স্প্রীংগের ঠেলে ঘরে ঢুকলাম, উনি ফোনে কথা বলছিলেন। আমাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরটা দেখতে লাগলাম। ডাঃ খাসনবীশ আমায় মতই ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখা পছন্দ করেন। বেশ সাজানো গোছানো ঘরটি। জানালা দরজায় ভারী নক্সা আঁকা পর্দা। জানালায় টবের সারি। টেবিল চেয়ার ঝকঝকে পরিষ্কার। ফোন নামিয়ে ডাঃ খাসনবীশ আমার দিকে তাকালেন—

—বলুন মিস বিশ্বাস কাজকর্ম কেমন চলছে।

—ভালই স্যার।

—হুঁ। একটু চুপ করে থেকে বললেন-দেখুন আপনাকে একটা বিশেষ প্রয়োজনে ডেকে পাঠিয়েছি। অনেকদিন তো কলকাতায় হৈ হট্টগোলের মধ্যে আছেন। যান না কিছুদিন উড়িষ্যায় ঘুরে আসুন। উড়িষ্যা-এল্যান্ড অব টেম্পলস্। বিখ্যাত সব মন্দির ওখানে। কত বেড়াবার জায়গা—সুন্দর বী-বীরিচ রয়েছে ওখানে।

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম—স্যার আমি কি—

বাধা দিয়ে ডাঃ খাসনবীশ হেসে তর্জনী নাড়লেন—আপনাকে কিন্তু বুদ্ধিমতী বলেই' জানতুম।'

—কিন্তু সবটুকু না শুনলে—

—রাইট ইউ আর।' একটু থেমে বললেন—'জানেন তো ভুবনেশ্বরে এক মেডিক্যাল কনফারেন্সে গিয়েছিলাম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এক সহপাঠী—তপন বোস—ডাঃ টি বোস ওখানে খুরদায় প্র্যাকটিস করছে। ওর বাড়িতে একদিন ছিলাম। তা ও একজন

ভালো নার্সের জন্য আমাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছে। আপনার কথাই আমার প্রথমে মনে পড়ল। সারা কাজের মধ্যে ছিল বিভিন্ন সময়ে আপনার ধৈর্য, বুদ্ধি, কুশলতা এক কথায় আপনার অনেক গুণটুন আছে লক্ষ্য করেছি।

একটু সলজ্জ ভঙ্গীতে বললাম—'আপনি স্নেহ করেন তাই নইলে—

—উঁহু-উঁহু—য়ু হ্যাভ দ্য কায়ালিটিজ্। একটু থেমে বললেন তা আপনি যেতে রাজি আছেন?

—নিশ্চয়ই, আপনি যেখানে বলছেন।

—গুড। এবার কাজটা কি সেটা নিশ্চয়ই জানতে চান?

—স্যার আমাদের কাজই তো অসুস্থ রোগীদের সেবা করা।

ড: খাস্নবীশ এবার একটু গম্ভীর হলেন। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন-উঁহু ব্যাপারটা বোধহয় ততখানি সরল নয়। অবশ্য আমি সমস্ত ব্যাপারটার ডিটেলস বলতে পারবো না। তপন মানে ডাঃ টি বোসই আপনাকে সব জানাবে। একটু থেমে বললেন, প্রিলিমিনারী আইডিয়া দিচ্ছি- মানে একজন ভদ্রমহিলা-বিবাহিতা-তাকে দেখাশুনা করা।

—তিনি কি অসুস্থ?

নাঃ ঠিক অসুস্থ বলতে যা বোঝায় তিনি তা নন। শুনেছি, বেশ ভালো স্বাস্থ্য তাঁর দেখতেও নাকি-ইয়ে-অপরূপ সুন্দরী। দৈহিক অসুস্থতা তাঁর নেই। অসুখটা মনে। তিনি নাকি প্রতিমুহূর্তে আশংকা করছেন কেউ তাঁকে হত্যা করতে আসছে। মনস্তত্ত্বে এই মানসিক অসুস্থতার কিটা কম আছে বটে তাঁর স্বামী চাইছেন ক'লকাতায় ফিরে এসে কোন সেলিব্রেটেড সাইকিসাট্রিস্ট নাম করা কোন মনস্তাত্ত্বিক কে দিয়ে ও'র ট্রিটমেণ্ট করাবেন। যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন কোন অভিজ্ঞ নার্সের তত্ত্বাবধানে উনি স্ত্রীকে ওখানে রাখতে চান। আপনার কাজ হবে ওই ভদ্রমহিলাকে দেখাশোনা করা।

—তাহলে তো বরাবরের মত কাজ এটা নয়।

—না তা নয়। ড: খাসনবীশ একটা সিগারেট ধরালেন—মাইনে ভালোই দেবে, তাছাড়া এ তো বরাবরের মত কিছু নয়—যতদিন প্রয়োজন ততদিনই। কিছু টাকাও রোজগার করলেন, দেশ ঘোরাও হল। ত'ছাড়া ভালো না লাগলে চলেও আসতে পারেন, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ডাঃ খাস্নবীশ কথা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রস্তাবটা আমার মনে ধরল। ভালোও

লাগছিলনা একই জায়গায় দিনের পর দিন একই ডিউটি। এর মধ্যে নতুনত্ব আছে। নতুন দেশ। নতুন মানুষ। তার ওপর যতটুকু শুনলাম তার মধ্যে বেশ রহস্যের আভাস পাচ্ছিলাম। মন্দ কি। দেখাই যাক্ না। বললাম—আমি রাজি।

—গুড। ডাঃ খাসনবীশ হাসলেন।

—কবে যেতে হবে?

—ডাঃ টি বোস তাড়াতাড়িই পাঠাতে বলেছে। আপাতত ছুটি নিয়ে যাবার জন্য গোছগাছ করতে আপনার ক'দিন লাগবে?

—দিন দু'থেক।

গুড। তাহলে ডাঃ বোসকে সেইমত জানিয়ে টেলিগ্রাম ক'রে দেব। স্টেশনে লোক থাকবে। কোন অসুবিধে হবে না আপনার। আর আপাতত কিছুদিনের ছুটি নিয়েই যান। পরে প্রয়োজনমত ছুটি এক্সটেণ্ড করিয়ে নেবেন।

—ঠিক আছে। চলি স্যার। ডাঃ খাসনবীশ মাথা ঝুঁকিয়ে নিজ তর্জনীটা তুললেন। মুখে কিছু বললেন না।

পরের একটা দিন ছুটির জন্যে দরখাস্ত করা, মেট্রনকে সব বলা, গোছগাছ করা, এসবের মধ্যে দিয়েই চলে গেল।

খুরদা স্টেশনে যখন নামলাম তখন সন্ধে হয় হয়। স্টেশনে ডাঃ টি বোস লোক পাঠিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে মালপত্র বেশী ছিল না। লোকটি মালপত্র নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সাইকেল রিক্সার খানিট চারপাশে নতুন পরিবেশ কোলকাতায় হট্টগোল ছেড়ে এখানে একটা শান্ত জায়গা খুব ভালো লাগছিল।

একসময় দেয়াল ঘেরা বেশ বড় একটা বাড়ির সামনে এসে রিক্সাটা থামল। সঙ্গের লোকটি মালপত্র বয়ে নিয়ে চলল।

লোহার গেট তারপর সুড়কি ঢালা রাস্তা, দুপাশে নানা ফুলের গাছ, চারদিক সুন্দর পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো, এই সবকিছু গৃহস্বামীর সুরুচিবোধের পরিচয় দিচ্ছিল।

বারান্দায় ডাঃ বোস নিজেই দাঁড়িয়েছিলেন। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলাম। প্রতিনমস্কার করে ডাঃ বোস বলে উঠলেন—

—আসুন—আসুন। সুব্রত মানে ডাঃ খাসনবীশের টেলিগ্রাম আজ সকালেই পেয়েছি। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো ?

—না। তবে ট্রেনটা লেটেএ রান করছিল।

—ওটাই এদিককার নিয়ম। আসুন—ভেতর আসুন।

স্নানটান সেরে যখন চায়ের টেবিলের গিয়ে বসলাম তখন ট্রেনযাত্রার ধকল অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। বেশ তরতাজা লাগছিল নিজেকে। বারান্দাতেই চায়ের আয়োজন করা হয়েছে। চায়ের টেবিলে ডাঃ বোস তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে বসেছিলেন। মেয়েটি বয়েসে আমার চেয়ে ছোটই হবে। ডাঃ বোস পরিচয় করিয়া দিলেন—আমার স্ত্রী-মেয়ে রুবি নমস্কার বিনিময়ের পর চা খাওয়ার পর্ব চলছে এমন সময় গেট পেরিয়ে সুরকি ঢালা পথ দিয়ে কাউকে এদিকে আসতে দেখা গেল। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বারান্দায় আলোয় এসে দাঁড়াতে ভদ্রলোককে দেখে ডাঃ বোস বলে উঠলেন—আরে ডাঃ —সেন – আসুন আসুন। আপনি এসেছেন ভালোই হল। ডাঃ সেন আমার দিকে তাকালেন। ডাঃ বোস আমাকে দেখিয়ে বললেন—ইনি মিস সন্ধ্যা বিশ্বাস। ডাঃ খাসনবীশ কলকাতা থেকে এঁকেই পাঠিয়েছেন। আমার দিকে উজ্জলচোখে তাকিয়ে আগন্তুক নমস্কার করলেন! ডাঃ বোস পরিচয় দিলেন—ইনি ডক্টর সুমন্ত্র সেন। এঁর স্ত্রীকে দেখাশোনার জন্যেই আপনাকে আনা।

তাহলে ইনিই ডঃ সুমন্ত্র সেন। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চায়ের টেবিলে যখন কথাবার্তা বলছিলেন। কেমন যেন নার্ভাস মনে হচ্ছিল। বেধে বেধে কথা বলছিলেন। ভদ্র রুচিবান, শান্ত কিন্তু কেমন যেন অসহায় ভাব ডাঃ সেনের। আমার সঙ্গে দুএকটা কথা হতেই বুঝলাম ভদ্রলোক সত্যিই তার স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসেন। উদ্বেগকাত-রস্বরে তিনি বললেন—বুঝলেন – ইভা-মানে আমার স্ত্রী বড্ড দুর্বল, মনের দিক থেকে—বুঝলেন নার্ভাস—ভীষণ নার্ভাস। আমি-আমি বড্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি।

—শরীর কোন অসুস্থতা নেই তো ? আমি বললাম।

—হ্যাঁ মানে-না-না-শরীর তো ওর ভালোই-বরাবরই ভালো—কিন্তু ও মানে – ভীষণ কল্পনাপ্রবন, মানে কাল্পনিক জিনিস সবদেখে।

— কি জিনিস ? আমি জানতে চাইলাম।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ডাঃ সেন আপনমনেই যেন বিড়বিড় করে

বলতে লাগলেন যার অস্তিত্ব নেই, সেইসব ভাবা বঝলেন আর তার জন্যে ভীত হওয়া মানে –

—কীসের ভয় ?

– ওঃ কিছু না—নার্ভাসনেস, বুঝলেন স্রেফ মানসিক দুর্বলতা ভাবলাম স্ত্রীদের সম্পর্কে স্বামীদের ভাবনা একটু বিচিত্রই হয়ে থাকে : বললাম—আমাকে আনার ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর সম্মতি আছে তো ?

—নিশ্চয়ই। সবসময়ের জন্যে একজন নার্স আনাবো শুনে ইভা খুব খুশী হয়েছে। ইভা বলছিল ও এতে অনেক নিরাপদ বোধ করবে।'

'নিরাপদ' শব্দটা আমার কানে কেমন যেন বেসুরা লাগল। ভাবলাম ডাঃ খাসনবীশের ধারণটাই ঠিক। মানসিক রোগ। ডঃ সুমন্ত্র সেন বলতে লাগলেন, আপনাকে পেলে ইভা সত্যিই খুশি হবে।' একটু থেমে বললেন—আপনাকে প্রথম দেখেই কিন্তু আমার একথা মনে হয়েছে। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি।

—কী আশ্চর্য মনে করবো কেন ?

—মানে আপনি দেহেমনে বেশ সুস্থ এবং বুদ্ধিমতী—ঠিক ইভার উপযুক্ত।

—ধন্যবাদ। দেখি চেষ্টা করে, আমি কৌশলে আগের প্রসঙ্গে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম—আপনার স্ত্রীর বোধহয় নতুন জায়গা নতুন লোকজন এসব ভালো লাগছে না। উনি তো কলকাতাতেই মানুষ।'

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি যা বললেন সেটা কিন্তু ঠিক না মিস বিশ্বাস। ইভা পলাশগড়ে বেশ আনন্দেই আছে, সকলের সঙ্গেই—মানে আমরা যারা ওখানে আছি, বেশ মেলামেশা ওর। এরমধ্যেই ওড়িয়া ভাষা শিখে নিয়েছে অনর্গল বলতে পারে।

—তবে ওঁর ভয়ের কারণটা কী ?

একটু থেমে ডঃ সেন বললেন—'সেটা বোধহয় -বোধহয় কেন নিশ্চয়ই—ই ভাই আপনাকে বলবে। আচ্ছা তাহ'লে—' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লেন 'উঃ বেশ রাত হ'য়ে গেছে—কালকে দুপুর নাগাদ তৈরি থাকবেন। গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বিকেল নাগাদ পলাশগড় পৌঁছে যাবেন। আচ্ছা নমস্কার।' মুখ ফিরিয়ে ডাঃ বোস তাঁর স্ত্রী কন্যার সঙ্গে কয়েকটা কথা বললেন তারপর চলে গেলেন ডঃ সুমন্ত্র সেন।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ ব'সে রইলাম। ডাঃ বোস একসময় বললেন—ডঃ সুমন্ত্র সেনের সঙ্গে আপনার আলাপ হ'ল। মোটামুটি সবই শুনলেন।

হ্যাঁ তবে মনে হয় এখনও অনেক শোনা বাকি। আমি বললাম।

— হুঁ সবই শুনবেন জানবেন।

—আচ্ছা আমার কর্মস্থল মানে পলাশগড় এখান থেকে কতদূর ?

—এখান থেকে মাইল কুড়ি পঁচিশ দক্ষিণে পলাশগড়। ডঃ সুমন্ত্র সেন একজন আর্কিওলজিস্ট—প্রত্নতাত্ত্বিক। কাগজে ওঁর খননকার্যের সংবাদ হয় তো পড়ে থাকবেন। পলাশগড়ে খননকার্য চলছে। ডঃ সেন তো বলেন পলাশগড়ে মাটির তলায় এমন কিছু নমুনা তিনি পেয়েছেন যা থেকে উনি আশা রাখেন অতীত ভারতীয় সভ্যতার এক অন্ধকারময় অধ্যায়ের ওপর উনি আলোকপাত করতে পারবেন। ভীষণ কাজ পাগলা মানুষ। অসম্ভব পরিশ্রম করছেন ভদ্রলোক। কিন্তু বড়ই মনঃকষ্টে আছেন উনি। স্ত্রীর কথা তো শুনলেন। কী এক ভয় ভদ্রমহিলাকে পেয়ে বসেছে যেন কেউ তাঁকে হত্যা করবে।

— রোগটা মনের।

—আমারও তাই মনে হয়। কথাটা বলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডঃ বোস উঠে পড়লেন—'আমাকে চেম্বারে যেতে হবে। আপনি বসুন—এঁদের সঙ্গে গল্পটল্প করুন।' ডাঃ বোস চ'লে যেতে মিসেস বোসও উঠে পড়লেন—'তোমরা গল্পটল্প কর আমি রাতের রান্নার জোগাড় দেখি।'

রুবি এতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। এবার আমার কাছে চেয়ার টেনে বসল—কিছু মনে করবেন না—আপনার নামটা যদি—সন্ধ্যা বিশ্বাস। আমি বললাম।

—তাহ'লে তো আপনি খুবই বিশ্বস্ত। রুবি ভুরু বাঁকিয়ে বলল।

ওর রসিকতায় হেসে উঠলাম। রুবিও হাসতে লাগল।

—অত হাসি কীসের ? বারান্দার নীচে সিঁড়ি থেকে পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। আমি একটু চমকেই উঠলাম। দেখি বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে এক সুবেশ ভদ্রলোক উঠে আসছেন। বয়েসে বেশ তরুণ। রুবি ব'লে উঠল—

— তুমি মিলিটারি মানুষ—এত নিঃশব্দে হাঁটো কী ক'রে ?

—আকাশে উড়ে বেড়াই তো—ওটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে।

ভদ্রলোক এসে চেয়ারে বসলেন। রুবি পরিচয় করিয়ে দিল—

—ইনি অমিয় দত্ত—এগ্রার কোসে'র অফিসার। ইনি সন্ধ্যা বিশ্বাস—ইভা সেনকে দেখাশোনার জন্যে কলকাতা থেকে এসেছেন।

—ইভা সেন—'অমিয় সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল—' অদ্ভুত ভদ্রমহিলা। একটা রত্ন।

—রমণীরতন।' রবি টিপ্পনি কাটল।

—ঠিক – দ্য এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্ম'—রমণীরতন।

তা এরকম রমণীরতন যে দুর্লভ তা নয়। আমি হেসে বললাম। ঠিকই বলেছেন – তবে ইভা সেনের একটা বিশেষ এ্যাট্রাকশস আছে।

—একেবারে মজে গেছ মনে হচ্ছে—'রবি ব'লে উঠল'—মাত্র দিনতিনেকের জন্যে পলাশগড়ে বেড়াতে গিয়েছিলে। তা'তেই এই।

অমিয় একটু লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল – সে তুমি যাই ভাবো। সুমন্ত্র সেন তো ইভা বলতে অজ্ঞান। ইভা যে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটে সুমন্ত্র সেন সেই মাটি পুজো করেন। ওখানে আর যারা আছে তাদের অবস্থাও তথৈবচ।'

—সব মিলিয়ে কতজন আছেন ওখানে? আমি জানতে চাইলাম।

—বাঙালীই বেশী। অবাঙালীর মধ্যে প্রীতম সিং তাঁর স্ত্রী চন্দ্রা সিং ফটোগ্রাফার রঙ্গনাথন আর আলী সাহেব। চন্দ্রা সিংএর বয়েস কম প্রীতম সিংয়ের তুলনায়। ও'রা পাঞ্জাবী। তবে বেশ বাংলা বলেন। আর একজন ভদ্রমহিলা আছেন—ইন্দ্রানী সরকার। ডঃ সুমন্ত্র সেনের সেক্রেটারীর মতই উনি কাজ করেন। তবে অফিসিয়ালি সেক্রেটারী নন। ইন্দ্রানী সরকার নিজেও একজন প্রত্নতাত্ত্বিক। লক্ষ্য করেছি চন্দ্রা সিং ইভা সেনকে বেশ ঘৃণাই করে। ইন্দ্রানী সরকারকে নিয়ে আর সকলে বাঙালী। একজনের নাম জয়ন্ত নন্দী। খুব দিলখোলা মানুষ।

—বক্তিয়ার খাঁ। রবির টিপ্পনী।

—হ্যাঁ—অমিয় হাসল 'তা' একটু বক্‌বক্‌ করে বটে। আর আছেন সন্দীপ চ্যাটার্জী, শোভেন ঘোষ। ব্যক্তিগতভাবে সকলেই মিশুকে, বেশ ভদ্র। কিন্তু জানি না কেন এবার ছুটিতে এসে ওখানে বেড়াতে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। মনে হ'ল কোথায় যেন কী গণ্ডগোল হ'য়েছে। সবাইকে ঠিক স্বাভাবিক মনে হ'ল না। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ।

—কী দেখে বুঝলে? রবি প্রশ্ন করল।

—কেন রবি—অমিয় বলল, তুমিও তো শুনলাম এর মধ্যে দু'তিন দিন

গিয়েছিলে—তারপর হঠাৎ একেবারে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছো।

—আমার কথা থাক তোমার কথা বল। কী দেখে তোমার এরকম ধারণা' হ'ল।

—অনেক কিছু দেখেই। অমিয় বলল।

—যথা? রবির জিজ্ঞাসা।

—সবাইকে দেখলাম খাবার টেবিলে বড্ড বেশী এটিকেট মেনে চলছে। নিঃশব্দে মরিচদানি লবণদানি এগিয়ে দিচ্ছে।

নিজের মতামতটা আমি না ব'লে পারলাম না। বললাম, দেখুন আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বেশী মাখামাখিটা শেষ পর্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি করে।

—ঠিকই বলেছেন 'অমিয় বলল' কিন্তু এখন ডঃ সেনের খননকার্যের সীজন শুরু হ'যেছে। এরমধ্যেই ওরকম একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়।

—খনন কার্যের ব্যাপারেই ওখানে সকলে একত্র হয়েছেন। এটাকে আমাদের প্রতিদিনের সমাজ জীবনেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। সুতরাং ওখানেও দলাদলি, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক। আমি বললাম।

—ডঃ সেনের সঙ্গে এবার নবাগত কযেকজন আছেন। রবি বলল।

—হ্যাঁ তা আছেন কয়েকজন। অমিয বলল—গুণে দেখা যাক—শোভন আর ফটোগ্রাফার রঙ্গনাথন দু'জনেই এই সীজন এ নতুন এসেছেন। ডঃ তালুকদার অসুস্থতার জন্যে আসতে পারেন নি। তার জায়গায় এসেছেন আলী সাহেব। সন্দীপ চ্যাটার্জী প্রায় পাঁচ বছব যাবৎ ডঃ সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ যখন থেকে এই খননের কাজ শুরু হ'য়েছে। ইন্দ্রানী সরকারও তাই। সত্যি গত সীজন এও ওদের দেখেছিলাম, এক সুখী পরিবারের মত বাস করছে কাজ করছে। মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি। কী বলেন মিস বিশ্বাস।

—অবাক হবার কিছু নেই। হাসপাতালেও দেখেছি সামান্য এক কাপ চা নিয়েও পরস্পরে কোঁদল লেগে গেছে।

—আমার কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা বলছে ব্যাপারটা অত তুচ্ছ নয়। ডঃ সুমন্ত্র সেন অত্যন্ত ভদ্র, সমঝদার আর কৌশলী মানুষ। দলের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং পরস্পরের সঙ্গে একটা সহৃদয় সম্পর্ক থাকবে এজন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। এবারে তাঁর এসকাভেশন দলের মধ্যে

কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

—আর তুমি এর কারণ বুঝতে পারলে না? রুবি বলল।

—না।

—জলবত্তরলং।

—মানে?

—মানে··ইভা সেন—রমনীরতন।

—কী যে বলো· ইভা সেন একজন বুদ্ধিমতী মহিলা—ঝগড়াটে স্বভাবের নয়। অমিয় বলল।

—আমি তাকে ঝগড়াটে বলিনি। তবে তিনি অন্যদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে ওস্তাদ—নাটের গুরু।

—কারণ?

—কারণ তার জীবনের একঘেয়েমি। তিনি নিজে তো আর প্রত্নতাত্ত্বিক নন। কাজেই শহুরে জীবনের উন্মাদনার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে ওখানেই তিনি তার স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন।

—কী ক'রে? অমিয় জানতে চাইল।

—দলের লোকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে। নাটক সৃষ্টি ক'রে রুবি বলল।

—এ তোমার কল্পনার বাড়াবাড়ি। উনি মোটেই সেই ধরনের মহিলা নন। অমিয় মাথা নেড়ে বলল।

—অবশ্যই এটা আমার কল্পনা। ইভা দেবী মোনালিসার হাসির মতই রহস্যময়ী। তবে দেখে নিও আমি ঠিক কল্পনা করেছি কি না। অবশ্য ইভা দেবী জ্ঞানত কারো ক্ষতি করতে চান না—তবে কী ঘটে দেখাই যাক না—এমনি একটা খেলুড়ে মনোবৃত্তি তাঁর আছে।

—ইভা ডঃ সেনকে যথার্থই ভালোবাসে। অমিয় বলল।

—আঃ বাজে বকো না। আমি ও রকম কোন বিশ্রী ষড়যন্ত্রের কথা বলছি না। তবে তোমাদের ইভা দেবী একখানা চীজ। রুবি বলল।

—সত্যি মেয়েরা পরস্পরের সম্পর্কে কী সুন্দর অভিমত দেয়। অমিয় বলল।

—আমরা হিংসুটে—সত্যিই তাই। কিন্তু আমরা পরস্পরকে খুব সহজেই যাচাই করতে পারি। রুবি বলল।

—যাই হোক—ঝড়ের পূর্বেকার একটা থমথমে আবহাওয়া আমি লক্ষ্য করেছি। যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে।

—মিস বিশ্বাসকে ঘাবড়ে দিও না। রুবি হাসল।

—না-না—আমি অত সহজে ঘাবড়াই না। আমি হাসতে হাসতে বললাম। অমিয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'মাসিমা কোথায় ?'

—মা বোধ হয় কিচেনে। রুবি বলল।

—যাই—মাসিমার হাতে এক কাপ কফি নিয়ে আসি। অমিয় চলে গেল।

রুবি আর আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে রইলাম। একসময় রুবি জিজ্ঞাস করল – আচ্ছা ডঃ সুমন্ত্র সেনকে কেমন লাগল আপনার ?

আমি সাধারণভাবে বললাম - ভালোই।

—আমার কিন্তু সুমন্ত্র সেনকে খুব ভালো লাগে। সকলেই পছন্দ করে ও'কে। আমি চুপ ক'রে রইলাম। তারপর বললাম—

—ইভা দেবীর বোধহয় সঙ্গীর অভাব—তাই উনি মনমরা হ'য়ে থাকেন।

— হা কপাল রুবি ব'লে উঠল, অন্তত ন'জন লোক তার দেখাশুনো করছেন এরপরেও—

তাদের তো অন্য কাজও আছে।

—তা সত্যি তবে ইভা সেন সব কাজের আগে। উনি নিজে অন্তত তাই চান।

আমি মনে মনে বললাম—আপনি ইভা সেনকে দু'চোক্ষে দেখতে পারেন না। রুবি ব'লে চলল—'আমি তো হাসপাতালের একজন নার্সের কোন প্রয়োজনই দেখি না। বরং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগোছের কাউকে প্রয়োজন ছিল।' এই কথাটা আমারও মনে হচ্ছিল। কিন্তু কোন কথা বললাম না। একটু ঔৎসুক্য বোধ করছিলাম। বললাম –

—তাহলে আপনি কি মনে করেন ইভা সেনের কিছুই হয় নি ?

—নিশ্চয়ই। বহালতবিয়তে আছেন উনি। ডঃ সেন তো সারাক্ষণ ব'লে বেড়াচ্ছেন 'ইভা কাল রাতে ভালো ঘুমোতে পারে নি' 'ইভার শরীর ভালো যাচ্ছে না' 'রোগা হ'য়ে যাচ্ছে দিন দিন।' আসলে ইভা সেন চান না যে সকলে তার সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করুক, সকলে তার চারপাশে ঘুরে বেড়াক। মোসাহেবি করুক।

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। নার্স হিসেবে এরকম রোগীর

খবর আমি জানতাম। তারা একেবারে সুস্থ সবল মানুষ। কিন্তু বাড়ির সকলে তার সম্পর্কে খোঁজখবর করুক এককথায় তাকে নিয়েই সকলে ব্যস্ত থাকুক এটাই তারা চায়। ডাক্তার বা নার্স কেউ যদি বলতে গেল – 'আপনার কিছু হয় নি' তাহ'লে তাদেরই ঝামেলায় পড়তে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাক্তার বা নার্স বাতিল। ডাক পড়ে অন্য ডাক্তার বা নার্সের। হয়তো ইভা সেনও ঐ রোগে ভুগছেন। স্বামী বেচারাই এই রোগীদের প্রথম শিকার হ'য়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটাকে অত সরল ব'লে আমি ভাবতে পারছিলাম না। তার কারণ ডঃ সুমন্ত্র সেনের সেই "নিরাপদ" কথাটি। 'নিরাপদ' শব্দটি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, কেন জানি না। বললাম—'মনে হয় ইভা সেন ভীষণ নার্ভাস ভীতুপ্রকৃতির। তার ওপর লোকালয় ছেড়ে অত দূরে একটা প্রায় নির্জন জায়গায় পড়ে থাকা।'

– উঁহু—রুবী বলল—'দশজন লোক ওখানে থাকে। পাহারাদার আছে। ওখানে মাটি খুঁড়ে দামী জিনিসপত্র যা পাওয়া গেছে সে সব নিরাপদে রাখার জন্যে এ্যাণ্টিকারুম আছে। ওসব জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে লোক রাখা আছে। জায়গাটাও বেশ সুরক্ষিত। এতসবের পরেও অত ভয় পাবার কী আছে বুঝি না। তবে'—একটু থেমে রুবি কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল –'অমিয় সেদিন একটা ঘটনার কথা বলছিল। এবার ও যখন পলাশগড়ে বেড়াতে গিয়েছিল তখন সকালবেলা। প্রায় সকলেই যে ঢিবিটা খোঁড়া হচ্ছিল সেখানে ছিল। অমিয়ও কাউকে খবর না দিয়ে সরাসরি ইভা সেনের ঘরের কাছে গিয়ে হাজির। ইভা সেন তখন চিঠিপত্র লিখছিলেন। অমিয় বারান্দায় দাঁড়াতে ওর ছায়াটা ঘরের দরজার কাছে পড়েছিল। ইভা সেন সেই ছায়া দেখে প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন। সে এক ভয়ার্ত চীৎকার। পরক্ষণেই অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাফটাফ চেয়েছিলেন। উনি নাকি ভেবেছিলেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি। তাহ'লেও অত ভয় পাওয়া চীৎকার ক'রে ওঠা – একটু বাড়াবাড়ি নয়? আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম। রুবি বলতে লাগল—কতকটা যেন আপনমনেই—আশ্চর্য ব্যাপার ওখানে যে কী ঘটেছে এবার ভগবান জানে। অমিয় বলছিল সকলেই পরস্পরকে কেমন যেন ইয়ে – মরুক তো।

আমার মনে পড়ল অমিয় ঠিক ঐ কথাই বলছিল।

কয়েকদিন আগে বিকাশের চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র দু'দিনের

নোটিশে পলাশগড় রওনা হলাম। এসব কিছুই বিকাশকে জানাতে পারি নি। আজকে সেই সময় পেলাম।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর রুবি নিজেই আমাকে নিয়ে চলল। দক্ষিণ-প্রান্তের শেষ ঘরটার সামনে রুবি এসে বলল—'এই ঘরটা আপনার জন্য।' অন্ধকার ঘরে ঢুকে রুবি আলো জ্বালল। বেশ পরিচ্ছন্ন ঘর। বাড়াবাড়ি রকম আসবাবপত্র নেই। পুরানো আমলের খাট একটা। বুক সেলফ। টেবিল চেয়ার। ঝালর দেওয়া টেবিল ল্যাম্প। টেবিলে ফুলদানি। তা'তে সতেজ রজনীগন্ধার ফুল। রুবি বলল—

—আপনি টায়ার্ড। বিশ্রাম করুন। রুবি চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল। হাতে জলের জাগ আর একটা কাঁচের গ্লাস। টেবিলে জাগ গ্লাস রেখে বলল—। জল রইল।'

—ভালোই করলেন নার্সের চাকরি তো। আমাদের ঘুম খুব পাতলা। একটু শব্দ হ'লে বা একটু গরমে ঘুম ভেঙে যায়। তখন আমার এক গ্লাস জল চাই।'

—তাহ'লে চলি মিস বিশ্বাস। আপনি শুয়ে পড়ুন।

আচ্ছা। ধন্যবাদ।' আমি বললাম।

রুবি চ'লে যেতে আমি সুটকেশটা খুললাম। রাইটিং প্যাড কলম বের ক'রে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। টেবিল ল্যাম্পটা জেবলে দিলাম। বিকাশকে একটা চিঠি লিখতে লাগলাম—

প্রিয়তম—

মাত্র দু'দিনে অনেক কিছু ঘটে গেল। তুমি শুনে রাগ করবে কি খুশী হবে জানি না আমি মাত্র এক দিনের নোটিশে উড়িষ্যার পলাশগড়ের পথে। এখন খুরদায় এসেছি। কালকে পলাশগড়ে রওনা হবো।

স্টেশন থেকে রিক্সায় আসতে আসতে দেখলাম জায়গাটা। ধুলোবালি নোংরা ধোঁয়া এই নিয়ে খারদা। শুনলাম এখানে মন্দিরটন্দির আছে। সময় পেলে দেখবো। কলকাতায় ডিউটি বাঁধা একঘেয়ে জীবন থেকে অন্তত কিছু-দিনের জন্য মুক্তি। তাই ডাঃ খাশনবীশের দেওয়া প্রস্তাবটা লুফে নিলাম।

কিন্তু এই জায়গাটা নয়—এই জায়গায় এসে যাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল তাদের কথা বলি। এখানে উঠেছি ডাঃ বোসের বাড়ি। ডাঃ বোস ঘোর সংসারী মানুষ। তাঁর স্ত্রী আদর্শ গৃহিনী। তাঁদের কন্যা রুবি বোস অত্যন্ত

বুদ্ধিমতী। তবে একটু ঠোঁটকাটা। রুবীর সম্ভাব্য বরের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এয়ার ফোর্সের অফিসার।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক চরিত্রের নামটাই শুনেছি এখনো চাক্ষুষ দেখিনি। তিনি ইভা সেন। ডঃ সুমন্ত্র সেনের স্ত্রী। তাঁকে দেখাশুনা করা সঙ্গদান করা, এটাই হবে আমার চাকরি। তাঁর স্বামী ডঃ সুমন্ত্র সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ডঃ সেন একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক। তবে কথায় বার্তায় চলাফেরা খুব একটা স্মার্ট নন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কেমন বিষাদাচ্ছন্ন। কথাবার্তার পর, পলাশগড়ের এসকাভিসনে পার্টির লোকজনদের সম্পর্কে কিছু জানার পর আমার মনে হয়েছে ডঃ সেনের চোখের দৃষ্টিতে বিষাদের ছায়ার কারণ তাঁর স্ত্রী ইভা সেন। ভদ্রমহিলা শারীরিক দিক থেকে সুস্থ সবল। কিন্তু মানসিক রোগের শিকার। ডঃ সেন বললেন ইভার সবসময়ই কী যেন একটা ভয়। মাঝে মাঝেই গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় বলে ওঠে আমার বাঁচবার উপায় নেই। আমার মৃত্যু অবধারিত। আজ অথবা কাল। কিন্তু সেই স্বাভব মৃত্যু নয়। আমাকে খুন করা হবে। এই মানসিক দুশ্চিন্তা চলতে থাকে। আবার ডঃ সুমন্ত্র সেনের আশ্বাসে, সাহচর্যে ভয় ইভা শান্ত হয় স্বাভাবিক হয়। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এমনি লোকজন, পরিবেশের মধ্যে পৌঁছবে ,ভাবতেও ভালো লাগছে। আবার একটা যে না করছে তাও নয়।

এই পর্যন্ত যা বললাম তার কিছু দেখা কিছু শোনা।

পলাশগড়ে পৌঁছে চিঠি দেব। তাতে অনেক নতুন তথ্য দিতে পারবো।

আজ এই পর্যন্ত—

বুকভরা ভালোবাসা রইল।

তোমার

সন্ধ্যা।

বিছানায় শুয়ে ঘুম এলো না। নানা কথা ভাবতে লাগলাম, বিকেল থেকে কত ঘটনার কথা জানলাম। নতুন দেশ, নতুন মানুষ সব নতুন। ভালোও লাগছিল এই বৈচিত্র্যটুকু। আবার একটা ভয়ের ভাবনাকেও মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না।

পরদিন দুপুর নাগাদ সব মালপত্র বাঁধাছাঁদা শেষ ক'রে বাইরের বারান্দায়

বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাস্তায় মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। গাড়িটা গেটের সামনে এসে দাঁড়াল, গাড়ি থেকে নেমে এক ভদ্রলোক বারান্দার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার কাছে এসে দরাজগলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, হ্যালো হ্যালো—আপনিই তো ইয়ে-মিস বিশ্বাস। করমর্দনের ভঙ্গীতে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি মৃদু হেসে নমস্কার করলাম। বললাম হ্যাঁ।'

—ইয়ে—আমি জয়ন্ত নন্দী। ডক্টর সেন আমাকে পাঠিয়েছেন। জায়গাটা কেমন লাগছে আপনার? জঘন্য এই ট্রেনজানিং বুঝলেন। খাওয়া-দাওয়া দিবানিদ্রা এসব বোধহয় চুকে গেছে। হাঃ হাঃ—

আমাদের ওসব দিবানিদ্রার বালাই নেই। কাঠফাটা রোদে মাটি খুঁড়ে চলেছি—কী ব্যাপার? না একটা মাটির পাত্রের কানা পেলাম। কী যত্ন তার? যেন সোনার টুকরো যত্ন করে ঝেড়ে পুঁছে আলতো হাতে তুলে রাখো কে জানে হয় তো মিশরের তুতেনখামেনের আগের আমলেরও হতে পারে। জয়ন্ত বাবু দম নেবার জন্য একটু থামতেই বললাম একটু অপেক্ষা করুণ। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে রুবি বেরিয়ে এসেছে। না এসে উপায় নেই। জয়ন্তবাবু উচ্চৈকণ্ঠে সারা পাড়ার লোক যে ছুটে আসে নি এটাই আশ্চর্য। ঘর থেকেই ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। জয়ন্ত বলল—ঐ যে মিস বোস। ইয়ে-নমস্কার। পাশুবর্জিত দেশে পড়ে আছি ভেবে দেখুন। আপনারা তো সেই কবে একবেলার জন্য গিয়েছিলেন আর ওমুখো হলেন না। দেশোয়ালী কয়েকটা প্রাণী ওখানে পড়ে আছি একটু খোঁজও তো করলেন বেঁচে আছি মরে গেছি।

—সেটা দেখবার জন্যে ইভা সেনই কি যথেষ্ট নয়? রুবি বলল।

মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশটা পালটে গেল। এখন থেকে আমি বুঝতে পারলাম জয়ন্ত নন্দীর অবস্থাটা।

বাইরে এসে দেখি জয়ন্ত বোকাটে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রুবি নতমুখে টেবিলক্লথ পাট করছে। একটু পরে জয়ন্ত আমতা আমতা করে বলল—ইয়ে—মিস বোস—আপনি মাঝে মাঝে এমন করে কথা বলেন যে—

রুবি শুধু শব্দ করলো হুঁ।' জয়ন্ত আবার আগের ভঙ্গীতে

বলে উঠল।

—তা মিস বিশ্বাসকে এখানকার সুন্দর জায়গাগুলো দেখিয়েছেন।

—ও'র ভালো লাগবে না। রুবি বলল।

—কেন ঐ যে পাহাড়ের ধারে মন্দিরটা—কীসের মন্দির যেন—

—আচ্ছা জয়ন্তবাবু রুবি জেরা করার ভঙ্গীতে বলতে লাগল আপনার তো প্রাকৃতিক দৃশ্যেও রুচি নেই, মাটি খুঁড়ে পাওয়া ওসব পুরানো জিনিসপত্রেও কোন ঔৎসুক্য বা আগ্রহ নেই, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক হলেন কেন ?

আমি নিদোষ—জয়ন্ত নিরীহভঙ্গীতে বলল—আমার অভিভাবক—একজন গ্রন্থকীট—বুকে বই নিয়ে ঘুমোন। তার খ্যালাতেই—

—যে কাজ পছন্দ নয়—তাই একজনকে করতে বাধ্য করা নিছক বোকামো রুবি বলল।

—ঠিক তা' নয়। অভিভাবক চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কোন পেশার কথা আমি ভেবে রেখেছি কিনা। আমি বললাম—না। তিনি তক্ষুণি সরাসরি আমাকে ডাঃ সেনের দলে ভিড়িয়ে দেলেন।

সেকি—কোন কাজ আপনার করতে ভালো লাগে কোনটা ভালো লাগে না আপনি তাও বোঝেন না ?

—জানেন মিস বোস—আমার ইচ্ছে কিছু টাকা জমিয়ে রেসের ঘোড়ার ব্যবসা করবো।

—হোপলেস। আপনি একটা—' জয়ন্ত রুবির মন্তব্য কানে তুলল না। আগের মতই খুশীর ভঙ্গীতে ব'লে চলল—'মোটকথা চারদেওয়ালের মধ্যে দশটা পাঁচটা কলম পেশাটাই আমার কাছে সবচেয়ে জঘন্য কাজ। তাই বাইরে বেরিয়ে এসেছি দুনিয়াদারি দেখছি।

—তাহ'লে খুবই কাজের লোক আপনি।

—ওটাই আপনার ভুল ধারণা। আমার ভালো লাগে যেখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলে সেখানে দাঁড়িয়ে মাতব্বরি করা। আর একটি কাজ আমার ভালো আসে। সেটা হ'ল হাতের লেখা নকল করা। ওটা আমার স্কুলজীবন থেকে অভ্যাস। কে জানে একদিন হয়তো এই নকল বিদ্যার দৌলতে একজন পাকা জালিয়াৎ হয়ে যেতে পারি।

—হুঁ।' রুবি আর কিছু বলল না। জয়ন্তর বোধহয় এতক্ষণে খেয়াল হ'ল যে আমি মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

—ইস্—দেরী ক'রে ফেলছি। দিন আপনার মালপত্রগুলো।' জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে আমার মালপত্রগুলো নিল। গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল- 'পারলে একপাক ঘুরে আসবেন মিস বোস।' আমি রুবিকে বললাম—'চলি।' রুবি শুধু মাথা কাত করল।

রাস্তায় স্টেশন ওয়াগনটা দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির বডিটার আদি রং বহুদিন আগেই লোপাট হয়ে গেছে। কোথাও জং ধরেছে, হুডটা দোমড়ানো, ধুলো কাদামাখা এক বিচিত্র চেহারা গাড়িটার। গাড়ীটাতে লরীর কিছু পার্টস লাগানো হ'য়েছে, তাতে ওটা হয়েছে অর্ধেক সেটশন ওয়াগন অর্ধেক লরী।

গাড়িতে উঠে বসলাম। জয়ন্ত বলল-'মালপত্রগুলো হাতের কাছে রাখুন। নইলে ঝাঁকুনিতে ওসব ছিটকে যাবে।' মালপত্র সামলে সুমলে বসলাম। জয়ন্ত গাড়ির স্টার্ট দিতে দিতে বলল—'মিস বোস মেয়ে হিসেবে ভালোই। কিন্তু ওনার মা জন্মের সময় ওর মুখে বোধ হয় মধু দেন নি।' আমি হাসলাম কোন কথা বললাম না।

গাড়ি চলল। গাড়ির গতির চেয়ে যন্ত্রপাতির শব্দই বেশী। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল চাকা ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে নয়তো হুডটা উড়ে যাবে।

কিছুদূর যাবার পর পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা কাঁচা রাস্তায় পড়ল। এটাকে রাস্তা বলছি এজন্যে যে এটার ওপর দিয়ে গাড়ি চলছে। নইলে রাস্তার কোন চিহ্ন এর মধ্যে নেই। এতক্ষণ ঝাঁকুনি মোটামুটি সহ্যের মধ্যে ছিল। এখন শুরু হ'ল প্রশস্তকর ঝাঁকুনি। জয়ন্ত বলল—এই রাস্তায় এই গাড়িতে আধ ঘণ্টাটাক চড়লে পাথর হজম হ'য়ে যায়।'

সামনেই একটা নদী পড়ল। গাড়ীটাতে বসেই আমরা খেয়া নৌকো চড়ে ওপারে গিয়ে উঠলাম। এরপর আর রাস্তা ব'লে কিছু নেই। উলুখড়, বুনো ঝোপ গাছের মধ্যে দিয়ে সরু সিঁরির মত পায়ে চলা পথ। সেখান দিয়েই গাড়ি ছুটল। ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

এ পথে বোধহয় গরু ভেড়া চলে।' আমি একসময় বললাম।

ঠাট্টা করছেন?' জয়ন্ত হাসল-'জানেন ডঃ সেন কী বলেন?

কী বলো?

ঐ যে ঢিবিটা দেখুন।'

দেখলাম। 'বুনো ঝোপঝাড় জঙ্গলে ঢাকা একটা বেশ উঁচু মত ঢিবি। বাইরের দিকে শ্যাওলা ধরা ভাঙা ইঁটের সারি দেখা যাচ্ছে।

ঐ রকম আরো তিন চারটে ঢিবি এই পলাশগড়ে আছে। তার মধ্যে দুটোর খোঁড়ার কাজ চলছে। ডঃ সুমন্ত্র সেন বলেন—মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক কি তারও আগের এক উন্নত সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে এখানে। বলা যায় না—হয়তো গরু ভেড়া চলার পথটাই ছিল সেদিনকার রাজপথ। হয়তো সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই পথেই যুদ্ধ যাত্রা হ'য়েছে। হয়তো বিপুল হাতী ঘোড়া রথ লোকজনে গমগম করত এই রাজপথ।'

একটা উঁচু ঢিবি আর ঝোপজঙ্গল ছাড়াতেই জয়ন্ত বলল—এই যে আমরা এসে গেছি।

কিছুদূরে দেখলাম একটা মাঠের মত জায়গা। স্কুলবাড়ির মত দেখতে ইংরেজী E অক্ষরের মত লম্বাটে বাড়ি।

ওটাই আমাদের এসকাভেশন পার্টির আস্তানা। ওখানেই আমরা থাকি।' কথা বলতে বলতে গাড়িটা একটা গেট পেরিয়ে বিস্তৃত উঠোনের মত জায়গায় ঢুকল। ভেতরে ঢুকে ঐ ক্যাম্পের একটা চিত্র পেলাম।

সদর দরজা

ফটোগ্রাফিক রুম

ল্যাবরেটরী

নক্সা ঘর

বাথরুম

বাথরুম

জয়ন্ত নন্দী

প্রীতম সিং

রঙ্গনাথন

চন্দ্রা সিং

শোভেন ঘোষ

উঠোন

ইন্দ্রানী সরকার

সন্দীপ চ্যাটার্জী

সন্ধ্যা বিশ্বাস

রান্নাঘর

ডঃ সুমন্ত্র সেন

আলী সাহেব

গ্যারেজ

খাবার ঘর

অফিস ঘর

এ্যান্টিকা রুম

ইভা সেন

পলাশগড়ে এক্সকাভেশন পার্টি'র
ক্যাম্পের নক্সা

নীচে তারই কাজ চলা গোছের একটা নক্সা দিলাম। পরের ঘটনা বোঝার জন্য এই নক্সাটা কাজে লাগবে। কে কোন ঘরে থাকে-কোন ঘর কোন কাজে লাগে এসব নক্সায় দেওয়া গেল। উঠোন পেরিয়ে জয়ন্ত আমাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল। দেখলাম খাবার টেবিলের চারপাশে-কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ বসে আছেন।

—এই যে মিস বিশ্বাস এসে গেছেন।' জয়ন্ত ঘোষনার ভঙ্গীতে বলল।

টেবিলের এক কোণ থেকে একজন ভদ্রমহিলা আমার দিকে আসতে লাগলেন। জয়ন্ত চাপা গলায় বলল—'ডঃ সেনের স্ত্রী ইভা সেন।' এই প্রথম ইভা সেনকে দেখলাম। বিস্মিত হলাম। যার সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু শুনে থাকি তাকে স্বচক্ষে দেখার মধ্যে একটা বিস্ময় আছে। ইভা সেনকে অনায়াসে বেশী সুন্দরী বলা চলে। উনি সাদা জমিতে ফুলের কাজ করা শাড়ি পরেছিলেন বলেই কিনা জানি না-তাকে দেখেই একটা রজনীগন্ধার ডাঁটার সঙ্গে তুলনাটা মনে এল। অবশ্যই তাকে একটু রোগাই বলা চলে। চোখের নীচে কালির আভাস। আশ্চর্য সুন্দর হচ্ছে গভীর কালো টানা টানা চোখ দুটি। কেমন যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল তাকে। বয়সের ছাপ পড়েছে চোখ মুখে তবু উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। এক কথায় তাকে একজন যথার্থ রুচিসম্পন্ন ভদ্রমহিলা বলা চলে।

নমস্কার করলাম। উনি একটু মাথা হেলিয়ে হেসে বললেন—খুব খুশী হয়েছি আপনি আসায়। আগে চা খাবেন না নিজের ঘরে যাবেন?' ইভা সেনের গলার স্বর নরম ও সুরেলা।

—না এখানে চা খাবো' আমি বললাম।

—বেশ আসুন। সবার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।' ইভা সেন একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনি রঙ্গনাথন ফটোগ্রাফার-মাদ্রাজে বাড়ি, তবে বাঙ্লা ভালো বলেন। ইনি মিসেস চন্দ্রা সিং—পাঞ্জাবী হলেও কলকাতায় জন্ম—ভালো বাঙ্লা বলেন। ইনি শোভেন ঘোষ। ইনি আলী সাহেব। মোটামুটি বাঙংলা বলতে পারেন। ইনি ইন্দ্রাণী সরকার। ডঃ সেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন। আপনি মিস ইন্দ্রাণী সরকার আর আলী সাহেবের মাঝখানে বসুন।'

নমস্কারের পালা চুকল। আমি ইভাসেনের নির্দেশমত বসলাম। ইন্দ্রাণী সরকার আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আসার সময় আমার কোন

অসুবিধে হয়েছে কিনা উনি জানতে চাইলেন। ইন্দ্রাণী সরকারকে আমার বেশ ভালো লাগল। ওর বয়েস চল্লিশের বেশী। শরীরের চেহারা বেশ পুরুষালি ভাব। বেশ গভীর কণ্ঠস্বর। মুখ সুন্দর নয় নাকটা একটু থ্যাবড়া। লক্ষ্য করলাম একটু অস্বস্তি হলেই উনি নাকটা হাত দিয়ে ঘষেণ। কথায় কথায় জানালেন উনি ক'লকাতারই মেয়ে। ও'র সাজপোশাক বেশ রুচিসম্মত।

আলী সাহেবের চেহারা দশাসই। সারা মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

রুবিদের ওখানে আলী সাহেবের কথা শুনেছিলাম। আলী সাহেবের পরনে শেরওয়ানি, চুস্ত পায়জামা। ইভা সেন কে দেখলাম আলি সাহেবের সঙ্গে উর্দু ভাষায় কথা বলছেন। আলী সাহেবের চোখের দৃষ্টি খুব প্রখর আর ধূর্ত। উনি আমার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলছিলেন। উনি মাঝে মাঝে উর্দু ভাষায় ছাপা একটা বুলেটিন পড়ছিলেন।

আমার সামনে বসেছিলেন অন্য তিন জন' রঙ্গনাথ কে মোটামুটি সুপুরুষ বলা যায়। সুন্দর সুগঠিত দেহ। চোখে চশমা। অন্য যুবকটির নাম শোভেন ঘোষ। রঙ্গনাথনেরই সমবয়সী। মাথার চুল ছোট করে ছাটা। একটু লম্বাটে ধরনের মুখ। দেখতে সুশ্রী নয় তবে হাসলে সুন্দর দেখায়। খুব কম কথা বলছিলেন শোভেন ঘোষ। কথার উত্তরে মাথা নাড়ছিলেন দু'এক কথায় উত্তর দিচ্ছিলেন। মিসেস চন্দ্র সিং এর বয়স পঁচিশের মধ্যে হবে। তার সাজপোশাক এক একটু উৎকটরকমের। চাপা শালোয়ার কামিজে দেহের ভঙ্গী উগ্র। চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক। যতবার মিসেস চন্দ্রা সিংএর দিকে তাকাচ্ছিলাম ততবারই দেখি সে আমার দিকে অভদ্রের মত তাকিয়ে আছে। যেন গিলে ফেলবে। নার্স কেমন জীব সেটাই যেন দেখছে। বিন্দু মাত্র ভদ্রতাজ্ঞান নেই। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন।

চা'টা বেশ সুস্বাদু। সঙ্গে টোস্ট ডিমভাজা আর কেক। শোভেন ঘোষ আমাকে খাবারগুলো এগিয়ে দিচ্ছিলেন। আমার বেশ খিদেই পেয়েছিল। আমার খাওয়ার ভঙ্গী দেখে শোভেন বাবু বোধহয় বুঝলেন। আবার ভদ্রভাবে এক প্লেট ডিম ভাজা এগিয়ে দিলেন। একটু হেসে ধন্যবাদ জানালাম। জয়ন্ত এরমধ্যেই এসে ইন্দ্রানীর পাশে বসল এবং যথারীতি বক্ বক্ শুরু করল। কথার জন্যে তার বিষয়ের অভাব হয় না। ইভা একবার হতাশার ভঙ্গী করে ওর দিকে তাকলেন। কিন্তু কোন কাজ হল না। যে ইন্দ্রানীর কানের

কাছে বকর বকর করছিল সেই ইন্দ্রাণী কিন্তু কোন কথা না ব'লে আপনমনে চা'য়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের খাওয়া-দাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এমন সময় ডঃ সুমন্ত্র সেন আর প্রীতম সিং সেখানে এলেন। ডঃ সেন তাঁর অভ্যস্ত ভদ্র ভঙ্গীতে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। পরক্ষণেই দ্রুত একবার ইভা সেনকে দেখে নিলেন। বোঝা গেল তিনি ইভার খুশীর ভাব দেখে নিজেও খুশী হয়েছেন। তিনি টেবিলের এক কোণায় বসলেন। প্রীতম সিং ইভার পাশের খালি চেয়ারটায় বসলেন। প্রীতম সিং এর লম্বা মত চেহারা, স্ত্রী চন্দ্রা সিং এর চেয়ে বয়েসে বেশ বড়। তার গায়ের রংটা কেমন যেন পাণ্ডুর, চোখের দৃষ্টি দ্যুতিহীন, ঘোলাটে। প্রীতম সিং আসায় আমি খুশী হলাম। কারণ চন্দ্রা সিং এবার আমাকে ছেড়ে স্বামীর দিকে মনোযোগী হ'ল। ওর দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা উদ্বেগকাতরতা ফুটে উঠল। আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগল ব্যাপারটা। প্রীতম সিং নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল।

এবার যিনি খাবার ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখে আমি একটু অবাকই হলাম। প্রায় বছর চল্লিশেক বয়েস। এমন সুপুরুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। বেশ লম্বা। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ডঃ সেন পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনি সন্দীপ চ্যাটার্জী। আমাদের সহকর্মী।' সন্দীপবাবু বিড়বিড় ক'রে খুশীর ভঙ্গীতে কিছু ব'লে মিসেস সিং এর পাশের খালি চেয়ারটায় ব'সে পড়লেন। ইভা সেন বললেন—চা টা বোধ হয় জুড়িয়ে গেছে।

সন্দীপবাবু হেসে বললেন—'দোষটা আমারই। চেষ্টা ক'রেও ঐ ঢিবিটা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলাম না। কয়েকটা ভাঙা দেয়াল মাপজোক করছিলাম। চন্দ্রা সিং বলল টোস্ট নিন সন্দীপবাবু।

শোভন ঘোষ নিঃশব্দে ডিম ভাজা এগিয়ে দিল।

আমার মনে পড়ল খুরদায় অমিয়র কথা। এখানে সবাই পরস্পরের সঙ্গে বড্ড বেশী ভদ্রতা দেখাচ্ছে। সত্যি কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে...... ভদ্রতাটা মাত্রা ছাড়ানো। মনে হচ্ছিল যেন পরস্পর অপরিচিত কয়েকজন ভদ্রলোক কোন নিমন্ত্রণ খাচ্ছে। অথচ তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের জানাশোনা —বেশ কয়েকজনের মধ্যে তো অনেক দিনের পরিচয়।

চা'টা খাওয়ার পর ইভা সেন আমাকে আমার ঘর দেখাতে নিয়ে চললেন। আমরা এ্যান্টিকা ঘরের কাছে এলাম। শুনলাম এই ঘরে ভূগর্ভ খনন ক'রে যা কিছু পাওয়া গেছে সব পায়রার খোপের মত বাক্সে, টেবিলে বেঞ্চএ রাখা

আছে। এ্যাশ্টিকা ঘরের পরেই ইভা সেনের ঘর। তার ঘরের দু'টো জানাল বাইরের দিকে। উঠোনের দিকে কোন জানালা নেই। ইভা সেনের লাগোয়া ঘর ডঃ সুমন্ত্র সেনের। দুই ঘরের মধ্যে কোন দরজা নেই। ডঃ সেনের ঘরের পরেই আমার ঘর। তারপর ইন্দ্রানী সরকারের ঘর। তারপরের ঘর দু'টি চন্দ্রা সিং ও প্রীতম সিংএর। এই ঘরগুলোর বিপরীত দিকে উঠোনের ওপাশে পরপর জয়ন্তনন্দী, রঙ্গনাথন, শোভেন ঘোষ, সন্দীপ চ্যাটার্জীর ঘর। তারপর ছাতে ওঠার সিঁড়ি। তার পরেই আলী সাহেবের ঘর।

[নক্সা দ্রষ্টব্য]

নিজের ঘরে ঢুকে দেখলাম খুবই সাদাসিধে কিন্তু পরিচ্ছন্ন ঘর। আসবাব-পত্রের মধ্যে লোহার খাট, ড্রয়ারসুদ্ধ আলমারী একটা, হাতমুখ ধোবার বেসিন, একটা চেয়ার। ইভা সেন আমাকে সব দেখিয়ে দিলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো—ওড়িয়া ভাষা জানেন?

—না।

—তবে বাঙলাতেই ওড়িয়া ছেলেটিকে ডাকবেন! প্রয়োজনীয় জিনিস চাইবেন। ও বাঙলা বোঝে বলতে পারে না। ইভা সেন একটু অন্য মনস্ক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ারের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো—

—আপনার এখানে একঘেয়ে লাগবে না তো?

—না। আমি দেখে বললাম। একঘেয়ে লাগার পক্ষে জীবনটা খুবই সংক্ষিপ্ত।

হুঁ। একটু থেমে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'আচ্ছা আমার স্বামী আপনাকে ঠিক কী বলেছেন?' খুবই প্রত্যাশিত প্রশ্ন।

বললাম, 'এমন কিছু না, এই আপনি কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকেন। খুব একা পড়ে গেছেন, সব সময়ের জন্যে আপনার একজন সঙ্গী প্রয়োজন। একজন দেখাশুনোর লোক থাকলে হয়তো আপনার দুশ্চিন্তার লাঘব হবে, এইসব।'

—দুশ্চিন্তার লাঘব? ইভা সেন যেন আপন মনে বলল—'হ্যাঁ তা হবে।'

আমাকে কিন্তু কাজকর্ম করতে দেবেন। আলস্য জিনিসটা আমার ধাতে সয় না। ইভা হাসল। 'বলল, ধন্যবাদ মিস বিশ্বাস।'

তারপর ইভা বিছানায় বসে আমাকে প্রায় জেরা শুরু করল। তাকে রুচিসম্পন্ন মহিলা বলেই আমার প্রথমে ধারণা হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম পরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ঔৎসুক্য দেখাতে সে আর দশটা মেয়ের মতই সাধারণ। আমি কোথায় ট্রেনিং নিয়েছি, কোন হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, কোথায় কোথায় কাজ করেছি, আমাকে কে পাঠিয়েছেন, ডঃ সেনই আমাকে নির্বাচন করেছেন কিনা ইত্যাদি জানা প্রশ্ন করল ইভা। ওর একটা প্রশ্ন, আমি কখনও উত্তর প্রদেশে ছিলাম কিনা, আমার কাছে প্রথমে অবান্তর মনে হয়েছিল। এমনি আরো দু'একটা প্রশ্ন। পরে ঐ প্রশ্নগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পেরেছিলাম।

হঠাৎ ইভার মুখের ভাব পরিবর্তিত হ'ল। আগের মত মৃদু হেসে বলল, 'আপনি আসায় আমি সত্যি খুশী হয়েছি।' তারপর বলল, 'চলুন ছাতে যাওয়া যাক। সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্যটা ওখান থেকে বড় সুন্দর লাগে দেখতে।'

ছাতে ওঠার সিঁড়ির মুখে হঠাৎ ইভা দাঁড়িয়ে পড়ল। স্পষ্টস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ট্রেনে আসার সময় আপনি বাঙালী ভদ্রলোক কেউ আসছে কিনা লক্ষ্য করেছেন ?

না। তবে মাদ্রাজী ওড়িয়ার সংখ্যাই বেশী ছিল। বাঙালী কাউকে —না। কাউকে নজরে পড়ে নি। ইভা যেন একটা চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ছাতে উঠে দেখি চন্দ্রা সিং দাঁড়িয়ে আছে। ডঃ সেনকে দেখলাম একগাদা ভাঙা পাথর, ভাঙা মাটির পাত্র (ওরকম অদ্ভুত কাজ করা নক্সার পাত্র আমি জীবনে দেখিনি) পাথরের কুড়ুল, বেশ কয়েকটা বেদীসুদ্ধ বড় পাথরের শিব-লিঙ্গ এসব জড়ো করা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চন্দ্রা সিং আমাদের ডাকল। আসুন এদিকে।' আমরা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। সত্যি অতি সুন্দর শান্ত সূর্যাস্ত। দূরে নদীর ধারের গাছগুলোর ওপাশে পশ্চিম আকাশটা লাল হ'য়ে উঠেছে। চারদিকে অসীম নৈঃশব্দ, দূরে ঐ সূর্যাস্তের আলো ঝরা আকাশ পরিবেশটা যেন মায়াময় হ'য়ে উঠল। ইভা ডাকল।

—সুমন্ত্র ?

উঁ ? একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে ডঃ সেন শব্দ করলেন।

সত্যি এখানকার সূর্যাস্তটা দেখবার মত, তাই না ?

হাঁ সুন্দর সুন্দর। তেমনি অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে ডঃ সেন বললেন এবং শিব লিঙ্গগুলো গুনতে লাগলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা শুধু মাটির নীচে কী আছে তাই দেখতে দেখতেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়। তাদের কাছে আকাশের কোন অস্তিত্বই নেই। ইভা বললে চন্দ্রা সিং খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এরা বড় আজব মানুষ। কিছুদিনের মধ্যে আপনিও দেখতে পাবেন। একটু থেমে চন্দ্রা সিং বলল, আপনি আসায় আমরা সকলেই খুশী হয়েছি। আমরা মিসেস সেনকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। তাই না মিসেস সেন ?

তাই নাকি ? ইভা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল।

নিশ্চয়ই। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলেন মিস বিশ্বাস এইসব নিরালা জায়গায় পড়ে থাকা বিচ্ছিরি একঘেয়ে। আমি বলি এটাও একরকমের সহ্যশক্তির ওপর অত্যাচার ' ইভা বলে উঠল।

আমাকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আমাকে দেখার লোক এসে গেছে, কী বলেন মিস বিশ্বাস।

নিশ্চয়ই। আমি বললাম।

তাতে বিশেষ কিছু কাজ হবে বলে আমাদের মনে হয় না। চন্দ্রা বলল, আপনার উচিত একজন মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারকে দেখানো। আপনার নার্ভের ওপর খুব চাপ পড়ছে।

খুব হয়েছে ইভা বলে উঠল, এরপরে আমার ব্যাপার নিয়ে আপনার নার্ভের ওপর চাপ পড়বে। তার চেয়ে অন্য কিছু বলুন। আমি ভাবলাম ইভা সেনের এই ব্যবহার তার শত্রু সংখ্যাই বৃদ্ধি করবে এবং তাই বোধহয় ঘটেছে। কথা-গুলো সাধারণভাবে বললেও তার মধ্যে একটা রূঢ়ভঙ্গী ছিল। চন্দ্রা সিং আমতা আমতা করে চুপ করে গেল। ইভা ছাতের আর এক কোনায় ডঃ সেনের কাছে চলে গেল। ডঃ সেন বোধহয় ইভার কাছে আসাটা লক্ষ্য করেন নি। যখন ইভা কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে কিছু জিজ্ঞেস করল তখন ডঃ সেনকে ওর দিকে দ্রুত মুখ ফেরাতে দেখলাম। ডঃ সেনের চাউনিতে সহৃদয়তা আর জিজ্ঞাসুভঙ্গী লক্ষ্য করলাম। একটু পরেই দুজনে হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

ডঃ সেন স্ত্রীকে খুব ভালোবাসেন। চন্দ্রা সিং বলল।

হ্যাঁ, ওঁদের সম্পর্কটা বেশ মধুর। আমি বললাম, চায়ের টেবিলে চন্দ্রা যেমন ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়েছিল সেই একই ভঙ্গীতে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

আপনি কি মানসিক রোগীর নার্স?

না না। আমি বললাম, কিন্তু আপনি ওকথা ভাবলেন কেন?

চন্দ্রা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ইভা সেন বেশ হিটগ্রস্ত। ডঃ সেন কি আপনাকে কিছু বলেন নি?'

রোগের ব্যাপার নিয়ে গালগল্প আমি মোটেই পছন্দ করি না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি রোগীদের আত্মীয়বন্ধুরা রোগ সম্বন্ধে ঠিক সত্য কথাটা কখনোই বলতে পারে না। তাদের মতামতের ওপর নির্ভর করাটা বোকামি। ডাক্তাররাই ঠিক প্রয়োজনীয় তথ্যটি উপস্থিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে ডাক্তার অবশ্য কেউ নেই। ডাঃ বোসও এখানে নিয়মিত আসেন না। ডঃ সেনও তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে সব সথা বলেছেন এটাও আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। স্বামীরা তা বলতে পারেও না। তবু আমার কিছু জানার প্রয়োজন আছে ভেবে আমি চন্দ্রা সিংএর সঙ্গে বেশ আগ্রহের সঙ্গে কথা চালাতে তৈরী হলাম। ওর প্রশ্নে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম, ডঃ সেন তেমন কিছু বলেন নি, শুধু এই যে ইভা সেন নাকি ঠিক প্রকৃতিস্থ মানে নর্ম্যাল নন।

নর্ম্যাল? চন্দ্রা সিং বিচিত্র ভঙ্গীতে হাসল, 'আমাদের প্রান ওষ্ঠাগত। একরাত্রে তিনি জানালায় টোকার আওয়াজ শুনেছেন, আর একরাত্রে দুটো হাত দেখেছেন আর একরাত্রে জানালায় হলদে মুখ দেখেছেন, জানালা খুলে নাকি দেখেন কেউ নেই।

কেউ হয়তো মিছিমিছি ভয় দেখাতে চেয়েছে। বললাম।

—না-না। সবই ইভা সেনের কল্পনা। দেখুন না, গত পরশুদিন, চন্দ্রা বলতে লাগল, নদীর ওপারে গ্রামের দিকে হয়তো কোন শিকার পার্টি এসেছিল। তারা গুলী ছুঁড়েছিল। গুলীর শব্দে ইভা সেন এমনভাবে চীৎকার ক'রে উঠলেন যে আমরা তো হতবাক। ডঃ সেন গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। বারবার বললেন—'কিছু নয়, ভয় পাবার কিছু নেই। আমার কি মনে হয় জানেন মিস বিশ্বাস—পুরুষেরা মেয়েদের অলীক কল্পনা আতঙ্ক ইত্যাদিকে উৎসাহিতই করে। এটা খুবই বিপজ্জনক।

ঘটনাগুলো একেবারে অলীক নাও হ'তে পারে।

অবাক করলেন, তাহ'লে ওগুলোকে সত্যি বলতে হবে ? আমি ঠিক জবাব দিতে পারলাম না। গুলীর আওয়াজ শুনে চীৎকার ক'রে ওঠা মানসিক দুর্বল রোগীদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য ঘটনাগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। ও সবের দু'টো কারণ হ'তে পারে, এক, সমস্তটাই ইভা সেনের মনগড়া। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেমন মিথ্যে ভয়ের কথা ব'লে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় তেমনি ব্যাপার। দুই, কেউ হয়তো ইভা সেনের সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতা করছে। জয়ন্ত নন্দী জাতীয় তরল মাতদের পক্ষে এটা তেমন কিছু অসম্ভব নয়। ভাবলাম—জয়ন্ত নন্দীর দিকে নজর রাখতে হবে। চন্দ্রা সিং বাঁকা নজরে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলল—

ইভা সেনের চেহারাটা বেশ রোমাণ্টিক, তাই না ?

—হুঁ।

ও ধরনের মেয়েদের জীবনে নানারকম কেচ্ছা ঘটে থাকে।

বলুন না শুনি। আমি চন্দ্রা সিংকে উৎসাহিত করলাম।

ইভা সেনের প্রথম স্বামী যুদ্ধে মারা গেছে প্রায় বছর পনেরো কুড়ি আগে। ইভা সেনের বয়েস তখন কুড়ির মত। ব্যাপারটা দুঃখের কিন্তু বেশ রোমাণ্টিক।

ওঃ ডঃ সেন তাহ'লে দ্বিতীয় স্বামী।

—হ্যাঁ।

চলুন, নীচে নামা যাক।

—চলুন।

ছাত থেকে নীচে নেমে এলাম আমরা। চন্দ্রা সিং বলল, আসুন না ল্যাবরেটরী দেখবেন। আমার স্বামী বোধহয় কাজ করছেন ওখানে।

—চলুন।

ল্যাবরেটরীতে আলো জ্বলছিল। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। চন্দ্রা সিং আমাকে কাজকর্মের যন্ত্রপাতিগুলো দেখাল আর কিছু তামার গয়নাগাটি। চন্দ্রা আপনমনেই বলল, 'ও কোথায় গেল ?' ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা নক্সা আঁকার ঘরে উঁকি দিলাম। দেখি সন্দীপ চ্যাটার্জী টেবিলের ওপর ঝুঁকে আপনমনে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। সারা মুখে চোখে ভীষণ ক্লান্তির ছাপ। মনে হ'ল লোকটা যেন সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে পেঁাছেছেন। খুব শিগগিরই একটা অঘটন ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। কেন জানি না সন্দীপ-

বাবুকে দেখে আমার অভিমন্যুর কথা মনে পড়ল। মৃত্যু অবধারিত জেনেও যে প্রাণপনে লড়াই ক'রে চলেছে। সন্দীপের চেহারায় একটা অদ্ভুত আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। সত্যিই রূপবান পুরুষ।

অবশেষে ফটোগ্রাফিক রুমে প্রীতম সিংকে পাওয়া গেল। সেখানে ইভা সেনকে প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপারেই কোন নতুন তত্ত্বকথা বলছিল।

ইভা সেন বোধ হয় এরমধ্যেই গা ধুয়ে একটু হাল্কা রূপসজ্জা ক'রে নিয়েছে। শাড়ি পাল্টেছে। একটা চেয়ারে বসে মনোযোগ দিয়ে প্রীতম সিংএর কথা শুনছে। পরনে ফিকে হলুদ শাড়ি। তাকে পরীর মত দেখাচ্ছিল যেন অপার্থিব কিছু। ঘরে ঢুকে চন্দ্রা সিং বেশ কর্কশস্বরে ব'লে উঠল, তুমি এখানে? আর আমরা সারা রাজ্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। প্রীতম সিংকে প্রায় লাফিয়ে উঠতে দেখলাম। চোখ মুখ দেখে মনে হ'ল প্রীতম সিং এতক্ষণ যেন এক স্বপ্নরাজ্যে ছিল। আমরা এসে স্বপ্ন ভঙ্গ ঘটালাম। প্রীতম তোতলামি শুরু করল, 'মানে একটা আলোচনা, অনেকখানি,' বলতে বলতে সে দরজার দিকে এগোল। ইভা সেন ওর স্বভাবসিদ্ধ নরমস্বরে বলল, ভারী ইন্টারেস্টিং। মিঃ সিং অন্য সময় বাকিটা শুনবো।

ইভা আমাদের দিকে চেয়ে মিষ্টি ক'রে হাসল কিন্তু একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে। তারপর হাতের বইটার দিকে মনোযোগী হ'ল। দু'এক মিনিট পরে আমাকে বলল, 'আসুন মিস বিশ্বাস, বইখানা একটু পড়ে শোনান তো? ইভা হাত বাড়িয়ে বইখানা এগিয়ে ধরল। আমি বইটা হাতে নিয়ে তার সামনের মোড়াটায় বসলাম। চন্দ্রা কয়েক মিনিট অস্বস্তি প্রকাশ ক'রে হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার মুখে স্পষ্ট ক্রোধোমত্ততার চিহ্ন লক্ষ্য করলাম। প্রীতম সিংএর চাটুকারিতায় ইভা সেন ভোলবার নয়। কিন্তু চন্দ্রা ব্যাপারটাকে অত সহজভাবে নেবে না। বরং ইভা সেনের কোন ক্ষতি করতে সে পেছপা হবে না।

বইটা মৃদুস্বরে পড়তে পড়তে ভাবতে লাগলাম ইভা সেনকে আমার সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত। মানুষের ঈর্ষা আর ঘৃণা কত সহজে মানুষকে অমানুষ ক'রে তোলে এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলা উচিত। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলাম ইভা সেনের জীবনের অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। বাস্তবজ্ঞান তার যথেষ্টই আছে। আমি কিছু বললাম না।

একটু পরেই রাত্রির আহারের ডাক পড়ল। বেশ খাওয়া দাওয়া হ'ল।

বুঝলাম সকলেই বেশ তাড়াতাড়ি শুতে যায়। আমি খুশীই হলাম। এত ক্লান্ত লাগছিল। ডঃ সেন আমাকে আমার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বেশ খুশীর সঙ্গে বললেন, যাক আমি নিশ্চিন্ত। ইভার আপনাকে খুব ভালো লেগেছে। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ডঃ সেনকে কেমন যেন ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল। উনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন এটা বোঝা গেল। কিন্তু আমার মন তখনও সন্দিগ্ধ। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে। কিছু একটা ঘটেছে এখানে অথবা ঘটতে চলেছে যা আমি পরিষ্কার বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

বেশ সুন্দর আরামদায়ক বিছানা। ক্লান্তিও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ঘুম ভালো হ'ল না। কত স্বপ্ন দেখলাম। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেও যে স্বপ্নটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে ছিল সেটা ছোটবেলায় দেখা একটা থিয়েটারের স্বপ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ। জয়সিংহ আর ওসমান। তরবারি হাতে দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আয়েষাকে দেখলাম ছায়ার মত প্রাসাদের অলিন্দ দিয়ে যেন হেঁটে চলেছে। আবছায়ায় মিলিয়ে যেতে যেতে আয়েষা হটাৎ পেছন ফিরে তাকাল মুখ দেখে চমকে উঠলাম, ইভা সেন।

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে সন্দীপ চ্যাটার্জী প্রস্তাব করলেন, চলুন আপনাকে নক্সাঘর দেখাবো। দেখবেন কী কী কাজকর্ম হয় ওখানে।

আমিও বেশ ঔৎসুক্য বোধ করলাম। ও'র সঙ্গে নক্সাঘরে গেলাম। সন্দীপবাবু একটা গোটানো কাগজ আলমারী থেকে বার করলেন। কাগজখানা একটা লম্বাটে টেবিলের ওপর মেলে ধরে আমাকে বোঝাতে লাগলেন, যে দু'জায়গায় খোঁড়ার কাজ চলছে তার একটাতে যে মন্দিরের চুড়োটা আবিষ্কৃত হ'য়েছে, সে মন্দিরটা দেখতে কেমন। একটু আশ্চর্যই হলাম। যে জিনিসটা মাটিতে পোঁতা রয়েছে তার পরিকল্পনা আগে থেকে বুঝে তৈরী করা। ইভা সেন ঠিকই বলেছে, এ'দের দৃষ্টি মাটির নীচে। আকাশের খোঁজ এ'রা রাখেন না। যে ঢিবি দু'টো খোঁড়ার কাজ চলছে সন্দীপবাবু এবার আমাকে সেখানে নিয়ে চললেন।

ঢিবির ওখানে গিয়ে পেঁছিলাম, এবার আমার আর এক দফা আশ্চর্য হবার পালা। কোথায় সেই মন্দির? চৌকোনো ক'রে কাটা কিছুটা জায়গা। কাদা জলে ভর্তি। তবু ওরই মধ্যে কাদা ল্যাপটানো পাথরের তৈরী একটা মন্দির চুড়োর মত কিছু আলো দেখা গেল। সন্দীপবাবু বললেন, এই

মন্দির চূড়ো থেকে একটা ত্রিশূল পাওয়া গেছে। এ্যান্টিকা রুমে রাখা আছে। এইবার চলুন ঐ ঢিবিটা দেখবেন।

যেতে যেতে সন্দীপবাবু বললেন, ওখানে পাওয়া গেছে এক রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। ঐ প্রসাদের নক্সাটাও আমরা তৈরী করেছি। ওখানে অনেক কিছু পাওয়া গেছে, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণমুদ্রা, হীরে জহরৎখচিত একটা তরবারির খাপ, বাঁটে হীরে বসানো একটি ছোরা এমনি সব দামী দামী জিনিস। তবে ওর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রাগুলিই আমাদের সবচেয়ে কাজে লাগবে। এ্যান্টিকারুমে সব রাখা আছে, দেখতে পারেন।

দুই নম্বর ঢিবিটায় পেঁছে দেখি ওখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ বেশ জোর কদমে চলেছে। মজুররা মাটি কাটছে। নির্দেশ দিচ্ছেন আলী সাহেব। মজুররা খুব সন্তর্পণে গাঁইতি চালাচ্ছে। সন্দীপবাবু আমাকে আলী সাহেবের জিম্মায় রেখে নিজের কাজের জায়গায় চলে গেলেন। আলী সাহেব আমাকে এখানে যে রাজপ্রাসাদ পাওয়া যাবে তার সম্পর্কে বলতে লাগলেন। তার গলার স্বর বেশ ভারী। প্রাসাদের নৃত্যশালার কথা বলতে গিয়ে বেশ সরস মন্তব্য জুড়লেন। বেশী তথ্যের কথা বললেন না বরং একটা রোমান্টিক কাহিনী ফেঁদে বসলেন। কাহিনীর মাঝখানে আমি বললাম, আলী সাহেব আপনার কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক না হ'য়ে রোমান্টিক কাহিনীর লেখক হওয়া উচিত ছিল।

আলী সাহেব দরাজগলায় হেসে উঠলেন, মিস বিশ্বাস আমি কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক নই, আমি লিপিবিশারদ। মুদ্রা বা শিলালিপিগোছের যা পাওয়া যায় আমি সেগুলোর পাঠোদ্ধার ক'রে থাকি। কথা থামিয়া হঠাৎ ভারী গলায় বলে উঠলেন, আপনাকে এখানে আনানোর ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় লাগছে। আচ্ছা সত্যিই কি ইভা সেন অসুস্থ?

ঠিক অসুস্থ নন তবে, আমি চুপ করে গেলাম।

ভদ্রমহিলাটি কিন্তু অদ্ভুত আর বিপজ্জনকও। আলী সাহেব বললেন।

বিপজ্জনক? আমি একটু অবাক হলাম।

উনি রূঢ় প্রকৃতির, হ্যাঁ ঠিক তাই।

বাজে কথা। আমি ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব দিতে চাইলাম না। মাথাটা সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে আলী সাহেব বললেন—

স্ত্রী চরিত্র আমি যতটা জানি আপনি ততটা জানেন না।

স্বীকার করি ইভা সেন একটু কড়া মেজাজের মানুষ।

আমি বললাম, তবে উনি আতঙ্কগ্রস্ত।

—কীসের আতঙ্ক? আলী সাহেব বলে উঠলেন।

—সেটা রহস্যময়। আমি বললাম, আলী সাহেব চশমার মধ্যে দিয়া জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানকার সবকিছুই আপনার কাছে কেমন অস্বাভাবিক লাগছে না?

সেটা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।

ডঃ সেন নিজেও বেশ অশান্তিতে আছেন।

তার কারণ অবশ্য স্ত্রীর স্বাস্থ্য।

হতে পারে। কিন্তু আরো কিছু আছে, একটা অশান্তির কিছু, আলীসাহেব বললেন। আমিও ঠিক একথাটাই ভাবছিলাম, অস্বস্তিকর।

এর বেশী আর বিশেষ কথাবার্তা হল না. এমন সময় ডঃ সেন আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। হাতে একটা কাঠের গুটির মালা। মালাটা উঁচু করে ধরে আমাকে বললেন, 'এইমাত্র এই নেকলেসটা মাটি খোঁড়ার সময় পাওয়া গেল। হাতে নিয়ে কাঠের গুটির নেকলেসটা দেখলাম। খুব সূক্ষ্ম সুন্দর কাজ করা ডঃ সেন বললেন, 'ইভা এটা পেলে খুব খুশী হবে, চলুন চা খাবার সময় হয়েছে।'

ফেরার পথে ডঃ সেন মন্দির প্রাসাদ, নগর পরিকল্পনা এসব নিয়ে এমনভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন যে সমস্ত বিষয়টা আমার কাছে ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে ডঃ সেনের এত নামডাক এত সুখ্যাতি কেন এবার সেটা বুঝতে পারলাম। প্রত্নতত্ত্বের মত কঠিন ও জটিল একটা বিষয় আমার মত একজন আনাড়িকে এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম।

আমরা খাবার ঘরে চা খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ইভা সেন এল। আজকে ইভাকে বেশ সুস্থ সতেজ দেখাচ্ছিল। মুখে ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। ডঃ সেন ইভাকে তার শরীরের অবস্থা সম্পর্কে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আজ মাটি খুঁড়ে যে কাঠের গুটির নেকলেসটা পাওয়া গেছে সেটার কথা বললেন তারপর তিনি কাজকর্ম দেখাশুনা করতে চলে গেলেন।

ইভা সেন এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এখানে মাটির ঢিবি খুঁড়ে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে সে সব দেখবেন?

নিশ্চয়ই। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী।

চা খাওয়া হলে ইভা আমাকে এ্যান্টিকারুমে নিয়ে গেল। দেখি সারা ঘরে নানা মূর্তির ভাঙা টুকরো ছড়ানো। কিন্তু সবই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। কিছু কিছু মূর্তির জোড়া লাগাবার চেষ্টা হয়েছে। আমি বেশ আশ্চর্য হয়েই বললাম। এইসব পাথরের পোড়া মাটির মূর্তি পাত্রের ভাঙা টুকরো এত যত্ন করে রাখার কী আছে?

ইভা সেন মৃদু হাসল। বলল, কথাটা আমাকে বললেন। ওঁর কানে যেন না যায়। এইসব ভাঙা মূর্তির পাত্রের টুকরো এগুলো যে ও কী ভালোবাসে তা বলে বোঝানো যাবে না। অবশ্য তার কারণও আছে। এইসব কোন অজ্ঞাত শিল্পীরা তৈরী করেছে যীশুখৃষ্টের জন্মেরও অনেক আগে। এবার আরো সুন্দর দামী জিনিস দেখাবো আসুন। ইভা একটা সেলফ থেকে একটা বাক্স নামাল। ডালা খুলতে দেখা গেল একটা সোনার ত্রিশূল। আমি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি সবটাই সোনার তৈরী?

নিরেট সোনার। ইভা বলল, আরো বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আর একটা খোপ থেকে ইভা বের করল একটা তরবারির সোনার খাপ। সোনার ওপর লতাপাতার মিনে করা, লাল নীল পাথর বসানো।

তরবারিটা পাওয়া যায় নি। ইভা বলল।

—এটা কি খুব দামী?

—বলতে পারেন অমূল্য।

—সত্যি এত সোনা? আমি বিস্ময়ে বলে উঠলাম!

—হ্যাঁ, সোনা সকলেই ভালোবাসে, আমার স্বামী ছাড়া।

—কেন সোনা ভালোবাসেন না কেন?

—একটা কারণ সোনা অত্যন্ত দামী, যে সব শ্রমিকরা এমনি সোনার জিনিস খুঁড়ে বের করে তাদের টাকা দিতে হয় জিনিসটার ওজনের অনুপাতে।

—বলেন কি? আমি আশ্চর্য হলাম। বললাম, কেন দিতে হয়?

—এ একটা প্রথা বলতে পারেন। কথা হ'ল এতে ওরা জিনিসটা চুরী করবে না। ওরা চুরী করলে তো আর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করবে না। গালিয়ে ফেলবে। কাজেই ওদের সৎ রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা।

ইভা আর একটা খোপ নামাল। কয়েকটা সোনার পানপাত্র তাতে। সুন্দর কারুকাজ করা। কত বছর আগের অথচ কী সুন্দর। হঠাৎ ভুরু

কৌতুকে ইভা একটা পানপাত্রের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আঙুলের নখ দিয়ে ঘষল। সত্যিই মোম লেগে আছে। ইভা বলল, নিশ্চয়ই কেউ এখানে মোম নিয়ে এসেছিল। ইভা পানপাত্রগুলো খোপে রেখে দিল।

ইভা এবার কয়েকটা টেরাকোটা কাজের পাত্র দেখাল। এ্যাণ্টিকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় ইভা সেন কয়েকটা সুন্দর কারুকাজ করা ভাঙা পাত্র নিয়ে এল।

বাইরে এসে দেখি উঠোনে একটা মোড়ায় চন্দ্রা সিং ব'সে আছে। নখে নেল পালিশ লাগাচ্ছে আর মাঝে মাঝে আঙুলগুলো সামনে মেলে ধ'রে পরীক্ষা করছে। ইভা একটা মোড়া টেনে বসে পড়ল। তারপর ভাঙা পাত্রগুলো একটা আঠাজাতীয় জিনিস দিয়ে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। কয়েক মিনিট তাকে কাজ করতে দেখে আমি বললাম, আমি আপনাকে সাহায্য করবো ?

নিশ্চয়ই লেগে পড়ুন। ইভা বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি কাজটা শিখে নিলাম। ইভা সোৎসাহে আমার কাজের প্রশংসা করতে লাগল। চন্দ্রা সিং হঠাৎ ব'লে উঠল, সকলেই কাজ করছে আমিই শুধু নিষ্কর্মার মত বসে আছি। অবশ্য আমি অকর্মার ধাড়ি ঠিকই।

আপনিও লেগে পড়তে পারেন। ইভা সেন বলল তবে বলার ভঙ্গীতে উৎসাহদানের কোন লক্ষণ নেই।

বেলা বারোটা নাগাদ আমরা গেলাম। পরে ডঃ সেন আর প্রীতম সিং হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড দিয়ে কয়েকটা পাত্র পরিষ্কার করল। একটা পাত্রের আসল নীল রঙ্ ফুটে উঠল। অন্যটায় ফুটে উঠল একটা ষাঁড়ের মূর্তি। একেবারে ম্যাজিকের মত ব্যাপার। পাত্রগুলোর গায়ে এঁটেবসা মাটিগুলো এ্যাসিড ঢেলে দিতেই ধোঁয়ার মত উড়ে গেল।

সন্দীপ চ্যাটার্জি আর জয়ন্ত নিজেদের কাজের জায়গায় চলে গেল। রঙ্গনাথন চলে গেল ফটোগ্রাফির ঘরে। ডঃ সুমন্ত্র সেন বললেন, ইভা এবার একটু শুয়ে বিশ্রাম করে নাও।

বুঝলাম দুপুরের দিকে ইভা সেনের একটু ঘুমোবার অভ্যেস আছে।

হুঁ ইভা বলল, ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম ক'রে নিয়ে আমি একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবো।

বেশ। মিস বিশ্বাসও তোমার সঙ্গে থাকবেন। ডঃ সেন বললেন।

না। মাঝে মাঝে আমার একা একা ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে।

আমি কোন কথা বললাম না। নিজের ঘরে চলে এলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ বাইরে এসে দেখি উঠোনে ওড়িয়া ছেলেটা ইভা ওর নাম বলেছিল নাথালু কয়েকটা তামার মূর্তি পরিষ্কার করছে। শোভেন ঘোষ কাজের তদারক করছে। আমি ওদের কাজকর্ম দেখতে এগিয়ে গেলাম। ঠিক তখনই ইভা সেনকে দেখলাম মেন গেট দিয়ে উঠোনে ঢুকছে। তাকে এত উৎফুল্ল কখনো দেখিনি। ওর চোখ দু'টোতে খুশীর আভা আমার নজর এড়াল না। ডঃ সুমন্ত্র সেন ল্যাবরেটরি থেকে এ সময় বেরিয়ে এলেন।

বেরিয়ে এসে ইভার কাছে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে আজকের পাওয়া কাঠের গুটির নেকলেসটা ইভাকে দেখাতে লাগলেন। ডঃ সেনকে বলতে শুনলাম, এবারে আমাদের ভাগ্য সত্যিই ভাল। মূল্যবান অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। অবশ্য আলী সাহেব খুব মনমরা হ'য়ে আছেন। এখন পর্যন্ত কোন ফলক, শিলালিপি কিছু পাওয়া যায় নি।

কেমন যেন নীরস কণ্ঠে ইভা বলল, উনি কিন্তু আমাদের বিশেষ কোন উপকারেই লাগছেন না। তার ওপর বড়ই অলস। সারা দুপুরটাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোন।

সত্যি, ডঃ তালুকদার অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় আমাদের বেশ অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে। এই আলী সাহেব, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অগাধ পাণ্ডিত্য কিন্তু কেমন যেন একটু অনাগ্রহী। একটা পুরোনো ব্রাহ্মীলিপির অনুবাদ সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হ'ল। লিপির সঠিক অর্থটা বোঝাতে পারলেন না। অবশ্য আমি এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না। মনে হয় আলী সাহেবকে আরো, ইভা এসময় আমাকে দেখে বলে উঠল, চলুন চা-টা খেয়ে নিয়ে নদীর দিকে বেড়িয়ে আসি।

চলুন। আমি যেতে রাজী হলাম। একটু আগে ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হয় নি। হয়তো ভাবল এতে আমি মনক্ষুন্ন হয়েছি। কিন্তু আমি তা হই নি।

নদীটা ছোট। খেয়াঘাট আছে। লোকজনের যাতায়াতও এদিকে খুব কম। ওপারের গ্রামটাতে কিছু জনবসতি আছে। নদীটা এখানে বাঁক

নিয়েছে। সূর্যাস্তের খুব দেরী নেই। নরম বিকেল। পাখীপাখালির ডাক শোনা যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে একদল বুনো হাঁস চক্রাকার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বললাম, সত্যিই সুন্দর জায়গাটা।

—শুধু সুন্দর নয়—নির্জনও। ইভা সেন বলল। বললাম আমার ভাবতে আরো মজা লাগছে যে জীবনের কোলাহলকে যেন অনেক দূরে ফেলে এসেছি।

হ্যাঁ জীবনের কোলাহল। 'মিছে এ জীবনের কলরব। ইভা আপনমনেই বলে চলল 'হ্যাঁ নিরাপত্তা সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি।'

বুঝলাম ইভা তার মানসিক অস্থিরতার কারণগুলি মনে মনে বিশ্লেষণ করছে।

তারপর আমরা ফিরে চললাম। ক্যাম্পের কাছাকাছি আসতে ইভা হঠাৎ এত জোরে আমার হাতটা চেপে ধরল যে আমি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম।

ও কে? ও কী করছে এখানে? রুদ্ধশ্বাস স্বরে ইভা বলে উঠল। আমরা ততক্ষণে আমাদের মেন গেটএর কাছাকাছি এসে গেছি। দেখি কোটপ্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে ইভা সেনের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে কী দেখার চেষ্টা করছে। হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের যাওয়ার পথটা ধরে এগিয়ে আসতে লাগল। ইভা আরো জোরে আমার হাতটা চেপে ধরে অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল, মিস বিশ্বাস, মিস বিশ্বাস, তার কণ্ঠস্বর ভীষণ ভয়ার্ত। আমি সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বললাম, কিছু ভাববেন না, ভয়ের কী আছে মিসেস সেন? লোকটি আমাদের অতিক্রম ক'রে গেল। চেহারা দেখে একজন ওড়িয়া ভদ্রলোক ব'লেই মনে হ'ল। ইভা সেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার হাতটা ছেড়ে দিল।

একজন ওড়িয়া ভদ্রলোক। আমি বললাম, এখানে কী কাজকর্ম হয় এসবই বোধ হয় আড়াল থেকে দেখতে এসেছিল। তা ছাড়া জানালা অনেক উঁচুতে। কিছুই দেখতে পায় নি।

হুঁ তাই হবে। কিন্তু হঠাৎ আমার কেমন মনে হল, ইভা থেমে গেল। আমি মনে মনে বললাম, আপনার সেই ভাবনাটাই আমি জানতে চাই। আপনার ভয়ের কারণ ওর মধ্যেই রয়েছে। তবে আমি একটা স্থির সিদ্ধান্তে

এসে পৌঁছলাম যে ভূতটুত নয়, ইভা সেন কোন জলজ্যান্ত মানুষ সম্পর্কেই ভীত। অর্থাৎ তার ভয়ের কারণ ভূতটুত নয়, জলজ্যান্ত মানুষ।

পলাশগড়ে পৌঁছোবার পর এক সপ্তাহের ঘটনাগুলো পর পর বলে যাওয়া আমার পক্ষে মুশ্কিল। তবে এক্সকাভেশনে পার্টির সকলের মধ্যেই একটা অনিশ্চয়তা আর অস্বস্তির ভাব সর্বক্ষণ আমি লক্ষ্য করেছিলাম। জয়ন্ত তো সেদিন বলেই বসল, আর বলবেন না জায়গাটা দিন দিন অসহ্য লাগছে আমার কাছে। গত বছরেও আমরা এসেছিলাম। তখন কিন্তু এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। জয়ন্ত এর বেশী আর কিছু বলল না। একটু চুপ করে থেকে বেশ বিরক্তির ভঙ্গীতে বলল, কিন্তু এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার কারণ যে কি আমি সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। শোভেন ঘোষ কথাটা শুনে কোন মন্তব্য করল না। শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

ইন্দ্রানী সরকারের সঙ্গে কথা বলে আমি কিছুটা বলতে গেলে উপকৃতই হলাম। ইন্দ্রানী বেশ বুদ্ধিমতী আর বাস্তববাদী। অবশ্য তার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হ'ল যে ইন্দ্রানী ডঃ সুমন্ত্র সেনকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে, প্রায় বীরপুজার মত ব্যাপার। সে তো ডঃ সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক বলে বসল। তারপর যোগ করল—

অথচ দেখুন, কত সাদাসিদে মানুষ। জাগতিক ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। একমাত্র মহান পুরুষ যাঁরা তারাই এতটা আত্মভোলা হতে পারেন।

এটা খুবই সত্যি কথা। আমি বললাম।

মনে পড়ছে গত দু'বছরের কথা। ইন্দ্রানী বেশ আবেগের সঙ্গে স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগল, ডঃ সেন, আমি সন্দীপবাবু কাজের মধ্যে দিয়ে কী আনন্দেই না দিনগুলো কেটেছে। সন্দীপবাবু অবশ্য ডঃ সেনের সঙ্গে অনেকদিন এই কাজ করছেন, প্রায় বছর সাত আট। আমি গত তিন বছর হল ডঃ সেনের সঙ্গে কাজ করছি।

সন্দীপবাবুও খুব ভদ্র ভালো মানুষ। আমি বললাম।

হ্যাঁ· আমারও তাই মত। ইন্দ্রানী সংক্ষেপে বলল।

উনি কেমন যেন সব সময়েই চুপচাপ থাকেন। আমি বললাম।

কিন্তু সন্দীপবাবু এ রকম ছিলেন না। তবে ইয়ের পর মানে।

ইন্দ্রানী হঠাৎ থেমে গেল।

কীসের পর? আমি আলোচনাটা চালিয়ে যেতে চাইলাম।

ওঃ ও কিছু না। সবকিছুই চিরদিন একরকম থাকে না। পরিবর্তনকে এড়াবার উপায় নেই। ইন্দ্রানী বলল। আমি চুপ করে থেকে ইন্দ্রানীকে আরো অগ্রসর হবার সুযোগ দিলাম। একটু হেসে ইন্দ্রানী হাল্কাভঙ্গীতে বলতে লাগল, আমাকে যেন রক্ষণশীল ভাববেন না। কথা হচ্ছে কি জানেন, যদি কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের স্ত্রীর প্রত্নতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ না থাকে তবে তার উচিত স্বামীর সঙ্গে এক্সকাভেশনের জায়গায় না আসা। এলে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। এটা মনের ওপর একটা বোঝা ছাড়া কিছুই নয়।

আপনি বোধ হয় চন্দ্রা সিংএর কথা বলছেন। আমি বললাম।

উঁহু বলছিলাম ইভা সেনের কথা। ইন্দ্রানী বলতে লাগল, ইভা সেনের ব্যবহারে চমক আছে। নইলে ডঃ সেন মজবেন কেন, কিছু মনে করবেন না ইতর ভাষাতেই বললাম। কিন্তু আমার মনে হয় এই পলাশগড় ওঁর উপযুক্ত জায়গা নয়। এতে সব ব্যাপারেই জটিলতার সৃষ্টি হয়। ডঃ সুমন্ত্র সেনের মত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি কতকিছু করবার পরিকল্পনা তাঁর অথচ দেখুন, ওঁকে সব সময় ক্লান্ত মনে হয়। সারা চোখেমুখে হতাশার ছাপ। কোথায় সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজের কাজ করে যাবেন তা নয় স্ত্রীর যত সব উদ্ভট যে আর আশঙ্কা সেসব নিয়েই সময় কেটে যাচ্ছে। এরকম একটা পাণ্ডব বর্জিত জায়গা —ইচ্ছে করলে মিসেস সেন এখানে না এসে কলকাতাতেই থাকতে পারতেন। একে তো স্বেচ্ছায় এখানে আসা তার ওপর কোন কাজকর্ম নেই শুধু গজর গজর করা। বোধহয় বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে দেখে ইন্দ্রানী সাবধান হল। বলল অবশ্য সকলের সঙ্গেই উনি চমৎকার ব্যবহার করেন। আদবকায়দায় একজন সত্যিকারের ভদ্রমহিলা সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ বিষয়ে আর বিশেষ কথা হল না। বুঝলাম ঈর্ষা থেকে মেয়েদের মুক্তি নেই তা সে শহরই হোক আর পলাশগড়ের মত পাণ্ডব বর্জিত জায়গাতেই হোক।

ইন্দ্রানী অবশ্য এক্ষেত্রে একটু বেশী এগিয়েছে। সে ইভাকে প্রায় ঘৃণাই করে। রবি বোসও ইভাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

রবি দু'একবার নাকি এই খননকার্য দেখতে এসেছিল তখন থেকেই স্বল্পভাষী শোভেন ঘোষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়।

রবি আর শোভেন ঘোষ যে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এটা এখানে সকলেই জানে। একদিন দুপুরে খাবারের টেবিলে ইভা অবিবেচকের মত একটা মন্তব্য

করে বসল।

মিস রুবি বোস হঠাৎ এখানে আসা বন্ধ করল কেন বোঝা গেল না। সত্যি মেয়েটা বোকা। লক্ষ্য করলাম শোভেন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ইভার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে আছে। যেন বলতে চাইছে এ জন্যে তো আপনিই দায়ী। ইভা মৃদু হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। আলী সাহেব বিড় বিড় করে কী একটা মন্তব্য করল।

বিকেলে জয়ন্ত আমাকে বলল, জানেন মিসেস ইভা সেনকে আমারও ভালো লাগে না। কথা বলতে গেলেই অদ্ভুত সব জ্বালা ধরানো মন্তব্য করে আমাকে থামিয়ে দেন।

মিস বোসের সঙ্গে এই জন্যেই ওর বনে নি। দু'একবার বেশ কথা কাটাকাটিও হয়ে গেছে। রুবি বোস অবশ্য বেশ নীচভাবে আক্রমণ করেছিল। রুবি বোসের ভদ্রতা বোধটা একটু কম। মেজাজটাও সব সময়ে যেন তিরিক্ষি হয়ে থাকে।

তারপর জয়ন্ত যোগ করল, যাই বলুন ইভা সেন রুবির চেয়ে অনেক সুন্দরী, তাছাড়া আকর্ষণ করার অনেক গুণও ওঁর আছে। রুবি বোসের সে ক্ষমতা নেই। ইভা সেন অনায়াসে আলোর মত আপনাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে পারেন।

জয়ন্ত আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

এরপরে দু'টো ঘটনা ঘটল।

এক নম্বর ঘটনা—পাত্রগুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে হাতে দাগ পড়েছিল। দাগ তোলার জন্যে এ্যাসিটোন নামে একরকম জিনিস ব্যবহার করা হয়। আমি এ্যাসিটোন আনতে ল্যাবরটারীতে গিয়েছিলাম। দেখি প্রীতম সিং কোনার একটা চেয়ারে বসে আছেন। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বুঝলাম, গভীর নিদ্রা।

আমি এ্যাসিটোনের বোতলটা নিয়ে চলে এলাম।

বিকেলে চন্দ্রা সিং আমাকে বেশ রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আপনি দুপুরে ল্যাবেরেটরীতে এ্যাসিটোনের বোতল আনতে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ, আমি বেশ অবাকই হলাম, 'কেন বলুন তো ?'

ঐ ওষুধটা এ্যান্টিকারুমেও আছে তা জানেন ?

—না।

আপনি জেনেশুনে ওখানে গিয়েছিলেন, গোয়েন্দাগিরি করতে।

আমি থ' হয়ে গেলাম। বললাম, 'কী বলছেন আপনি ?

আপনি কেন এখানে এসেছেন তাও আমরা জানি। কথাটা বলে ও চলে গেল।

আমি চন্দ্রা সিংএর সঙ্গে আর কথা বাড়ালাম না।

দুই নম্বর ঘটনা—কোত্থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা এসে খাবার ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। ওটাকে রুটির টুকরো দিয়ে কানাভঙ্গীতে প্রলোভিত করতে চেণ্টা করলাম। কিন্তু ওটা ছুটে পালাল। কী এক জেদ চাপল আমার। আমিও ওটার পিছু পিছু ছুটলাম। মেন গেট পেরিয়ে কুকুরটা ছুটল। আমিও ছুটলাম। রাস্তার বাঁকটার মুখে এসে হঠাৎ আলী সাহেব আর আগের দিন দেখা সেই ওড়িয়া ভদ্রলোকটির মুখোমুখি পড়ে গেলাম। দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

আলী সাহেব আমাকে দেখে হাসলেন। তারপর সঙ্গের ভদ্রলোককে ওড়িয়া ভাষায় বললেন।

আচ্ছা চলি।

তারপর আমার সঙ্গে ফিরে আসতে আসতে বলতে লাগলেন। 'জানেন মিস বিশ্বাস—আমি ভীষণ লজ্জায় পড়েছি। আমি একজন লিপিবিশারদ অথচ ওড়িয়া ভাষাটা আমি কিছুতেই কায়দা করতে পারছি না। ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে তাই ওড়িয়া ভাষা মকসো করছিলাম। কিন্তু উনি আমার কোন কথাই বুঝতে পারলেন না শুধু মাথা নেড়ে চললেন। অর্থাৎ আমার সব চেণ্টাই ভস্মে ঘি ঢালা হল।

ডঃ সেন বলেন আমি নাকি সাধু ওড়িয়া ভাষায় কথা বলি তাই আমার কথা সাধারণ ওড়িয়া ভাষীরা বুঝতে পারে না। আর কোন কথা হ'ল না আলী সাহেবের সঙ্গে।

তবে আমার মনে একটা খটকা লাগল। ওড়িয়া ভদ্রলোকটি এখনো এখানে চক্কর কাটছেন কেন ? ব্যাপারটা আমার ভালো লাগল না।

সেই রাত্রেই এক কাণ্ড হল।

তখন রাত প্রায় দুটো হবে। পেশায় আমি নার্স। তাই ঘুমটা আমার বেশ পাতলা। হঠাৎ দরজায় একটা মৃদু শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দোরগোড়া থেকে কার ফিসফিস গলার ডাক শুনলাম।

মিস বিশ্বাস শুনছেন, সিস্টার সিস্টার··· ?

ইভা সেনের কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি উঠে একটা দেশলাই কাঠি জেবলে মোমবাতি ধরালাম।

কোন শব্দ না করে দরজা খুললাম।

দেখি ইভা সেন দাঁড়িয়ে। সারা চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। ফিসফিস করে বলল, আমার পাশের ঘরে এ্যান্টিকা রুমে কে দেয়াল আঁচড়াচ্ছে কেউ ঢুকেছে বোধহয়, নিশ্চয়ই কেউ।

ভাববেন না ভয়ের কিছু নেই।

আপনি সুমন্ত্রকে ডাকুন।

আপনি বিছানায় বসুন। ডঃ সেনকে ডাকছি।

ডঃ সেনের দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। মিনিট কয়েকের মধ্যেই উনি আমার ঘরে এলেন। ইভাকে জিজ্ঞেস করলেন।

কী ব্যাপার ইভা ?

কেউ ঢুকেছে, এ্যান্টিকা রুমে, দেয়াল আঁচড়াবার শব্দ শুনেছি। ইভা সেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। ডঃ সেন আর্তস্বরে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন, এ্যান্টিকা রুমে ? বলেই তিনি ছুটলেন।

আমি একটু বিস্ময়ের সঙ্গে একটা অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। একই ঘটনা দুজনের মধ্যে দু'রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ইভার ভয়টা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত কিন্তু ডঃ সেনের দুশ্চিন্তা দেখা গেল—এ্যান্টিকারুমের মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসগুলোর জন্যে।

হঠাৎ ইভা উঠে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চলুন আমরাও যাই। তাকিয়ে দেখি ইভার চোখেমুখে আতঙ্কের আর চিহ্নমাত্র নেই।

এ্যান্টিকা রুমে এসে দেখি ডঃ সেন আর আলী সাহেব দাঁড়িয়ে। আলী সাহেবও শব্দ শুনেছেন। তাই ব্যাপার কী দেখতে এসেছেন। উনি বললেন, এই ঘরে আমি খুব মৃদু আলোর শিখা লক্ষ্য করেছি। স্লীপার পরতে আর টর্চটা হাতে নিতে যা দেরী ছুটে এসে দেখি এ্যান্টিকা রুম ফাঁকা। জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। ঘরের দরজা কিন্তু বন্ধ ছিল। কিছু খোয়া গেছে কিনা তাই দেখছিলাম। এমন সময় ডঃ সেন এলেন।

মেন গেট বন্ধ ছিল, পাহারাদার জানাল সে কাউকে ঢুকতে দেখে নি। কিন্তু ওর কথাটা কেউ আমল দিল না। কে জানে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল কি না।

ঘরে কেউ ঢুকেছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিছু চুরীও হয় নি।

হতে পারে আলী সাহেব যখন বাক্সগুলো নামিয়ে কিছু খোয়া গেছে কিনা দেখছিলেন হয়তো তখনই ইভা সেন তারই শব্দ শুনেছে। এদিকে আলী সাহেব দুটো ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এক তাঁর জানালার ধারে তিনি পায়ের শব্দ শুনেছেন। দুই এ্যাটিকা রুমে তিনি খুব মৃদু আলো মোমের আলো হওয়াই স্বাভাবিক, লক্ষ্য করেছেন।

আর কেউ কিছু দেখেও নি, শোনেও নি। আমার বর্ণনায় এই ঘটনাটির গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এই ঘটনার পরেই ইভা সেন আমাকে তার মনের সব কথা বলেছিল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ইভা সেন যথারীতি তার ঘরে চলে গেলেন বিশ্রাম আর দিবানিদ্রার জন্যে। আমি তাকে সেল্ফ্ থেকে বই বের করে দিয়ে যখন চলে আসছি তখন ইভা আমাকে ডাকল—

মিস বিশ্বাস যাবেন না, কথা আছে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিন।

দরজা বন্ধ ক'রে আমি একটা চেয়ারে বসলাম। ইভা সেন বিছানা থেকে উঠে ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগল। বুঝলাম কোন ব্যাপারে সে এখনও মনস্থির করতে পারছে না। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

বোধ হয় অবাক হচ্ছেন—এসব আবার কী ?

আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

আপনাকে সব কথা বললো—কাউকে না কাউকে বলতেই হবে, নইলে আমি পাগল হয়ে যাবে।

ইভা হঠাৎ পায়চারী থামিয়ে আমার দিকে তাকাল—

আমার কীসের ভয় আপনি জানেন ?

হ্যাঁ, মানুষের ভয়।

তা ঠিক, কিন্তু ভয়টা কীসের ? ইভা বলল।

আমি নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মৃত্যুর ভয়, ইভা বলতে লাগল, আমার সব সময় ভয় করে কেউ আমাকে হত্যা করতে আসছে। চাপা স্বরে হিস্‌হিসে গলায় কথাটা বলল সে।

আমি ইচ্ছে ক'রেই কোনরকম উৎসাহ বা আশ্চর্য হবার ভাব দেখালাম না। ইভা সেনকে বিকারগ্রস্ত রোগীর মত মনে হচ্ছিল।

ও তাহলে এই ব্যাপার। আমি কতকটা যেন আপনমনেই বলে ফেললাম। ইভা সেন হঠাৎ যেন হেসে উঠল। তারপর হেসেই চলল যতক্ষণ না চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল, এক ফোঁটা জল গাল বেয়ে নেমে এল। বলল—

কত সহজে বললেন আপনিও এই ব্যাপার।

আমি প্রায় জোর করে ইভাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। তোয়ালে ভিজিয়ে এনে কপাল চোখ মুখ হাত মুছিয়ে দিলাম।

এবার বলুন, সব বলতে হবে আমাকে। বেশ জোর দিয়েই বললাম।

অদ্ভুত আপনি। এমনভাবে ভয় দেখাচ্ছেন যেন আমি পাঁচ বছরের খুকী তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—অবশ্য আমাকে সবই বলতে হবে, কাউকে না কাউকে।

বলুন। আমি তাগাদা দিলাম।

আমার বছর কুড়ি বয়েসে বিয়ে হয়েছিল। ১৯৪২ সালে। স্বামী ছিলেন তৎকালীন হোম ডিপার্টমেণ্টের একজন অফিসার।

জানি, আমি বললাম।

কী করে? ইভা ভ্রূভঙ্গী করল।

চন্দ্রা সিং বলেছে। আপনার স্বামী গত যুদ্ধে মারা গেছেন।

সকলেই তাই জানে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। আমি কোনদিন রাজনীতির ধার ধারতাম না। কিন্তু সেই যুদ্ধের সময়ে একটা অদ্ভুত ধারণা আমাকে পেয়ে বসেছিল।

ইংরেজদের আমি আমাদের মিত্র বলে ভাবতাম। ভাবতাম এই যুদ্ধে ইংরেজকে আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্যে করা উচিত। তাহলেই যুদ্ধের শেষে তারা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে যাবে।

তারপর একটু থেমে ইভা বলতে লাগল বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই ঘটনাক্রমে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার স্বামী জাপানীদের গুপ্তচর।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যখন জানলাম যে আমার স্বামীর দেওয়া গোপনা সংবাদের সাহায্যে জাপানীরা একটা যাত্রীবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। কত অসহায় নারী শিশু পুরুষ সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে।

অন্য মেয়ে হলে কী করত জানি না, আমি কিন্তু বাবার কাছে গিয়ে সব খুলে বললাম, বাবা তখন ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ বিভাগে কাজ করতেন। বাবা সব শুনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন সব। শিবতোষ মানে আমার স্বামী

ধরা পড়ল। শিবতোষকে গুলী করে মারা হল।

সাংঘাতিক ব্যাপার। বিস্ময়ের সুরে আমি বললাম।

হ্যাঁ সাংঘাতিক। স্মৃতিচারণ করার ভঙ্গীতে ইভা বলতে লাগল।

ও সত্যিই বড় ভালো ছিল। কোনদিন আমার সঙ্গে গলা চড়িয়ে কথা বলেনি পর্যন্ত, আমাকে ইয়ে সত্যিই ভালোবাসত। কিন্তু আমি দাম দি নি। হয়তো আমি ভুলই করেছিলাম।

বলা মুস্কিল আপনি যা করেছিলেন সেটা ঠিক কি ভুল।

এসব কথা আর কাউকে বলিনি আপনাকেই প্রথম বললাম। এ সবের নথিপত্র শুধু হোম ডিপার্টমেন্টেই আছে। সরকারীভাবে অবশ্য জানান হল যে শিবতোষ যুদ্ধে মারা গেছে। সকলে আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিল সহানুভূতি জানিয়েছিল।

একটু থেমে ইভা সেন বোধহয় তার পরের ঘটনাগুলো ভেবে নিল। তারপর বলতে শুরু করল।

তারপর বিয়ের প্রস্তাব অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। কিন্তু যে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত আমি পেয়েছিলাম তার হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার পাচ্ছিলাম না। তখন মনে হত আমি আর কাউকে কোনদিন বিশ্বাস করতে পারবো না।

খুবই স্বাভাবিক। আমি বললাম।

তারপর একটি যুবককে আমার খুব ভালো লাগল। মনস্থির করে ফেললাম ওকেই বিয়ে করবো। এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল, একটা উড়ো চিঠি পেলাম।

—চিঠি ?

—হ্যাঁ, আমার ভূতপূর্ব স্বামী শিবতোষের কাছ থেকে। চিঠির বক্তব্য ছিল, যদি আমি আবার বিয়ে করি তবে ও আমাকে হত্যা করবে।

—মৃত ব্যক্তির চিঠি ? অসম্ভব।

আমিও প্রথমে ভাবলাম, এ অসম্ভব। হয়তো স্বপ্ন দেখছি নয়তো আমি পাগল হয়ে গেছি। গেলাম বাবার কাছে। এইবার তিনি আসল কথাটা বললেন।

শিবতোষকে গুলী করে মারা সম্ভব হয় নি। সে পালিয়েছিল। তবে সপ্তাহ খানেক পরে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় শিবতোষ মারা গেছে। তার মৃত

দেহও সেখানে পাওয়া গেছে। যেহেতু শিবতোষ শেষ পর্যন্ত মারাই গেছে এইজন্যে বাবা আমাকে আর কিছু বলেন নি।

বাবাকে বললাম, এই চিঠি পেয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে সে বোধহয় বেঁচে আছে।

বাবা বললেন, ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদেহগুলো এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে সঠিক সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এইজন্যে উনি খুব জোর দিয়ে বলতে পারছিলেন না যে শিবতোষ সত্যি মারা গেছে। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস শিবতোষ বেঁচে নেই।

* চিঠিখানা বাঁকা। উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়েই কেউ এই ধরণের চিঠি লিখেছে হয়তো ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা।

ইভা একটু থেমে বলতে শুরু করল, এরপরেও এমনি আরো চিঠি পেতে লাগলাম। কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে শুরু করলেই চিঠি পেতাম।

আচ্ছা চিঠির হাতের লেখাগুলো কি ঠিক শিবতোষবাবুর মতই।

বলা মুস্কিল। কারণ শিবতোষের কোন চিঠি আমার কাছে ছিল না।

চিঠিগুলোতে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে কি বা এমন কোন বিশেষ শব্দ যা থেকে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন পত্রলেখক শিবতোষই।

—না।

—তাহলে অন্য কেউই হবে।

—অসম্ভব নয়। তবে একজনের কথা আমার বিশেষ করে মনে হয়। শিবতোষের এক ছোট ভাই ছিল, তার নাম বরুণ। আমার বিয়ের সময় ও ছিল কিশোর। শিবতোষকে বরুণ দেবতার মত শ্রদ্ধা করতো। শিবতোষও ভীষণ ভালোবাসতো ওকে। হতে পারে সেই বরুণ, এখন বড় হয়েছে সে। ওব দাদার মৃত্যুব জন্যে আমিই দায়ী। কাজেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে হয়তো বরুণই এগিয়ে এসেছে।

অসম্ভব নয়। বাচ্চা ছেলেদের মনে কোন কারণে আঘাত লাগলে ওরা সহজে তা ভোলে না, তারপর ?

তারপর আর বিশেষ কিছু নেই। বছর তিনেক আগে ডঃ সুমন্ত্র সেনের সঙ্গে পরিচয়। পণ্ডিত ব্যক্তি। মন জানাজানি হল, বিয়ে হল, সুমন্ত্র আমার মনটাই বদলে দিল। বিয়ের দিন পর্যন্ত আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম। এই বুঝি চিঠি এল, কিন্তু কোন চিঠি এল না। ভাবলাম পত্রলেখক বোধহয় হাল ছেড়ে

দিয়েছে।

কিন্তু টেবিলের ওপরে রাখা একটা এ্যাটাচি কেস খুলতে খুলতে ইভা বলল, বিয়ের দু'দিন পরে এই চিঠি পেয়েছি, একটা ভাঁজ করা কাগজ ইভা আমার হাতে দিল, ভাঁজ খুললাম' কালির রঙটা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। হাতের লেখাটা মেয়েলি ছাঁদের, চিঠিটায় লেখা।

আমার নির্দেশ অমান্য করেছো। ডঃ সুমন্ত্র সেনকে বিয়ে করেছো। আমার হাত থেকে তোমার নিষ্কৃতি নেই। তোমার মৃত্যু অবধারিত।

ইভা বলতে লাগল, আমি ভয় পেয়েছিলাম সত্যি, তবে আগের মত নয়। সুমন্ত্রর সান্নিধ্য আমাকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করেছিল। তার মাসখানেক পরে আর একখানা চিঠি।

'আমি কিছুই ভুলিনি। আমি পরিকল্পনা মত এগিয়ে চলেছি। মরতে তোমাকে হবেই।

ডঃ সেন এসব জানেন ?

দু'খানা চিঠিই তাকে দেখিয়েছি। সে সমস্ত ব্যাপারটাই ধোঁকাবাজি মনে করল। বলল, কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। একটু থেমে ইভা বলতে লাগল, দ্বিতীয় চিঠিখানা পাওয়ার কয়েকদিন পরেই আমাদের ফ্ল্যাটএর শোবার ঘরে আগুন লাগল। আমরা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ কাপড় পোড়ার গন্ধে আমার ঘুম ভেঙে যায়। জেগে দেখি ওয়ার্ডরোবের কাপড় চোপড় জ্বলছে। তাড়াতাড়ি সুমন্ত্রকে ডেকে তুললাম। একটু দেরী হলেই মশারীতে আগুন লাগত। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। মন ভেঙে গেল আমার। সুমন্ত্রকে সবই খুলে বললাম। আরো বললাম, এ শিবতোষ না হ'য়েই যায় না। ওর আপাত ভদ্র ব্যবহারের পেছনে কঠোরতা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি। সুমন্ত্র কিন্তু আমার মত আতঙ্ক গ্রস্ত হল না। ও তক্ষুনি পুলিশকে খবর দিতে চাইল। কিন্তু আমি রাজী হইনি। তারপর স্থির হল ওর সঙ্গে আমি এখানে চলে আসবো।

একটু থেমে ইভা বলতে লাগল, এখানে এলাম। বেশ ভালোভাবেই দিন কাটছিল। আমিও অনেকখানি নিশ্চিন্ত হলাম। ভাবলাম সব ঠিক হয়ে যাবে। কলকাতা থেকে পলাশগড় অনেক দূর। কিন্তু, আবার চিঠি সপ্তাহ তিনেক আগে পেয়েছি। খুরদাতে চিঠিখানা পোস্ট করা হয়েছে—

"ভেবেছিলে কলকাতা থেকে পলাশগড় অনেক দূরে। কিন্তু তা নয়। আমাদের দূরত্ব কমে আসছে। আমার নির্দেশ অমান্য করেছো। তুমি বাঁচতে পারো না। মৃত্যু সন্নিকট। একটু থামল ইভা। তারপর বলল, তারপর মাত্র এক সপ্তাহ আগে এসেছে এই চিঠিটা। চিঠিটা পোস্টও করা হয় নি। চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়লাম। মাত্র দুটো শব্দ—

"আমি এসেছি।"

ইভা আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চাপাস্বরে বলল, বুঝতে পারছেন? সে আমাকে হত্যা করবেই। এই লোকটি. সে শিবতোষই হোক আর বরুণই হোক। আমাকে সে হত্যা করবেই।

আমি সান্ত্বনা দিলাম, মিছিমিছি সেন আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছেন। আপনার স্বামী রয়েছেন। আমরা রয়েছি। আপনি কিছু ভাববেন না। ইভা যেন আপনমনেই বলে চলল, সেদিন একজন ওড়িয়া ভদ্রলোককে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে দেখে আমি তাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিপাম। আপনাকেও আমায় সন্দেহ হয়েছিল।

বলেন কি? আমি বেশ আশ্চর্য হলাম।

আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। ওঃ। ইভা দুহাতের মধ্যে মুখ ঢাকল আমি ইভাকে একটা বলবর্ধক ওষুধ দিলাম। ওষুধটা খেয়ে ইভা যেন একটু জোর পেল হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হল। বললাম, আচ্ছা, আপনার স্বামীকে মানে শিবতোষবাবুকে দেখলেই তো আপনি চিনতে পারবেন।

অসম্ভব। ইভা মাথা নাড়ল, প্রায় পনেরো ষোল বছর আগের কথা। তাছাড়া বলতে গেলে মাত্র মাস কয়েক আমরা ঘর করেছি।

হঠাৎ ইভা সেন শিউড়ে উঠল। বলে উঠল, একটা মুখ আমি জানালায় দেখেছিলাম, কিন্তু সে মড়ার মুখ জানালার কাঁচের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম, বেশ কয়েকবার হবে, সবাই ছুটে এল, বলল, কোথাও কিছু নেই।

আমার চন্দ্রা সিংএর কথাটা মনে পড়ল।

কোন দুঃস্বপ্ন দেখেন নি তো।

—অসম্ভব।

আমি কথা বাড়ালাম না। ইভাকে শান্ত করবার নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করলাম।

বললাম, 'কোন নতুন লোক এদিকে এলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারবো। আপনি ভাববেন না। এবার শুয়ে বিশ্রাম করুন।'

ইভা সেনের ঘর থেকে বেরিয়ে ডঃ সেনকে খুঁজলাম। ল্যাবরেটরী ঘরের কাছেই তাঁকে পেলাম। ইভার সঙ্গে আমার যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে সবই বললাম। সব শুনে ডঃ সেন বললেন, খুব খুশী হলাম। ওর মনের ভার কমবে এতে। আচ্ছা আপনার কী মনে হয় বলুন তো?

একটু ভেবে বললাম, 'দেখুন চিঠির ব্যাপারটা ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই না। তবে বড্ড মারাত্মক ধোঁকাবাজি।'

হুঁ, আপনার ধারণা মিথ্যে নাও হতে পারে। ওরা দেখছি ইভাকে পাগল করে তুলবে। কিন্তু কে বা কারা যে এর পেছনে আছে?

আমার কেমন মনে হল এর পেছনে কোন স্ত্রীলোক থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। উড়ো চিঠির হাতের লেখাগুলোও মেয়েলি ছাঁদের। হঠাৎ কেন জানি চন্দ্রা সিং এর কথা আমার মনে হল।

হয়তো সে ইভাব পূর্বজীবনের সব কথা জানতে পেরেছে। ঈর্ষার জ্বালা মেটাচ্ছে ইভাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলে। আমি অবশ্য ডঃ সেনকে এসব সন্দেহের কথা বললাম না। কী জানি উনি কী ভাবে নেন। ডঃ সেন বললেন —

যা হোক ইভা যে আপনাকে সব বলেছে এতে বোঝা যাচ্ছে ও আপনাকে বিশ্বাস করেছে। আমার তো বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না কী করলে ও এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবে।

ভাবলাম বলি, স্থানীয় পুলিশকে খবর দিতে, কী ভেবে চুপ করে গেলাম। পরে দেখলাম, ভালই করেছিলাম না বলে।

পরদিন জয়ন্তর খুরদা যাওয়ার কথা কুলিমজুরদের মাইনের টাকা আনতে। প্লেনএর ডাক ধরবার জন্যে আমাদের সকলের চিঠিপত্রই সে নিয়ে যাচ্ছিল। রাত্রে চিঠিগুলো সাজাই বাছাই করতে গিয়ে জয়ন্ত জিভ তালুতে ঠেকিয়ে শব্দ করল, 'না। ইভা সেনের যে কী হয়েছে। আমি আমার চিঠি কখানা দিতে এসেছিলাম।

বললাম, কী হল?

'এই দেখুন, কলকাতায় কাকে চিঠি লিখেছেন, ঠিকানা দিয়েছেন দার্জিলিং রোড, কলকাতা। নিশ্চয়ই গণ্ডগোল আছে কোথাও। উনি বোধহয় শুয়ে পড়েছেন, আপনি একটু ঠিক করিয়ে আনুন।'

ইভা সেন তখন শোবার উদ্যোগ করেছে, সে ঠিকানা ভুল দেখে বেশ লজ্জায় পড়ল। দার্জিলিং রোড কেটে একটা রাস্তার নাম লিখল। ঘরের বাইরে এসে ঠিকানাটার ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। অবিকল সেই উড়ো চিঠির মত হাতের লেখার ছাঁদ। ভাবতে লাগলাম, তবে কি ইভা সেন নিজেই নিজের কাছে চিঠি লিখেছে? ডঃ সেনও সেই সন্দেহ করছেন?

পরের দিন ইভা সেন আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল।

আমি মনে মনে হাসলাম, নার্সজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি রোগিনীরা উত্তেজনার মুহূর্তে আমাদের অনেক গোপন কথা বলে ফেলেন। পরে লজ্জায় পড়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রায় কথা বলাই বন্ধ করে দেন।

আমি কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই ইভা সেনের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। গতদিনের প্রসঙ্গের ধার কাছ দিয়েও গেলাম না।

জয়ন্ত সকালেই চিঠিপত্র আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার ফর্দ নিয়ে চলে গেছে, সেই অর্ধেক ষ্টেশনওয়াগন আর অর্ধেক লরী গাড়িটায়। টাকা তুলবে কেনাকাটা করবে মিস রুবী বোসের সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখা করবে কাজেই ফিরতে ফিরতে তিনটের আগে নয়, মাইনের দিন। খোঁড়াখুঁড়ির কাজকর্মেও বেশ ঢিলে ঢালা ভাব।

নাথালু উঠোনের মাঝখানে বসে মূর্তির ভাঙা টুকরো সাফ করছে আর নাকি সুরে গান গাইছে। শোভেন ঘোষ ভাঙা মূর্তিগুলো সজাই বাছাই করছেন। ডঃ সেন ছাতে। সন্দীপ বাবুর মাটি খোঁড়ার কাজকর্ম দেখাশুনো করতে গেছেন।

ইভা সেন নিজের ঘরে বিশ্রাম করতে গেল। তার জিনিসপত্র ঠিক করে দিয়ে একটা বই নিয়ে আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। তখন প্রায় পৌনে একটা বইখানার নাম 'রাতের আতঙ্ক।'

মুখোশধারী দস্যু,—পিস্তলের গুলী চলছে মুহুর্মুহু, আর্তনারীর চীৎকারে রাত্রির আকাশ কেঁপে উঠছে, বিদ্যুৎবেগে কালো গাড়ি ছুটেছে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর পর মৃত্যু, আমি একেবারে যাকে বলে জমে গেছি। একসময় বই শেষ হল, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট।

হাত মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। নাথালু তখনও

মূর্তির টুকরো সাফ করছে আর নাকি সুরে গান গাইছে। শোভেনবাবু কয়েকটা মাটি খুঁড়ে পাওয়া শিবলিঙ্গ সাজিয়ে রাখছে। আমি ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি ডঃ সেন ছাত থেকে নেমে আসছেন। আমাদের কাছে এসে বেশ খুশীর ভঙ্গীতে বললেন—যাক ছাতের ওপরের শিবলিঙ্গগুলো, ভাঙা মূর্তিগুলো সরিয়েটরিয়ে বেশ সাফ করেছি জায়গাটা। ইভার তো কেবলি অনুযোগ বেড়াবার জায়গা নেই। এইবার ও খুব খুশী হবে। খবরটা ইভাকে দিয়ে আসি। আজকের বিকেলটাও সুন্দর।

ডঃ সেন ইভা সেনের ঘরের দিকে গেলেন। দরজায় টোকা দিলেন। তারপর ভেতরে ঢুকলেন।

বোধ হয় মিনিট দেড়েক হবে। ডঃ সেন বেরিয়ে এলেন। যেন রাতের দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। খুশীতে উচ্ছল একটা লোক এক মুহূর্তের মধ্যে যেন কী হ'য়ে গেছেন। মাতালের মত টলছেন, স্পষ্ট দেখলাম হাত পা কাঁপছে আর এক অদ্ভুত দৃষ্টি চোখে। মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। ভগ্নকণ্ঠে আমাকে ডাকলে, মিস বিশ্বাস, শিগগির, ঘরে ইভা, ওঃ। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন ডঃ সেন।

বুঝলাম একটা কিছু ঘটেছে। ইভার ঘরের দিকে ছুটলাম। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখি, ইভা বিছানার ধারে মেঝেয় পড়ে আছে। আমি ইভা সেনের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। গায়ে হাত দিলাম। গা ঠাণ্ডা।

নার্স জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে মারা গেছে। মৃত্যুর কারণও পরিষ্কার মাথার সামনের দিকে ভারী কোন কিছুর প্রচণ্ড আঘাত। পড়ে থাকার ভঙ্গী দেখে মনে হল বোধ হয় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইভা সেখানেই আঘাত খেয়েছে আর মেঝেয় পড়ে গেছে। মৃতদেহটা আমি নাড়াচাড়া করলাম না।

ঘরের চারদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু নাঃ—সবাই যথাস্থানে আছে যেমনটি আমি দেখে গিয়েছিলাম। জানালা দু'টো বন্ধ, ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো আর হত্যাকারীর লুকিয়ে থাকার মত কোন জায়গাও সেখানে নেই। বোঝাই যাচ্ছে হত্যাকারী অনেকক্ষণ আগেই এখান থেকে স'রে পড়েছে।

দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে এলাম। ডঃ সেনকে দেখলাম একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। শোভেন ঘোষ আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। মৃদুস্বরে

ঘটনাটা বললাম। দেখলাম এমন একটা দুঃসংবাদ শুনেও শোভেন বিচলিত হ'ল না। শুধু চোখের দৃষ্টিটা বিস্ফারিত হ'ল। একটু ভেবে নিয়ে বলল এক্ষুনি পুলিসকে খবর দিতে হবে। আর ঘরটা তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে।' ইভা সেনের ঘরে তালা লাগিয়ে শোভেন চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বলল, চাবিটা আপনি রাখুন। চলুন ডঃ সেনকে ওর ঘরে শুইয়ে দেওয়া যাক।

ডঃ সেনকে তাঁর ঘরে বিছানায় শুইয়ে শোভেন ব্যাণ্ডির খোঁজে বেরোল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রানী সরকারকে নিয়ে শোভেন ফিরে এল। ইন্দ্রানীর চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট। তবে তাকে অনেকটা অবিচলিত মনে হ'ল। তার জিম্মায় ডঃ সেনকে রেখে আমি বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। ডঃ সেনকে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়ানো হল। ঠিক তখনই স্টেশন ওয়াগানটা মেন গেট দিয়ে ঢুকছিল। গাড়ি থেকে নেমে জয়ন্ত তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে ব'লে উঠল 'এই যে মিস বিশ্বাস বলুন কী খবর? উঁহু এতগুলো টাকা নিয়ে এলাম, ডাকাতি হয়নি, লুঠও হয়নি—সাহসটাই হচ্ছে বড় কথা বুঝলেন।—তা' ইয়ে হয়েছে—আপনারা এমন চুপ মেরে গেছেন কেন? ব্যাপারটা কী? এ্যাঁ?

—মিসেস ইভা সেন মারা গেছেন—তাকে হত্যা করা হয়েছে।' শোভেন সংক্ষেপে বলল।

—কী বললেন? জয়ন্তর চোখ দু'টো বিস্ময়ে গোল হ'য়ে গেল। বলল 'ঠাট্টা নাকি?'

—'মারা গেছে?' চন্দ্রা সিং প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল। পেছনে তাকিয়ে দেখি কখন চন্দ্রা সিং এসে দাঁড়িয়েছে। বলল—'খুন হয়েছে?'

—হ্যাঁ। আমি বললাম।

—না।' চন্দ্রা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'অসম্ভব আমি বিশ্বাস করি না। এ নিশ্চয়ই আত্মহত্যা।

—নিজের মাথা থেঁৎলে কেউ আত্মহত্যা করে না।' আমি বললাম। একটা প্যাকিংবাক্সের ওপর চন্দ্রা বসে পড়ে আপন মনেই বলতে লাগল—ওঃ সাংঘাতিক ব্যাপার।' একটু পরে রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল 'এবার কী করবেন? ওর প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না। শোভেন জয়ন্তকে বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন গাড়ি নিয়ে খুরদা চ'লে যান। ডঃ বোসকে খবর দিন। ওখানকার

পুলিশ ইন্সপেক্টর রথীন মিত্র ডঃ বোসের খুবই পরিচিত। ডঃ বোসের বাড়িতেই রথীন মিত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল। রথীন মিত্র যা ব্যবস্থা করার করবেন। আপনি দেরী করবেন না।' জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ স্টেশন ওয়াগনে গিয়ে উঠল। গাড়ি ছুটল খুরদার দিকে। এবার শোভেন আমার দিকে তাকিয়ে বলল আসুন, একটু খোঁজ খবর করা যাক।

গেটের কাছে এসে শোভেন দরোয়ানকে ডাকল 'জগন্নাথ'। জগন্নাথ এগিয়ে এল। ওর চোখে মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। শোভেন ওকে ওড়িয়া ভাষায় কী জিজ্ঞেস করল। জগন্নাথ বিড় বিড় করে ওড়িয়া ভাষায় কী বলতে বলতে বার বার মাথা নাড়তে লাগল।' শোভেন বেশ চিন্তান্বিত স্বরে বলল, 'জগন্নাথ বলছে ও কোন অপরিচিত লোককে ভিতরে ঢুকতে দেখেনি। মনে হয় হত্যাকারী সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে ঢুকেছিল। নাথালুকে ডাকা হ'ল। সেও জোরের সঙ্গে ওড়িয়া ভাষায় কী সব বলতে লাগল। শোভেন ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে আপন মনে বিড় বিড় করে বলল, মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।' কিন্তু ব্যাপারটার কী তা আমাকে বলল না।

ঘণ্টা কয়েক পরে ইন্সপেকটার রথীন মিত্র এলেন। সঙ্গে ডাঃ বোস। খাবার ঘরে বসে রথীন মিত্র সকলের জবানবন্দী নিতে লাগলেন।

ডাঃ বোস আমাকে অফিস ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে বললেন, 'বসুন মিস বিশ্বাস। তারপর একটা নোটবই বের ক'রে বললেন 'আমি সব বক্তব্য লিখে রাখছি শুধু আমার জন্যে। আপনি এখানে আসার পর যা দেখেছেন শুনেছেন সব বলুন তো? আমি এক এক ক'রে সব ঘটনা বলে গেলাম। বিশেষ করে ইভার প্রথম বিবাহ স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ, উড়ো চিঠি পাওয়া সবাই খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব'লে গেলাম। ডাঃ বোস কিছু লিখলেন, কিছু শুনলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো মিসেস সেনের মৃতদেহ ডঃ সেন ঠিক কখন দেখেছিলেন?

—প্রায় পৌনে তিনটে।

—কী ক'রে বললেন?

—আমি বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় হাতঘড়ী দেখেছিলাম। তখন তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি ছিল।

—আচ্ছা—মৃত্যুর সময়টা কখন ব'লে আপনার মনে হয়?

—আজ্ঞে আমি ঠিক—আমি চুপ ক'রে গেলাম।

—আপনি একজন অভিজ্ঞ নার্স আপনার পক্ষে এটা বলা খুব কঠিন কিছু না।

- আমার মনে হয় পৌনে দু'টো নাগাদ।

—আমিও মৃতদেহ পরীক্ষা ক'রে ঐ সিদ্ধান্তে এসেছি। মৃত্যুর সময় দেড়টা নাগাদ অর্থাৎ ১-১৫ থেকে ১-৪৫ মিনিটের মধ্যে।' একটু থেমে বললেন 'এমন একটা বিশ্রী ঘটনা—যাকগে—আপনি কোন শব্দটব্দ শুনেছিলেন ?'

—না। শুধু নাথালুর গান শুনেছিলাম আর ছাত থেকে ডঃ সেন শোভেন বাবুকে ডাকাডাকি করছিলেন শোভেন বাবু নাথালুকে বকাবকি করছেন এমনি সব শব্দ শুনেছিলাম।

—নাথালু। হুঁ।' ডাঃ বোস ভুরু কোঁচকালেন।

এমন সময় অফিস ঘরে রথীন মিত্র ও ডঃ সেন এলেন। ডঃ বোস ডঃ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি এসেছেন অবশ্য এ অবস্থায় আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করা—কিন্তু এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার। যাক গে মিস বিশ্বাসের কাছে সবই শুনলাম। আচ্ছা আপনি চিঠিগুলো দেখাতে পারেন ?

—ইভার এ্যাটাচি কেসএ চিঠিগুলো পাওয়া যাবে।

ডাঃ বোস রথীন মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—যে ক'রেই হোক লোকটাকে ধরতেই হবে।' আমি বললাম আপনারা কি বিশ্বাস করেন লোকটা মিসেস ইভা সেনের ভূতপূর্ব স্বামী ?

—আপনি কী বিশ্বাস করেন না ? রথীন মিত্র বলল।

—দেখুন ব্যাপারটা সন্দেহ মুক্ত নয়। তবু সঠিক কিছু বলা—আমি দ্বিধার সঙ্গে কথাটা অসম্পূর্ণ রাখলাম। ডঃ বোস বললেন—যাই হোক যে ভাবেই হোক এই উম্মাদ লোকটাকে ধরতেই হবে।

—ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছেন ততটা সহজ নয়। রথীন মিত্র বললেন।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল সেই ওড়িয়া ভদ্রলোকের কথা। তাকে দু'বার যেমন দেখেছিলাম, সে সমস্ত ঘটনাটাই আমি বললাম। রথীন মিত্র বললেন 'ভালই হ'ল ঐ লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর ডঃ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ভালো ক'রে শুনুন ডঃ সেন। আপনার এক্সকাভেশন পার্টির সকলকে জবানবন্দী থেকে আমি যা জেনেছি তাই বলছি।' নোটবইয়ে টোকা নোট দেখে দেখে রথীন মিত্র বললেন—দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর প্রায় সওয়া বারোটার সময় মিস বিশ্বাস মিসেস ইভা সেনকে তার ঘরে শোবার

বন্দোবস্ত করে দিয়ে চলে আসেন। আপনি ডঃ সেন তখন ছাদে উঠলেন। তারপরের দু'ঘণ্টা আপনি ছাতেই ছিলেন।

—হ্যাঁ।

—আপনি কি ঐ সময়ের মধ্যে কখনো নেমে এসেছিলেন ?

—না।

—কেউ কি আপনার কাছে এসেছিল ?

—হ্যাঁ, শোভেনবাবু মাঝে মাঝে ছাদে এসেছেন। দু'এক মিনিট থেকে আমাকে একটু সাহায্য করেই আবার নাথালুর কাজকর্ম তদারক করতে নীচে চলে গেছেন। একসময় একটা বড় শিব লিঙ্গ সরাতে পারছিলাম না। তখন শোভেনবাবুকে ডাকি। উনি এসে আমাকে সাহায্য করেন। তখন উনি একটু বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন।

—কতক্ষণ ?

—দেখুন কাজে মেতে গেলে আমার খাবার সময় জ্ঞান থাকে না। হবে হয় তো মিনিট দশেক।

—এবার তাহলে ডঃ সেন আপনার এক্সকাভেশন পার্টির সকলে আজ দুপুর একটা থেকে দু'টোর মধ্যে কে কোথায় ছিলেন আর কী করছিলেন তার একটা ফিরিস্তি দিচ্ছি। সকলের জবানবন্দী থেকে এটা আমি সাজিয়েছি—

১। প্রতীমা সিং ল্যাবেরটরীতে কাজ করছিলেন।

২। চন্দ্রা সিং নিজের ঘরে চুল শাম্পু করছিলেন।

৩। ইন্দ্রানী সরকার অফিস ঘরে কাজ করছিলেন।

৪। রঙ্গনাথন ডার্করুমে ফটো প্লেট ডেভলাপ করছিলেন।

৫। আলী সাহেব নিজের ঘরে কাজ করছিলেন।

৬। সন্দীপ চ্যাটার্জী খননকার্যের দেখাশুনা করছিলেন।

৭। জয়ন্ত নন্দী খুরদার গিয়েছিলেন।

এবার আপনার চাকর-দরোয়ানরা—রাধুনী, মেন গেটএর কাছে দারোয়ান জগন্নাথের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। একজন চাকরও সে সময় ওখানে গিয়ে আড্ডা জমিয়েছিল প্রায় আড়াইটে পর্যন্ত।

সেই সময়ের মধ্যে আপনার স্ত্রী খুন হয়েছেন।

ডঃ সেন সম্মুখের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন—

—আপনি এসবের দ্বারা কী বলতে চাইছেন ?

—আচ্ছা উঠোনের দিক দিয়ে ছাড়া আপনার স্ত্রীর ঘরে ঢোকার অন্য কোন পথ তো নেই।

—না। দু'টো জানালা আছে কিন্তু সে দুটোয় গরাদ রয়েছে। তা ছাড়া জানালা দু'টো ভালো করে বন্ধ করা ছিল।

রথীন মিত্র বললেন—যাই হোক জানালা দুটো খোলা থাকলেও ঘরের ভেতরে ঢোকার কোন উপায় ছিল না। দুটো জানালারই গরাদ মজবুত। এখন হত্যাকারীকে আপনার স্ত্রীর ঘরে ঢুকতে হ'লে তাকে মেন গেটএর মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হয়েছে উঠোনও পেরোতে হয়েছে। কিন্তু আপনার চাকরবাকর দরোয়ান সকলেই বলেছে তারা কোন অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেখেনি বেরোতেও দেখে নি।

—আপনি কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন।' ডঃ সেন একটু জোরেই বলবেন—ডাঃ বোস এবার গম্ভীরস্বরে বললেন—। ডঃ সেন—অপ্রিয় হলেও সত্য কথাটা এই যে—হত্যাকারী বাইরে থেকে আসেনি—মিসেস ইভা সেনকে খুন করেছে আপনার এস্কাভেশন পার্টির কেউ।

—অসম্ভব।' ডঃ সেন বেশ জোর দিয়ে বললেন—'এখানে সকলের সঙ্গে ইভার একটা সহৃদয় সম্পর্ক ছিল।'

—ওটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত—ডাঃ সেন বললেন—'তা ছাড়া কারো সঙ্গে' যদি তিক্ত সম্পর্ক হ'য়ে থাকত তারা কি সে কথা বলে বেড়াত ?

আচ্ছা এও তো হ'তে পারে যে হত্যাকারী কোথাও আত্মগোপন করেছিল।

—সেটা সম্ভব নয়। মিসেস সেনের ঘরে লুকোবার মত জায়গা নেই। তাছাড়া উঠোনে শোভেনবাবু আর নাথালু প্রায় সর্বক্ষণ ছিল।' রথীন মিত্র বললেন—'আপনি বলছেন যে প্রায় দেড়টার সময় শোভেনবাবু ছাতে মিনিট দশেকের জন্য আপনার সঙ্গে ছিল।

—হ্যাঁ।

—সেই সময় নাথালু সুযোগ পেয়ে মেন গেটের কাছে অন্য চাকরবাকরদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিল। শোভেনবাবু নীচে এসে তাকে ডাকাডাকি করেছিল। এই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে সেই দশ মিনিটের মধ্যে আপনার স্ত্রীকে হত্যা করা হ'য়েছে।

ডঃ সেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'আপনারা ব্যাপারটাকে কাকতালীয় ক'রে তুলছেন।'

ডাঃ বোস বললেন, 'মানে আপনি বলতে চাইছেন ঘটনার যোগাযোগ। তাহ'লে এমনি একটা ঘটনার যোগাযোগের কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। কী বলেন রথীনবাবু ?

হ্যাঁ বলুন। কারণ এটাকে আমি সাধারণ খুনের ঘটনা বলে মনে করি না।

ডঃ সেন—ডাঃ বোস বললেন, 'আপনি বিতংস চৌধুরীর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

মনে হচ্ছে শুনেছি। উনি বোধহয় প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

হ্যাঁ প্রখ্যাত ডিটেকটিভ। উনি মাদ্রাজে একটা তদন্তের ব্যাপারে গিয়েছিলেন। ঘটনার ফেরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হ'য়েছে। উনি আজ রাত্রেই খুরদায় আমার বাড়িতে আসছেন। এই কেশটা হাতে নেওয়ার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করতে হবে।

উনি কি রাজী হবেন ?

ব'লেই দেখুন মনে হয় রাজী হবেন।

বেশ।' ডঃ সেন উঠে দাঁড়ালেন। গভীর দুঃখে তাঁর চোখ দু'টো অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল।

ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন 'আমি এখনও—বুঝতে পারছি না—বিশ্বাস করতে পারছি না—ইভা সত্যিই মারা গেছে। ডঃ সেন এর এই কথা আমার মনে খুব লাগল। ব'লে উঠলাম, 'ডঃ সেন, কান্নাই পেল আমার—'আমি—আমি ব'লে বোঝাতে পারবো না—কী খারাপ লাগছে আমার—আমার কর্তব্য থেকে আমি বিচ্যুত হ'য়েছি। আমার কর্তব্য ছিল মিসেস সেনকে নজরে রাখা—ক্ষতি থেকে তাঁকে রক্ষা করা।

ডঃ সুমন্ত্র আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালেন। বললেন আস্তে আস্তে না—না নার্স, আপনার অনুশোচনার কোন কারণ নেই। আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি যে ইভার কোন সত্যিকারের বিপদ হতে পারে।' ডঃ সেনএর চোখমুখ কুঁচকে উঠলো। বললেন, 'আমিই ইভার মৃত্যুর জন্য দায়ী—হ্যাঁ আমার অসাবধানতার জন্যেই—নাঃ আমি আর ভাবতে পারছি না।' ডঃ সেন মন্থর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডাঃ বোস আমার দিকে তাকালেন। বললেন—

আমারও এমনি একটা ধারণা ছিল। ভেবেছিলাম সবই ইভা সেনের কল্পনা। নার্ভের দুর্বলতা। কিন্তু—

আমিও ব্যাপারটা অত গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনি।' আমিও স্বীকার করলাম।

আমাদের ভুল হ'য়েছিল।' গম্ভীর গলায় ডাঃ বোস বললেন।

তাই মনে হচ্ছে। রথীন মিত্র বললেন।

বিতংস চৌধুরীকে প্রথম দেখে বলতে গেলে আমি বেশ হতাশই হলাম। এত বিখ্যাত মানুষ কিন্তু চেহারার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। ভেতো বাঙালীমার্কা চেহারা। বেশ রোগা, কণ্ঠনালীর ভাঁজ স্পষ্ট, মাথার চুল কদমফুল ছাঁট, পরণে ফুলশার্ট সাধারণ কাটএর প্যান্ট চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। উনি যখন ডাঃ বোস আর ডঃ সেনের সঙ্গে হেঁটে উঠোন পেরিয়ে খাবার ঘরের দিকে আসছিলেন, লম্বা চেহারা নিয়ে বকের মত তাঁর হাঁটার ভঙ্গী দেখে আমি তো প্রায় হেসেই ফেলেছিলাম। এই লোক কিনা ইভা সেনের হত্যা রহস্যের সমাধান করবে? আমার চোখমুখে হয়তো আমার মনের ভাবটা ফুটে উঠেছিল। বিতংস চৌধুরী আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় যেন আপন-মনেই বললেন--'রান্না সুস্বাদু হ'য়েছে কিনা সেটা শুধুমাত্র খাওয়ার পরই বলা চলে।' বুঝলাম কথাটার লক্ষ্য আমি।

খাবার ঘরে একটা সভামত বসল। এক্সকাভেশন পার্টির সকলেই এখানে একত্রিত হলেন। সামনে বসলেন বিতংস চৌধুরী। তাঁর দু'পাশে ডঃ সেন আর ডাঃ বোস।

ডঃ সেন প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন। বিতংস চৌধুরীর নাম আপনারা শুনেছেন। অনেক জটিল হত্যারহস্যের সমাধান ক'রে উনি ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন।

উনি ইভার হত্যা রহস্যের ব্যাপারে তদন্ত করতে খুনীকে খুঁজে বের করতে সম্মত হয়েছেন। এমন একটা ঘটল—অতি শোকাবহ—আমি তো বটেই আমরা সকলেই এর সমাধান চাই। ডঃ সেন বসতেই চন্দ্রা সিং চেঁচিয়ে উঠল—

তাকে ধরতেই হবে।

কা'কে? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন। কতকটা আচমকা।

কা'কে আবার? খুনীকে।

ওঃ খুনীকে।' কথাটা বিতংস এমনভাবে বললেন যেন খুনীর কথাটা তাঁর মনেই ছিল না।

বিতংস পকেট থেকে নাস্যির কৌটো বের করলেন। সশব্দে একটিপ নাস্য নিলেন। আমরা সকলেই বিতংসর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনিও চশমার মধ্যে দিয়ে আমাদের সকলের খুনের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—ডঃ সেন ও ডাঃ ঘোসের কাছ থেকে আমি সবই শুনেছি। ইন্সপেক্টর রথীন মিত্রের কাছে দেওয়া আপনাদের জবানবন্দীও আমি দেখেছি। একটু থেমে খুব সহজভঙ্গীতে বললেন, দেখে মনে হচ্ছে, খুনটুনের ব্যাপারে আপনাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।

সকলের মধ্যে গুঞ্জন উঠ্‌ল। বিতংস হাসলেন। বললেন, তাহলে বোঝা গেল আপনারা খুনের 'অ আ'ও জানেন না। এ ব্যাপারে অনেক বলা যাক, অপ্রীতিকর দিক আছে। প্রথমেই আসে, সন্দেহ।

সন্দেহ ! ইন্দ্রাণী সরকার যেন আচমকা বলে এল।

বিতংস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়লেন। বললেন, এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা কেউই সন্দেহমুক্ত নন। এমন কি রাঁধুনী নয়, দারোয়ান চাকর, নাথালু, কেউ নয়।

চন্দ্রা সিং উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, আপনার সাহস তো কম নয়।

ডঃ সেন আমরা এতে অপমানিত বোধ করছি।

হ্যাঁ আমরা অপমানিত বোধ করছি। প্রীতম সিংও গলা মেলাল।

বিতংস ডান হাতের চেটো তুলে বললেন, না-না। আপনাদের অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্যও লক্ষ্য সত্য।

এখন এই লক্ষ্য পৌঁছোতে গেলে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে সন্দেহ থেকে। তাই অপ্রিয় হলেও আমাকে একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হবে।

সেটা তাড়াতাড়ি সারুন। আলী সাহেব বলে উঠলেন।

তাহ'লে, আলী সাহেব আপনাকে দিয়েই শুরু করি। বিতংস বললেন।

—বেশ।

—আপনি তো এইবারের এক্সকাভেশনে প্রথম এসেছেন।

—হ্যাঁ।

– কবে নাগাদ এসেছেন ?

সপ্তাহ তিনেক আগে। আলী সাহেব বললেন।

– কোত্থেকে আসছেন ?

আলীগর য়ুনিভার্সিটি থেকে।

আচ্ছা আপনি কি আগে মিসেস ইভা সেনকে চিনতেন ?

না। এখানে এসে পরিচয় হয়েছে।

—আপনি কী বলতে পারেন—হত্যার ঘটনার সময় আপনি কী করছিলেন ?

—আমি নিজের ঘরে ছিলাম।

—কী করছিলেন ?

একটা ভাঙা শিলালিপির পাঠোদ্ধার করছিলাম।

আমি লক্ষ্য করলাম যে বিতাংস চৌধুরীর হাতের কাছে এই ক্যাম্পের একটা খসড়া নক্সা রয়েছে।

আপনার ঘরটা তো দক্ষিণ দিকে ?

—হ্যাঁ।

—ইভা সেনের ঘরের ঠিক বিপরীতে ?

—হ্যাঁ।

আপনি কখন আপনার ঘরে ঢুকেছিলেন ? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পরেই। বলতে পারেন একটা বাজার মিনিট কুড়ি আগে।

আর আপনি বরাবর ঘরেই ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কতক্ষণ পর্যন্ত ?

তিনটে পর্যন্ত। স্টেশন ওয়াগনটা ফিরে আসার শব্দ শুনেছিলাম। আবার শব্দ শুনলাম ওটা বেরিয়ে গেল। অবাক হলাম গাড়িটা এসে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল। কী ব্যাপার তাই জানতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

তার আগে একবারও ঘর থেকে বেরোননি ?

না—একবারও না।

এমনি কি কিছু দেখেনও নি বা শোনেনও নি যাতে কোন সন্দেহ হয় ?

—না।

উঠোনের দিকে কোন জানালা আপনার ঘরে নেই।

না। দুটো জানালাই গ্রামাঞ্চলের দিকে।

উঠোনে কি হচ্ছে কারা কাজ করছে এসবের কোন শব্দ পান নি ?

বিশেষ কিছু না। একবার কি দুবার শোভেনবাবু আমার ঘরের সামনে

দিয়ে ছাতে উঠেছিলেন।

সেই সময়টা বলতে পারেন ?

উঁহু— বলতে পারবো না। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিতংস জিজ্ঞেস করলেন—

এই খুনের ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন বা মতামত দিতে পারেন ?

—মানে ?

মানে সন্দেহের উদ্রেক হয় এমন কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন ?

—না

খুনের ঘটনার আগের কোনদিন ?

আলী সাহেব একটু অস্বস্তি করলেন। কিছুটা প্রশ্নের ভঙ্গীতে ডঃ সমন্ত্র সেনএর দিকে তাকালেন। তারপর একটু গম্ভীরভঙ্গীতে বললেন।

প্রশ্নটা কঠিন। তবে যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলবো যে মিসেস সেন কোন ব্যাপারে বা কোন মানুষ সম্পর্কে ভীতাত্ত ছিলেন বিশেষ করে অজানা অচেনা কাউকে দেখলে উনি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়তেন। মনে হয় এর কারণ ছিল তবে সেটা কী আমি জানি না। কিছুই জানি না। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে কিছু বলেনওনি।'

বিতংস একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। একটা কাগজে কিছু নোট করা ছিল বোধহয়। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, দু'দিন আগে একটা চুরির ব্যাপার ঘটেছিল। তাই কিনা ?

হ্যাঁ আলী সাহেব বললেন 'তবে কিছু চুরী যায় নি। এই কথা বলে তিনি এ্যান্টিকারুমে আলো দেখা, পায়ের শব্দ শোনা, এই সব ঘটনাই বললেন, বিতংস বললেন

. আপনার কী মনে হয় ? সেই রাতে বাইরের কেউ এখানে ঢুকে ছিল ?

আমার তো মনে হয় না। কিছু চুরীও যায় নি কোন ঝামেলাও হয় নি।

মনে হয় নাথালুটাথালু ওসব ছেলেছোকরার কাজ।

অথবা এই এক্সকাভেশন দলেরই কেউ ?

তাই যদি হবে এক্সকাভেশন দলের কেউ তো বলে নি কিছু।

তাহলে বাইরের লোকই হবে।

আমার তাই মনে হয়। আলী সাহেব বললেন।

ধরে নিলাম বাইরের লোকই এতোছিল। কিন্তু তার পক্ষে কি সেই রাত থেকে দু'দিন পর্যন্ত এখানে কোথাও তার আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব ছিল? বিতংস প্রশ্নটা করে একবার আলী সাহেবের দিকে আর একবার ডঃ সেনএর দিকে তাকালেন।

আমার তো মনে হয় সেটা অসম্ভব নয়।' ডঃ সেন বললেন তারপর আলী সাহেবকে বললেন আলী সাহেব আপনার কী মনে হয়।

না না অসম্ভব।

বিতংস ইন্দ্রানী সরকারকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার কী মনে হয়? এটা সম্ভব?

একটু ভেবে নিয়ে ইন্দ্রানী সরকার মাথা নাড়ল। বলল—না আমার মনে হয় না এটা সম্ভব। একটা লোক এখানে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে? ডার্করুমে ল্যাবরেটরির সব ঘরেই তো পরদিন কাজ হয়েছে। অন্য ঘরগুলোতে আমরা থাকি। ঘরগুলোতে কোন আলমারী নেই, কাবার্ডও নেই। কোথায় লুকিয়ে থাকবে সে? তবে চাকর-বাকরদের ঘরে—

তার সম্ভাবনা থাকলেও সম্ভব নয়। বিতংস বললেন।

বিতংস এবার আলী সাহেবের দিকে তাকালেন, বললেন আর একটা কথা কদিন আগে নার্স সন্ধ্যা বিশ্বাস আপনাকে একজন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছেন। উনি তার আগে সেই লোকটিকে দেখেছেন জানালা দিয়ে উঁকি মারতে। মনে হচ্ছে লোকটা ইচ্ছে করে এ জায়গায় চক্কর দিচ্ছে।

হ্যাঁ সেটা সম্ভব। আলী সাহেব গম্ভীরস্বরে বললেন।

আচ্ছা সেই ব্যক্তিটি কি আগে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল না আপনি আগে কথা বলেছিলেন? আলী সাহেব মনে করবার চেষ্টা করলেন। মনে হচ্ছে না ঐ ভদ্রোলোকই আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল।

আপনাদের মধ্যে কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল?

খুবই সাধারণ এবার কেমন গরম পড়েছে, এসময় এ দিকে বৃষ্টি হয় কিনা ধানচাষ কেমন হয়েছে—এসব আসল কথা আমি ওড়িয়া ভাষা কতটা শিখতে পেরেছি তারই পরীক্ষা করছিলাম।

ও তা সেই ভদ্রলোক দেখতে কেমন? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন। আবার আলী সাহেব ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন—

বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ চেহারা। ফর্সামত তবে লক্ষ্যনীয় হচ্ছে ভদ্রলোক

ট্যারা।

বিতংস আমার দিকে তাকালেন এই বর্ণনার সঙ্গে কি আপনি একমত? আমি বললাম—একটু দ্বিধার সঙ্গেই—

না। বেঁটে নয় বেশ লম্বা সেই ভদ্রলোক। গায়ের রং বেশ ময়লা রোগামত চেহারা। ট্যারা নয়।

বিতংস হতাশার ভঙ্গী ক'রে কাঁধ ঝাঁকালেন। বললেন—দু'জন লোকের বর্ণনা কখনও একরকম হয় না। পুলিশমহল তাই বলে।

আমি নিশ্চিত যে লোকটা ট্যারা ছিল আলী সাহেব বললেন তবে অন্যবিষয়ে মিস বিশ্বাস ঠিকই বলেছেন। আমি ফর্সা বলতে বুঝেছিলাম ওড়িয়াদের সাধারণ গায়ের রং এর চেয়ে ফর্সা মিস বিশ্বাস সেটাকেই ময়লা বলছেন।

বেশ কালো। আমি বললাম।

লক্ষ্য করলাম ডঃ বোস ঠোঁট টিপে হাসছেন।

বিতংস দুহাত ছড়িয়ে বললেন 'অপরিচিত ভদ্রলোকটি এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হয়তো ব্যাপারটা গুরুত্ব পূর্ণ হয় তো না। যাহোক ভদ্রলোকটিকে পাকড়াও করতে হবে। এবার জিজ্ঞেসাবাদ শুরু করছি। বিতংস একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গীতে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর রঙ্গনাথের দিকে ফিরে বললেন—

এবার আপনি। মিঃ রঙ্গনাথেনের মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল আমি?

হ্যাঁ। অপর নাম ও বয়েস?

আমার নামটি রঙ্গনাথন। বয়েস আটাশ।

মাদ্রাজী?

হ্যাঁ।

এবারই প্রথম এসেছেন?

হ্যাঁ। ফটোগ্রাফ তোলার দায়িত্বে আছি।

ও হ্যাঁ। গতকাল দুপুরে কী করছিলেন?

প্রায় সারা দুপুর ডার্করুমে ছিলাম।

প্রায়—তাই না।

হ্যাঁ। কয়েকটা প্লেট ডেভলাপ করছিলাম। তারপর ক'টা জিনিসের

ফটো তুলতে তৈরী হচ্ছিলাম।

বাইরের উঠোন ?

না না, ডার্করুমের মধ্যে।

তা'হলে আপনি একবারও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন নি ? বিতংস জানতে চাইল।

না।

উঠোনে কিছু দেখেছিলেন ?

রঙ্গনাথন মাথা নাড়ল। বলল—'আমি কিছু লক্ষ্য করি নি। ব্যস্ত ছিলাম। গাড়িটা ফিরে আসার শব্দ পেয়েছিলাম। তখনই বাইরে বেরিয়ে চিঠির খোঁজে এসেছিলাম। তখনই ব্যাপারটা শুনলাম।

আপনার ঘরে আপনি কখন কাজ শুরু করেছিলেন ?

প্রায় একটা বাজতে দশ মিনিট তখন।

এই এক্সকাভেশনের কাজে আগে আপনি কি মিসেস ইভা সেনকে চিনতেন।

রঙ্গনাথন মাথা নাড়ল। বলল—'এখানে আসার আগে মিসেস সেনকে কোনদিন চোখেই দেখি নি।

এ সময় কোন ঘটনা—যত সামান্যই হোক—আপনার নজরে পড়েছিল ? একটু অসহায় ভঙ্গীতে রঙ্গনাথন বলল—'না তেমন কিছু আমার নজরে পড়েনি।

বিতংস এবার শোভেন ঘোষের দিকে তাকালেন। শোভেন ঘোষ বলল—আমি মাটির পাত্রগুলো সাফ করছিলাম। নাথালু এসব কাজ করছিল পাত্রগুলো সাজাচ্ছিল। কখনও কখনও ছাতে উঠেছি। ডঃ সেনকে সাহায্য করেছি। পৌনে একটা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত কাজ করছিলাম।

কতবার ছাতে উঠেছিলেন ?

মনে হয় বার চারেক।

কতক্ষণ ছিলেন ?

মিনিট কয়েক তার বেশী নয়। একবার ছাতে মিনিট দশেক ছিলাম। ডঃ সেনের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম কোন কোন জিনিস রাখবো কোনগুলো ফেলে দেব।

তারপর আপনি যখন নেমে এলেন দেখলেন যে নাথালু নিজের কাজে ফাঁকি দিয়ে আড্ডা দিতে গেছে।

হ্যাঁ। আমি বেশ রেগে চীৎকার ক'রে নাথালুকে ডেকেছিলাম। ও

বাইরে গেটের কাছে ছিল। ওখানেই দারোয়ানদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল।

নাথালু এখানে ছিল না এমন একটা সময় পাচ্ছি।

আমি কয়েকটা পাত্র নিয়ে যেতে নাথালুকে দু'একবার ছাতে পাঠিয়েছিলাম।' শোভেন বলল।

একটু গম্ভীর স্বরে বিতংস বলল—'আপনাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করা বৃথা যে সেই সময় আপনি কাউকে মিসেস ইভা সেনের ঘরে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছিলেন কিনা।' শোভেন বলে উঠল—

আমি কাউকে দেখি নি। দু'ঘণ্টা ধরে কাজ করছিলাম আমি। ততক্ষণ উঠোনে কেউ আসে নি।

কিন্তু ঠিক বেলা দেড়টার সময় আপনি ছাতে গিয়েছিলেন আর নাথালু গেটএ আড্ডা দিতে গিয়েছিল। সেই সময়টুকু উঠোনটা কিন্তু ফাঁকা ছিল।

সেই সময়টা অবশ্য সঠিক আমি বলতে পারছি না। শোভেন বলল। বিতংস ডাঃ বোসের দিকে তাকালেন। বললেন—'আপনার হিসেবে মৃত্যুর সময়টা ঐ বেলা দেড়টাই তো?

হ্যাঁ।' ডাঃ বোস বললেন।

বিতংস চশমাটা খুললেন। রুমাল দিয়ে চশমাটা মুছতে মুছতে বললেন বেশ গম্ভীর স্বরে—'তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে মিসেস ইভা সেনের মৃত্যু হয়েছিল ঐ দশ মিনিটের মধ্যে।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। একটা আতঙ্কের পরিবেশ। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম ডঃ বোস এর অনুমান সত্য। ঐ দশ মিনিটের মধ্যেই ইভার মৃত্যু হ'য়েছে। ইভার ঘরেই ইভাকে হত্যা করা হ'য়েছে। আর একটা কথা ভেবে গা শিউরে উঠল—এখানে যারা বসে রয়েছি—খুনী রয়েছে আমাদের মধ্যেই। এই সত্যটা চন্দ্রা সিংএর মনেও হয়তো ধাক্কা দিয়েছিল। চন্দ্রা সিং তীক্ষ্ন শব্দ ক'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—'আমি—আমি পারলাম না —আমি—ওঃ কী সাংঘাতিক।

মন শক্ত কর—চন্দ্রা—। স্বামী প্রীতম সিং বলল। প্রীতম আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভীষণ অনুভূতিপ্রবন মন ওর—বড় তীব্র ওর অনুভূতি। আপনারা কিছু মনে করবেন না।

আমার—আমার কত ভালো লাগত মিসেস সেন কে।' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চন্দ্রা বলে উঠল। তখনই লক্ষ্য করলাম বিতংস আমার দিকে তাকিয়ে

আছেন। মুখে মৃদু হাসি।

বিতংস আবার জেরা শুরু করলেন। চন্দ্রা সিংকে বললেন—'গতকাল ঐ সময় আপনি কী করছিলেন ?

আমি মাথা ঘষছিলাম।' ফোঁপাতে চন্দ্রা সিং বলল—'ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা। আমি খোশমেজাজে ছিলাম। ব্যস্তও ছিলাম।

নিজের ঘরেই ছিলেন ?

হ্যাঁ।

কখনও বাইরে আসেননি ?

না। গাড়ি আসার শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। তখনই শুনলাম মিসেস ইভা সেনকে খুন করা হ'য়েছে। ওঃ—কী সাংঘাতিক।

আপনি কি এতে আশ্চর্য হ'য়েছিলেন ? বিতংস হঠাৎ ব'লে বসলেন। চন্দ্রা সিং এর ফোঁপানি থেমে গেল। বেশ রাগত চোখে সে বিতংসর দিকে তাকাল। বলল—

আপনি কি বলতে চাইছেন মিঃ চৌধুরী ? আপনি কি বলতে চান - ?

কী আর বলতে চাইবো বলুন। আপনি এইমাত্র বললেন আপনার খুব ভালো লাগত মিসেস সেনকে। উনি তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার কাছে কিছু আত্মস্বীকৃতি দিয়েছেন।

ওঃ—না—না—উনি আমাকে কিছু বলেন নি—সঠিকভাবে—মানে—। অবশ্য আমি দেখেছি মিসেস সেন কোন ব্যাপারে খুব বিব্রত আর ভীত ছিলেন। অদ্ভুত সব কান্ডকারখানা—জানালায় মড়ার মুখ—জানলায় টোকা দেওয়া—এই সব আর কি।

এবার আমি না ব'লে পারলাম না—'আপনি আমাকে বলেছিলেন ওসব ছিল ইভা সেনের কল্পনা—।' আমি দেখে খুশী হলাম যে আমার কথায় চন্দ্রা সিং বেশ বিব্রত বোধ করল। বিতংসর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম উনি বেশ মজা পাচ্ছেন। বিতংস বললেন—'তাহ'লে মিসেস সিং—আপনার বক্তব্য হ'ল—আপনি মাথা ঘষছিলেন—কিছু শোনেন নি দেখেনও নি। এখন আপনার এমন কিছু বলবার আছে কি যা আমাদের তদন্তের ক্ষেত্রে উপকার লাগবে ?

চন্দ্রা সিং ব'লে উঠল—'না—তেমন কিছু শুনিওনি-দেখিওনি। অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে খুনী বাইরে থেকে এসেছিল।

এটাই যুক্তিসঙ্গত।' বিতংস এবার চন্দ্রার স্বামী প্রীতম সিংএর দিকে তাকালেন—'মিঃ সিং আপনি কী বলেন? প্রীতম সিং একবার দাড়িতে হাত বুলোল। বেশ নার্ভাস মনে হল তাকে। বলল—

হ'তে পারে—হ'তে পারে। সে বলল—'কিন্তু কেন সে মিসেস সেনের ক্ষতি করবে। কত ভদ্র কত নরম স্বভাবের ছিলেন তিনি।' প্রীতম মাথা ঝাঁকাল। বলল—'যে তাঁকে হত্যা করেছে—সে উন্মাদ—হ্যাঁ—উন্মাদ ছাড়া কিছু নয়।

এবার আপনি বলুন তো—গতকাল দুপুরটা আপনি কীভাবে কাটিয়েছিলেন?

আমি?' প্রীতম সিং শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

প্রীতম – তুমি ল্যাবরেটারিতে ছিলে।' চন্দ্রা সিং দ্রুত ব'লে উঠল।

আঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই তো—ল্যাবরেটারিতে কাজ করছিলাম।

কখন ল্যাবরেটারিতে গিয়েছিলেন?' প্রীতম আবার অসহায় ভঙ্গীতে স্ত্রী চন্দ্রা সিংয়ের দিকে তাকাল। চন্দ্রা সিং বলে উঠল—

একটা বাজার দশ মিনিট আগে তুমি ল্যাবরেটারিতে গিয়েছিলে।

বাইরের উঠোনে কখনও বেরিয়ে এসেছিলেন?

না –।' প্রীতম ভাবল। বলল—'না – আমি কখনো বাইরের উঠোনে আসি নি।'

খুনের কথাটা আপনি কখন শুনলেন?' বিতংস জিজ্ঞেস করলেন।

আমার স্ত্রী এসে আমাকে বলেছিল। সাংঘাতিক—আমি খবরটা শুনে মর্মাহত হ'য়েছিলাম। আমি প্রথমে বিশ্বাসই করি নি। এখনও বিশ্বাস হয় না।' হঠাৎ প্রীতম এর শরীরটা কাঁপতে লাগল। বলতে লাগল—'কী

সাংঘাতিক কী সাংঘাতিক।' চন্দ্রা সিং তাড়াতাড়ি স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল—'হ্যাঁ প্রীতম—তাই। আমরা সবাই সেটা বুঝতে পারছি। আমরা ছেড়ে দেব না। ডঃ সেনের কথাটা একবার ভবো।'

লক্ষ্য করলাম ডঃ সেনের মুখে একটা বেদনার ছায়া দ্রুত ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। এই আবেগগ্রস্ত পরিবেশটা উনি বোধহয় সহ্য করতে পারছিলেন না। বিতংসর দিকে তাকালেন তিনি। কেমন একটা আর্তি তাঁর চোখমুখে ফুটে উঠল। বিতংস সেটা বুঝলেন। তিনি তৎপর হলেন। ইন্দ্রানী সরকারের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—

মিস ইন্দ্রানী সরকার?

মনে হচ্ছে আমি আপনাকে বিশেষ কিছু বলতে পারবো না।' বেশ শান্ত সুচিন্তিত ভঙ্গীতে সে বলল। তারপর বলল—'আমি শোবার ঘরে ছিলাম। প্রাসাটিকে কিছু ছাপ তুলছিলাম।'

এবং আপনি কিছু দেখেনওনি কোন শব্দও শোনেন নি।

না।

ইন্দ্রানী সরকারের 'না' বলার মধ্যে একটু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করলাম। বিতংসের নজরও এড়াল না সেটা। বললেন—'মিস সরকার আপনি কি নিশ্চিত, না অস্পষ্ট কিছু মনে পড়ছে।

না—ঠিক তা নয়—মানে—'

আপনি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিলেন—ঠিক মনে করতে পারছেন না।

না—না।' ইন্দ্রানী জোরের সঙ্গে বলল।

তাহ'লে শব্দটা নিশ্চয়ই কিছু শুনেছিলেন। হ্যাঁ—আপনি অবশ্য এ ব্যাপারে খুব নিশ্চিত নন।

ইন্দ্রানী বিরক্তির হাসি হাসল। বলল—মিঃ চৌধুরী আপনি বড্ড চাপা-চাপি করছেন। আপনি আমার কাছ থেকে না শুনতে চাইছেন সেটা আমার কল্পনাও হ'তে পারে।

তাহলে আপনি কিছু কল্পনা করেছিলেন? বিতংস বললেন।

ইন্দ্রানী সরকার আস্তে আস্তে বলল, কিছুটা নিস্পৃহভঙ্গীতে—"আমার কল্পনা হয় তো, যেহেতু সেদিন দুপুরে আমি খুব অস্পষ্ট একটা চীৎকারের মত শুনেছিলাম। ঠিক চীৎকার শুনেছি কিনা তাও বলতে পারছি না। আমার শোবার ঘরের সব জানালাই খোলা ছিল। দূরে চাষীরা চাষটাষ করছে। যেখান থেকে সবরকম শব্দ ভেসে আসছিল। তখন থেকে আমার মাথায় একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যেন ঐ চীৎকারটা মিসেস ইভা সেনের তারপর থেকেই আমার মনটা খারাপ। যদি আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে উঠে ইভা সেনের ঘরে ছুটে যেতাম, কে বলতে পারে, হয়তো ইভা সেনকে বাঁচাতে পারতাম। ডঃ বোস বললেন ঐ ধারণাটা মন থেকে দূর করুন। কারণ আমি নিঃসন্দেহ যে খুনী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস সেনএর মাথায় আঘাত করেছিল। সেই আঘাতে মিসেস ইভা সেন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। দ্বিতীয়বার আর আঘাত করার প্রয়োজন ছিল না, করা হয়ও নি। নইলে মিসেস সেন নিশ্চয়ই চীৎকার ক'রে উঠতেন সাহায্য চাইতেন। বেশ জোরেই চীৎকার করে

উঠতেন।

তবু' ইন্দ্রানী বলল, আমি খুনীকে ধরতে পারতাম।

সেই সময়টা বলুন তো ? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন—

'আপনার কি মনে হয় বেলা দেড়টা তখন।

হ্যাঁ একটু ভেবে ইন্দ্রানী বলল, নিশ্চয়ই ও সময়।

সময়টা মিলে যাচ্ছে। চিন্তিত স্বরে বিতংস বললেন—আর কোন শব্দ শোনেন নি—দরজা খোলা বা বন্ধ করার শব্দ বা ওরকম কিছু।

—ইন্দ্রানী সরকার মাথা নাড়ল। বলল—না ওরকম কিছু মনে পড়ছে না।

আমার ধারনা আপনি টেবিলের কাছে বসেছিলেন ?

হ্যাঁ।

কোনদিকে মুখ করে বসেছিলেন ? উঠোনের দিকে ?

বারান্দার দিকে না এ্যান্টিকা রুমের দিকে ?

উঠোনের দিকে।

আপনি কি ওখান থেকে নাথালুকে কাজ করতে দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ যদি তাকাতাম। কিন্তু আমার নিজের কাজে এত ব্যস্তছিলাম যে—

যদি উঠোনের দিককার জানালার ধার দিয়ে কেউ যেত আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতেন ?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

এবং ওরকম কেউ যায় নি ?

না।

কিন্তু ধরুন একজন লোক উঠোনে মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল। সেটা কি আপনার নজরে পড়ত ?

হয়তো নয়, তবে যদি মুখ তুলতাম, জানালা দিয়ে চাইতাম, নিশ্চয়ই আমার নজরে পড়ত।

আপনি লক্ষ্য করেন নি যে নাথালু, কাজে ফাঁকি দিয়ে গেটএ গিয়ে অন্য চাকরবাকরদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছে।

না আমি দেখি নি।

দশ মিনিট, বিতংস বিড় বিড় করে বললেন সেই মারাত্মক দশ মিনিট।

কিছুক্ষনের নীরবতা।

ইন্দ্রানী সরকার এবার মাথা উঁচু করল। নড়েচড়ে বসে বলল দেখুন বিতংসবাবু আমি বোধহয় অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু বলে ফেলেছি। এতে আপনার তদন্তের অসুবিধে হবে।

ঠিক বুঝলাম না। বিতংস বললেন।

আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না ইভা সেনের ঘর থেকে আমি কোন চীৎকার শুনেছিলাম কি না। তার ওপর ইভা সেনের ঘরের জানালাগুলো বন্ধ ছিল।

যাক গে বিতংস নরম স্বরে বললেন, এই নিয়ে ভাববেন না। এই ব্যাপারটার তেমন গুরুত্ব নেই।

তা নেই সত্যি কথা। আমি বুঝি সেটা। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার কেমন মনে হচ্ছে আমি একটা কিছু করেছি। ডঃ সুমন্ত্র সেন সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, ঐ নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ করো না ইন্দ্রানী। বিবেচক হও। হয় তো দূরের গ্রামের দিকে চাষাভূষোরা পরস্পর কে ডাকাডাকি করছিল। তুমি হয় তো সেই শব্দই শুনে থাকবে। ইন্দ্রানীর চোখমুখ একটু লাল হল ডঃ সেনের কথা শুনে। লক্ষ্য করলাম ইন্দ্রানীর দুচোখে জলের আভাস। ও একপাশে মুখটা সরাল। একটু যেন কর্কশভঙ্গীতে বলল, হয় তো তাই। কোন দুঃখদায়ক ঘটনার পরে আমরা অনেকিছু কল্পনা করি যা আদৌ সত্যি নয়।

বিংতস আবার তাঁর নোটবই দেখতে লাগলেন। সন্দীপ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ চ্যাটার্জী আপনার বোধহয় আর কিছু বলার নেই। সন্দীপ বলল—

আমি দুঃখিত, আপনার তদন্তে সুবিধে হয় এমন কোন তথ্য আমি দিতে পারবো না। আমি খোঁড়াখুঁড়ির জায়গায় ছিলাম। খবরটা আমি ওখানেই পেয়েছিলাম।

খুনের ঘটনার আগের দিনগুলোর ঘটেছে এমন কোন ঘটনা কি আপনার মনে পড়ছে মানে যা আমাদের তদন্তে কাজে লাগবে।

না এমন কোন ঘটনা আমার জানা নেই। সন্দীপ বলল।

বিতংস এবার জয়ন্ত নন্দীর দিকে তাকালেন, মিঃ নন্দী আপনি।

আমি তো তখন বাইরে খুরদার যাচ্ছি। জয়ন্তর বলার ভঙ্গীটি অনুশোচনার মত শোনাল গতকাল আমি খুরদা গিয়েছিলাম। মাইনের টাকা পয়সা আনতে ফিরে এসেছি তখনই শোভেনবাবু মুখে সব শুনলাম। তারপরেই আমি গাড়ি

নিয়ে আবার খুরদা গেলাম। পুলিশ আর ডঃ বোসকে আনতে।

এসবের আগে ?

দেখুন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চলছিল। সে সব আপনি শুনেছেন। এ্যানিটকারুমে চোরের আবির্ভাব জানালায় মড়ার হাত মড়ার মুখ এসব তো ডঃ সেন জানেন। ডঃ সেন মাথা একটু নীচু করে সমর্থন জানালেন জয়ন্ত বলে চলল মানে শেষে দেখবেন যে বাইরের কোন রামশ্যাম যদু এসবের মূলে।

বিতংস দু' এক মিনিট চুপ করে জয়ন্ত কথাগুলো ভাবলেন—

আপনি তো বাঙালী।

শুধু বাঙালী নই কাঠ বাঙালী।

এবারই প্রথম এই দলের সঙ্গে এসেছেন। বিতংস বললেন।

ঠিক তাই।

প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে আপনার খুব উৎসাহ তাই কিনা।

জয়ন্ত অপ্রতিভ হল স্কুলের দুষ্টু ছেলেদের মত আড় চোখে একবার মিঃ সুমন্ত্র সেনের দিকে তাকিয়ে নিল। আমতা আমতা করে বলল হ্যাঁ অবশ্যই— মানে এসব খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু আমি মানে খুব একটা বুদ্ধিবৃত্তি নেই— জয়ন্ত কেমন যেন ভেঙে পড়ল। বিতংস আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। চিন্তিত ভঙ্গিতে টেবিলে পেন্সিল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন। টেবিলে কাত হয়ে পড়ে থাকা একটা দোয়াতদানি সন্তর্পণে সোজা করে বসিয়ে দিলেন বললেন এখন পর্যন্ত তদন্তের কাজে যতটা এগোনো সম্ভব এগোনো গেছে। এরপরে কারো যদি কিছু মনে পড়ে যত সামান্যই হোক—

আমার কাছে আসতে দ্বিধা করবেন না। এখন আমি ডঃ সুমন্ত্র সেন ও ডাঃ বোসের সঙ্গে কিছু কথা বলবো। সভা শেষ। সকলেই উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল। আমিও বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। পেছন থেকে বিতংস ডাকলেন, মিস বিশ্বাস, আপনি থাকুন। আপনার সাহায্য প্রয়োজন হবে আমাদের।

আমি ফিরে এসে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসলাম।

ডাঃ বোস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সবাই চলে গেলে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। উঠোনের দিকের জানালাও বন্ধ ক'রে দিলেন। অন্য জানালাগুলো বন্ধ ছিল। নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। বিতংস বললেন —এখন আমরা মন খুলে কথা বলতে পারি। এক্সকাভেশন পার্টির সকলের কথাই শুনলাম। কিন্তু, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়ে আপনি কী

ভাবছেন ? আমি একটু লজ্জিত হলাম। বুঝলাম বিতংসবাবুর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ম। বলে উঠলাম।

না। কিছু না।

উঁহু নিশ্চয়ই কিছু। বলে ফেলুন। আমি দ্রুত বলে উঠলাম।

সত্যি কিছু নয়। একটা কথা মনে এল, এখানে এই এক্সকাভেশন পার্টিতে যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউ যদি কিছু জানেনও বা সন্দেহও করেন তবু তাঁরা তা মুখ খুলে বলবেন না। বিশেষ করে ডঃ সুমন্ত্র সেনের সামনে।

আমি অবাক হলাম যখন বিতংস চৌধুরী সজোরে মাথা নেড়ে আমাকে সমর্থন করলেন। বললেন—

সংক্ষেপে তাই দাঁড়াচ্ছে। আপনি ঠিক বলেছেন। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। রেসকোর্সে ঘোড়দৌড়ের আগে দেখেছেন তো ঘোড়াগুলোকে দর্শকদের সামনে আনা হয়। আমিও সবাইকে তাই একত্রিত করেছিলাম। একটু পরখ করছিলাম সবাইকে আবার বিচার করেও দেখছিলাম কে সম্ভাব্য খুনী।

ডঃ সুমন্ত্র সেন চীৎকার করে বলে উঠলেন, অসম্ভব। আমার এক্সকাভেশন পার্টির কেউ এই খুনের ব্যাপারে জড়িত এ আমি বিশ্বাস করি না। তারপর উনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি মি: চৌধুরীকে সব গুছিয়ে বলুন তো ?

কী বলবো ?' আমি বললাম।

আমার স্ত্রী আপনাকে ঠিক ঠিক কী বলেছে ? আর আপনি কী ঘটতে দেখেছেন।

আমি এবার যতটা সম্ভব সঠিকভাবে ইভা সেনএর সঙ্গে কী কথা হয়েছে সব বললাম। কী ঘটেছে তাও বললাম। বিতংস বললেন, খুব সুন্দর। আপনার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। এখানে আপনাকে আমাদের প্রয়োজনে লাগবে।

এবার বিতংস ডঃ সুমন্ত্র সেনের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন।

আপনার কাছে চিঠিগুলো আছে ?

আমার সঙ্গেই আছে। জানতাম আপনারা দেখতে চাইবেন।

বিতংস চিঠিগুলো নিলেন। পড়লেন। বিবেচনা করতে লাগলেন। আমি বেশ হতাশ হলাম যখন দেখলাম বিতংস চিঠির কাগজগুলোর ওপর

পাউডার জাতীয় পদার্থ ছড়ালেন না, অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা তেমনি কোন যন্ত্র দিয়ে চিঠিগুলো পরীক্ষা করলেন না।

বুঝলাম, বিতংস একেবারে যুবক নয়। মধ্যবয়স্কা কাজেই তার তদন্তের পদ্ধতি খুব আধুনিক নয়। বিতংস শুধু চিঠিগুলো পড়লেন যেমন আর পাঁচজন যে ভঙ্গীতে চিঠি পড়ে থাকে সেইভাবে। একটিপ নস্যি নিলেন। গলটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, এখন আসুন ঘটনাগুলোকে রীতিসম্মতভাবে পর পর সাজানো যাক। মিঃ সেন প্রথম চিঠিটা পাচ্ছি যেটা ইভা দেবী আপনার সঙ্গে বিয়ের পরে, পরেই পেয়েছিলেন। তার পরেও চিঠি এসেছিল কিন্তু ইভা দেবী সেগুলি নষ্ট করে ফেলেছিলেন। আপনাদের শোবার ঘরে আগুন লেগেছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন আপনারা। আপনারা কলকাতা ছাড়লেন। প্রায় বছর দুয়েক কোন চিঠি এলো না। কিন্তু এখানে পলাশগড়ে খনন কার্য শুরু হ'ল এ বছরে। আর এ বছরেই ইভা দেবী আবার চিঠি পেলেন। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে ইভা দেবী চিঠি পেতে লাগলেন।

ঠিক। সুমন্ত্র সেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন।

আপনার স্ত্রী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর আপনি ডাঃ সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে নার্স মিস সন্ধ্যা বিশ্বাসকে আনালেন। ইভা দেবীকে সঙ্গদানের জন্য। ভয় ভাবনা থেকে তিনি যাতে মুক্ত হন তার জন্য।

—হ্যাঁ।

এরমধ্যে কিছু ঘটনা ঘটল, জানালায় টোকা দেওয়ার শব্দ জানালার মড়ার মুখ, এন্টিকারুমে শব্দ। আপনি নিজে কি এসব শুনেছেন বা দেখেছেন?

—না।

মোদ্দা কথা ইভা দেবী ছাড়া এসব কেউ দেখে নি, শোনেও নি।

আলী সাহেব এ্যান্টিকারুমে মৃদু আলো দেখেছিলেন।

হ্যাঁ, ওটা আমি ভুলি নি।

একটু চুপ করে থেকে বিতংস বললেন।

ডঃ সেন, আপনার স্ত্রী কি কোন উইল করেছিলেন?

আমার তা মনে হয় না।

কেন?

ইভা সম্পত্তি টম্পত্তি এসব নিয়ে খুব একটা ভাবতো না।

তিনি কি ধনী মহিলা ছিলেন না ?

হ্যাঁ তার জীবিতকালে, ইভার বাবা ইভার জন্যে বেশ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। ইভার মৃত্যু হলে তার সন্তানদেরই তা পাওয়ার কথা। কোন সন্তানাদি না থাকলে কলকাতার মহামায়া আশ্রম সব পাবে।

বিতংস টেবিলে মৃদুভাবে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বললেন—

তাহলে হত্যার একটা উদ্দেশ্য বাদ যাচ্ছে। ইভা দেবীর মৃত্যুতে কে লাভবান হবে ? কেউ না মহামায়া আশ্রম। যদি ইভা দেবীর যথেষ্ট অর্থ সম্পত্তি থাকতো তাহ'লে প্রশ্ন দাঁড়াতো এই অর্থ সম্পত্তি কে পাবে ? মিঃ সেন আপনি না ইভাদেবীর ভূতপূর্ব স্বামী শিবতোষ ? কিন্তু ইভাদেবীর ভূতপূর্ব স্বামী এখন আত্মপ্রকাশ করলে কী হবে জানি না।

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে হয় তো দণ্ড হতে পারে। একটু থেমে বিতংস বলতে লাগলেন, এক্ষেত্রে আপনি সন্দেহের বাইরে। কারণ প্রথমত, গতকাল বিকেলে আপনি আপনার স্ত্রীর ঘরে একবারও যান নি। দ্বিতীয়ত, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুতে আপনার কোন লাভ নেই বরং ক্ষতি। তৃতীয়ত, বিতংস থামলেন।

বলুন ? ডঃ সুমন্ত্র সেন বললেন।

তৃতীয়ত, স্ত্রীর প্রতি আপনার প্রেম অকৃত্রিম। আপনার জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে এই প্রেম। তাই কিনা ?

হ্যাঁ। ডঃ সুমন্ত্র সেন সহজভঙ্গীতে বললেন।

ডঃ বোস একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, এই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ভালো করে বিবেচনা করতে হবে।

বিতংস ডাঃ বোসের দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে বললেন, অধৈর্য হবেন না। আমি চাই সব তদন্ত রীতি পদ্ধতি মেনে হোক। আমি এভাবেই সমস্যার মোকাবিলা করি। এটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে কেউ কিছু গোপন করবে না। স্পষ্টভাবে নির্দ্বিধায় সব বলবে।

তা ঠিক। ডাঃ বোস বললেন।

সেইজন্যেই আমি যা সত্য তা জানতে চাই।

ডঃ সুমন্ত্র সেন একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন—

আমি আপনাকে নিশ্চিত বলতে পারি মিঃ চৌধুরী আমি কিছু গোপন করিনি। যা জানি সব বলেছি। আমার আর কিছু বলার বাকি নেই।

উঁহু, আপনি সব বলেন নি। বিতংস বললেন।

হতে পারে। কোনটা হয়তো বলতে ভুলে গেছি। বিতংস আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, যেমন আপনি বলেন নি স্ত্রীর দেখাশুনোর জন্যে একজন নার্স মিস বিশ্বাসকে বহাল করেছিলেন কেন?

ডঃ সেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। বললেন, কিন্তু আমি তো সেটা ব্যাখ্যা করেছি। এটা অবশ্য প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল। আমার স্ত্রীর নার্ভাস হ'য়ে পড়া তার অসুস্থতার ভয় .....

বিতংস ঝুঁকে বসলেন। বললেন, না—না, এর মধ্যে কিছু একটা আছে পরিষ্কার নয়। আপনার স্ত্রী বিপদে পড়েছিলেন ঠিক, তাঁকে খুনের ভয় দেখানো হচ্ছিল ঠিক। কিন্তু এজন্যে আপনি পুলিশের কাছে গেলেন না, কোন বেসরকারী গোয়েন্দাকেও লাগালেন না, কিন্তু একজন নার্স রাখলেন। এর পেছনে কোন যুক্তি নেই।

আমি—আমি—ডঃ সেন চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল। বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম, তারপরে আর একটা কথাও বললেন না।

সেই প্রসঙ্গেই আসছি, বিতংস বললেন, আপনি ভেবেছিলেন, কী ভেবেছিলেন?

ডঃ সেন চুপ করে রইলেন। তাঁকে ক্লান্ত মনে হ'ল।

বিতংস বললেন, শুধু এটা ছাড়া আপনি সব কথাই বলেছেন। একজন নার্স রাখা হল কেন? তার উত্তর আছে হ্যাঁ। আসলে তার একটা উত্তরই আছে। আপনার স্ত্রীর জীবন সংশয়ের ব্যাপারে আপনার নিজের ওপরেই আপনার বিশ্বাস ছিল না।

ডঃ সেন একটা আর্ত চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, ভগবান জানেন—আমি এটা ভাবি নি।

তাহলে আপনি কী ভেবেছিলেন? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জানি না, আমি জানি না।

কিন্তু আপনি জানেন, ভালোভাবেই জানেন। আচ্ছা ডঃ সেন আপনার কি একবারও সন্দেহ হয়েছিল যে এই চিঠিগুলো ইভাদেবী কোন অজ্ঞাত কারণে নিজেই নিজের কাছে লিখেছিলেন?

ডঃ সেনের উত্তর দেবার কিছু ছিল না। আমি জোরে শ্বাস নিলাম।

আমারও যে এমনি একটা সম্ভাবনার কথা আবছা মনে হয়েছিল সেটা দেখলাম সত্য। আমি নিজের অজান্তেই সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছিলাম। দেখি বিতংস আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন—

মিস বিশ্বাস আপনিও কি তাই মনে করেন ?

আমার এরকম একটা আবছা ধারণা হয়েছিল। আমি বললাম।

—কী কারণে ?

আমি সেই ঘটনাটা বললাম। ভুল ঠিকানা মিসেস ইভা সেনকে দিয়ে শেষরাতে গিয়ে এই হাতের লেখার মিল লক্ষ্য করেছিলাম। সে কথা বললাম।

ডঃ সেন আপনিও কি এই মিল লক্ষ্য করেছিলেন ? বিতংস বললেন হ্যাঁ আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিছু কিছু চিঠির সঙ্গে ভীষণ মিল ছিল। কথাটা বলে ডঃ সেন কোটের ভেতরের পকেট থেকে ইভার একটা পুরোনো চিঠি বার করলেন। বিতংসকে দিলেন। বিতংস খুব মনোযোগ দিয়ে ঐ চিঠি এবং উড়ো চিঠিগুলো পড়লেন বললেন হুঁ—যথেষ্ঠ মিল রয়েছে হাতের লেখায়। খুব সম্ভব চিঠিগুলো একই ব্যক্তির লেখা। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

বিতংস এবার চেয়ারে হেলান দিলেন। চিন্তিতস্বরে বললেন তিনটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। প্রথমত—এই লেখার মিলটা কাকতালীয় ব্যাপার। দ্বিতীয়ত—এই শাসানি দেওয়া চিঠিগুলো মিসেস ইভা সেন নিজেই নিজেকে লিখেছেন। তৃতীয়ত—অন্য কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করে ইভা দেবীর হাতের লেখা নকল করে এই চিঠিগুলো লিখেছে। কিন্তু কেন ? মনে হয় এটা অর্থহীন। এই সম্ভবনাগুলোর মধ্যে অন্তত একটা সত্যি। একটু থেমে বিতংস ভাবলেন। তারপর ডঃ সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, ইভাদেবী নিজেই নিজেকে চিঠি লিখছেন এই ধারণটা আপনার প্রথম কবে মনে হয়েছিল ?

ডঃ সেন মাথা ঝাঁকালেন বললেন, এই ধারণটা আমার মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজগুবী ব্যাপার।

আপনি কি এর ব্যাখা খুঁজেছিলেন ?

একটু দ্বিধার সঙ্গে ডঃ সেন বললেন হয়ে হতে পারে ইভা নিজের অজান্তেই চিঠিগুলো নিজের কাছে নিজেই লিখেছে। অতীতের চিন্তাভাবনাগুলো ওর মনে এমনভাবে গেঁথে বসেছিল আর ওসব নিয়ে এত ভাবতো এটা অসম্ভব

নয়। ডঃ বোস কী বলেন ?

এটা সম্ভব। ম্যুরেভ সাহেবের মনের ত্রিভুরত্ত্ব অনেক আপাতত অসম্ভবকে সম্ভব বলে থাকে। ডঃ বোস বললেন। বিতংস এবার বললেন চিঠির ব্যাপারটা খুব আকর্ষনীয় কিন্তু এখন সমস্ত ঘটনাটার কথাই বিবেচনায় আনতে হবে। অবশেষে আমরা তিনটি সম্ভাব্য সমাধান দেখতে পাচ্ছি।

এক—সবচেয়ে সহজ সমাধান—ইভা দেবীর প্রথম স্বামী শিবতোষ এখনও জীবিত। তিনি প্রথমে ইভা দেবীকে শাসিয়েছেন। পরে সেই শাসানি অনুযায়ী কাজ করেছেন। যদি এই সম্ভাবনাটা আমরা মেনে নিই তাহলে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে শিবতোষ কী করে সকলের অলক্ষ্যে ইভা দেবীকে খুন করলেন ?

দুই—মিসেস ইভাসেন কী কারণে তা তিনিই জানেন—নিজেই নিজেকে চিঠি লিখতেন। ঘরে আগুন লাগার ব্যাপারটার জন্যেও দায়ী। মনে রাখবেন সেদিন ইভাদেবীই প্রথম ঘরে আগুন দেখেছিলেন। প্রশ্ন হল তিনি নিজেই যদি নিজের কাছে চিঠি লিখে থাকতেন তাহলে কল্পিত পত্র লেখকের কাছ থেকে তাঁর ভয়ের কোন কারণ ছিল না। কাজেই আমাদের অন্যদিকে দেখতে হবে। খুনীকে খুঁজতে হবে অন্যত্র। ডঃ সেন আপনার এক্সকাভেশন পার্টির সদস্যদের মধ্যেই রয়েছে খুনী। ডঃ সেন বিড় বিড় করে কী বললেন। বিতংস বলেই চললেন, এটাই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান। কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। সেই লোকটি চিঠির ব্যাপারটা জানতো অথবা জানাতো ইভাদেবী কাউকে ভয় করেন। কাজেই সে ধরে নিয়েছিল ইভা দেবীকে খুন করা খুব সহজ। সে জানতো ইভা দেবী খুন হলে সবাই ধরে নেবে, খুনী সেই উড়ো চিঠির লেখক এবং বাইরে থেকে এসে খুন করে গেছে। এই সমাধানটাই অন্যভাবে ভাবা যায় যে খুনী নিজেই এই চিঠিগুলো লিখেছিল এবং সে ইভা দেবীর অতীত ইতিহাস জানতো। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকে যায় খুনী যদি এটাই প্রমাণ করতে চাইবে যে সে বাইরে থেকে এসেছিল তাহলে ইভা দেবীর হাতের লেখা নকল করবে কেন।

তৃতীয় সমাধানটা খুব ইন্টারেস্টিং অন্তত আমার কাছে। আমি মনে করি চিঠিগুলো খাঁটি। চিঠিগুলো লিখেছেন ইভা দেবীর ভূতপূর্ব স্বামী শিবতোষ অথবা তাঁর ভাই বরুণ এই এক্সকাভেশান দলের মধ্যেই শিবতোষ অথবা বরুণ রয়েছে।

ডঃ সেন চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। বলে উঠলেন, অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব। অবাস্তব ধারণা।

বিতংস শান্ত দৃষ্টিতে ডঃ সেনএর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। ডঃ সেন বললেন—

আপনি বলতে চান যে আমার স্ত্রীর ভূতপূর্ব স্বামী আমার এক্সকাভেশন দলে রয়েছে। আশ্চর্য। ইভা কি তাহলে তাকে চিনতো না?

ঠিক তাই। চিনতে পারেন নি ইভা দেবী। কয়েকটা কথা ভেবে দেখুন প্রায় পনের বছর আগে ইভা দেবী শিবতোষের সঙ্গে ঘর করেছিলেন মাত্র কয়েক মাস। এতদিন পরে শিবতোষকে দেখে তিনি কি চিনতে পারতেন? আমি মনে করি পারতেন না।

শিবতোষের মুখাবয়বের পরিবর্তন ঘটেছে এর মধ্যে, শরীরেও বয়েসের ছাপ পড়েছে তার কণ্ঠস্বরও হয়তো পাল্টে গেছে। অনেক কিছু হতে পারে। আর একটা কথা মনে রাখবেন ইভা দেবী কিন্তু তাঁর সম্ভাব্য খুনীকে খুঁজছিলেন বাইরের লোকদের মধ্যে। এক্সাভেশন পার্টির সদস্যদের মধ্যে নয়। বাইরে থেকে এসে কোন আগন্তুক তাকে খুন করবে।

না—আমার মনে হয় না ইভাদেবী তাকে চিনবেন। আর একজন সম্ভাব্য খুনী শিবতোষের ভাই বরুণ। বরুন বড়দাদা শিবতোষকে প্রায় দেবতার মত দেখতো। বরুণ তখন ছিল বারো বছরের তরুণ। তার মধ্যে তো পরিবর্তন আরো বেশী আসার কথা।

কারণ বরুণের বয়স এখন তিরিশের কাছাকাছি। তার চোখে শিবতোষ ছিল শহীদের মতো। মাতৃভুমির স্বাধীনতার জন্যে উৎসার্গত প্রাণ। তার চোখে বেইমান ও দেশদ্রোহী হল ইভা সেন। তার বড়দাদার অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী ইভা দেবী। তরুণ বয়েস থেকেই বরুণের মনে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

ডাঃ বোস বললেন—এটা হয়। ছোটবেলায় কোন কারণে মনে কিছু গেঁথে গেলে সারা জীবনেও তা মুছে যায় না।

ধন্যবাদ ডাঃ বোস। বিতংস বলতে লাগলেন, এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক এক্সাভেশন পার্টির কোন সদস্য শিবতোষ অথবা বরুণ হতে পারে।

উদ্ভট ধারণা, ডঃ সেন বিড় বিড় করে বললেন, আমার দলের সদস্যা? অসম্ভব।

আপনার দলের সদস্য কাজেই সন্দেহের বাইরে ? বাঃ।

এবার দেখা যাক কে শিবতোষ বা বরুণ না।

মহিলারা। ডাঃ বোস বললেন।

অবশ্যই। মিসেস চন্দ্রা সিং এবং ইন্দ্রানী সরকার সন্দেহের বাইরে। তাহলে কে ?

সন্দীপ চ্যাটার্জী কি ? বেশ কয়েকবছর আমরা একসঙ্গে কাজ করছি এমন কি ইভাকে বিয়ে করার অনেক আগে থেকে। ডঃ সেন বললেন।

তাছাড়া বিতংস বললে, সন্দীপ চ্যাটার্জীর বয়েসও মিলছে না। সন্দীপবাবুর বয়েস আটত্রিশ উনচল্লিশের মতো। শিবতোষের এখন বয়েস হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। বরুণ হবারও সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া অন্যেরা। আলী সাহেব আর মিঃ সিং। এঁদের দুজনের একজন শিবতোষ হতে পারেন।

কিন্তু মিঃ চৌধুরী, ডাঃ বোস একটু পরিহাসের সুরে বললেন, আলী সাহেব একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক।

মিঃ প্রীতম সিংও বিখ্যাত ব্যক্তি। লাহোর মিউজিয়ামে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এঁদের দুজনের কেউ খুনী শিবতোষ হওয়া অসম্ভব।

বিতংস হাত ঘুরিয়ে বললেন, অসম্ভব কথাটা আমি মানতে পারছি না। যাক গে আগের কথায় আসি ! এ ছাড়া আর কারা আছে। রঙ্গনাথন মাদ্রাজী। শোভেন ঘোষ—

মনে রাখবেন শোভেন দু'বারের এক্সাভেশনে আমার সঙ্গে আছে। ডঃ সেন বললেন।

শোভেন যুবক আর ওর ধৈর্য আছে। যদি সে এই খুন করে থাকে তাহলে হঠাৎ করে নি। বেশ ভেবে পরিকল্পনামাফিক করেছে। বিতংস বললেন।

ডঃ সেন একটা হতাশার ভঙ্গী করলেন।

সবশেষে জয়ন্ত নন্দী। বিতংস বললেন।

জয়ন্ত বাঙালী হলেও প্রবাসী বাঙালী কলকাতার নয়।

তাতে কি ? ইভা সেন বলেছিলেন কি না যে বরুণ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় তার কলকাতা আসা ও থাকা কি অসম্ভব ? বিতংস বললেন।

আপনার কাছে প্রত্যেক প্রশ্নেরই জবাব আছে দেখছি। ডঃ সুব্রত সেন

বললেন।

আমিও এসময় খুব গভীরভাবে ভাবছিলাম। জয়ন্ত নন্দীকে আমার বরাবরই হাস্যরসাত্মক চরিত্রের মানুষ বলে মনে হ'য়েছে। তাহলে জয়ন্তর সবটাই কি অভিনয়?

বিতংস বললেন, এবার রীতি, পদ্ধতিমাফিক এগোনা যাক। দেখা যাক এই খুন করার পক্ষে কার উপায় ও সুযোগ ছিল। সন্দীপবাবু খননকার্যের জায়গায় ছিলেন। জয়ন্ত খুরদা গিয়েছিলেন। আপনি ডঃ সেন ছাতে ছিলেন। তাহলে বাকী রইলেন আলী সাহেব। প্রীতম সিং চন্দ্রা সিং, শোভন ঘোষ, রঙ্গনাথন, ইন্দ্রানী সরকার এবং নার্স মিসেস বিশ্বাস।

বলেন কি? আমি চেয়ারে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম।

বিতংস চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, দুঃখিত কিন্তু আপনাকেও বাদ দেওয়া যাবে না। ইভা দেবীকে খুনের সময় উঠোন ফাঁকা ছিল। তখন অনায়াসে আপনি গিয়ে ইভা দেবীকে খুন করে আসতে পারতেন। আপনার স্বাস্থ্য সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় অনেক ভালো। ইভা দেবী আপনাকে সন্দেহও করতেন না অন্ততঃ শেষ আঘাত হানার আগে পর্যন্ত।

বিতংসর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। একটা কথাও বলতে পারলাম না। দেখলাম ডাঃ বোস আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। মৃদুস্বরে উনি বললেন, একজন নার্স তার রোগীদের পর পর খুন করেছে এমন নজীর আছে। আমি তীব্র দৃষ্টিতে ডাঃ বোসের দিকে তাকালাম। এ সময় ডঃ সেন বললেন, শোভেনকে সন্দেহের কোন কারণ নেই। কারণ ঐ দশ মিনিটও আমার সঙ্গে ছাতে ছিল।

তবুও শোভেনবাবুকে বাদ দেওয়া যায় না। তিনি অনায়াসে ছাত থেকে নেমে আসতে পারতেন। সোজা ইভা দেবীর ঘরে যেতে পারতেন। তাঁকে সহজেই খুন করতে পারতেন এবং ফিরে এসে নাথালুকে ডাকতে পারতেন।

ডঃ সেন মাথা ঝাঁকলেন। বিড় বিড় করে বললেন, রাতের দুঃস্বপ্নের মত, অদ্ভুত।

বিতংসও সমর্থন করে বলল, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত। অদ্ভুত খুন। এ রকম খুন বড় একটা হয় না। খুনটা সহজ কিন্তু পরিস্থিতি জটিল। আমার মনে হয় ডঃ সেন, আপনার স্ত্রী ইভা সেন একজন অস্বাভাবিক মহিলা ছিলেন।

কথাটা একেবারে সঠিক। আমি চমকে উঠলাম। বিতংস আমাকে বললেন—

মিস বিশ্বাস, কথাটা সত্যি কি না।

বলুন মিস বিশ্বাস, ইভা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী আপনার মতামতে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব থাকবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। ডঃ সেন বললেন।

আমি খোলাখুলি বললাম, খুব সুন্দর ছিলেন ইভাদেবী। কেউ তার প্রশংসা না করে পারবেন না। যে কেউ তাঁর জন্যে যে কোন কাজ করতে রাজী হবে। ইভা দেবীর মত কাউকে আমি জীবনে দেখিনি।

ধন্যবাদ। ডঃ সুমন্ত্র সেন হেসে বললেন।

মন্তব্যটার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এইজন্যে যে সন্ধ্যা বিশ্বাস বাইরের লোক। বিতংস বললেন, যা হোক। আগের কথায় আসছি। সব পর্যালোচনা করে আমরা চারজনকে সম্ভাব্য খুনী বলে ধরে নিতে পারি। তাঁরা হলেন, আলী সাহেব, প্রীতম সিং, রঙ্গনাথন ও শোভেন ঘোষ।

আলী সাহেব একজন প্রখ্যাত লিপিবিশারদ দীর্ঘদিন আলীগড় য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত। ডঃ সেন বললেন।

আমি যোগ করলাম, আলী সাহেবের দাড়ি গোফ সত্যিকারের। বিতংস বললেন, শ্রীমতী বিশ্বাস, প্রথম শ্রেণীর খুনীরা নকল দাড়ি গোঁফ ব্যবহার করে না। আমিও তর্কের ভঙ্গীতে বললাম—

কী করে বুঝলেন যে খুনী প্রথম শ্রেণীর?

তা না হলে এর মধ্যেই আমি সব সমাধান পেয়ে যেতাম।

এসব মন্তব্য হাস্যকর, একেবারেই হাস্যকর। আলী সাহেব আর প্রীতম সিং আমার যথেষ্ট পরিচিত। তারা বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিপিবিশারদ। ডঃ সেন বললেন। বিতংস তাঁর দিকে ঘুরে তাকালেন। বললেন, একটা কথা আপনি বুঝতে পারছেন না। যদি শিবতোষের মৃত্যু না হয়ে থাকে তাহলে বেঁচে থেকে তিনি এতদিন কী করছিলেন? নিশ্চয়ই অন্য একটা নাম নিয়েছেন। নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন।

অদ্ভুত। ডাঃ বোস বললেন।

হ্যাঁ একটু অদ্ভুতই শোনাচ্ছে। বিতংস বললেন, কিন্তু এই সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যদি আমার অভিমত নেন ডাঃ বোস বললেন—তাহলে বলি এক্ষেত্রে খুনী

হতে পারে রঙ্গনাথন। সত্যি ওর বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। কিন্তু কয়েকটা কথা স্বীকার করতেই হবে। তার বয়েস বরুণের মতই, মাদ্রাজী অথচ ভালো বাংলা বলে। এ বছর এই এক্সকাভেশন পার্টিতে নতুন এসেছে।

তা ছাড়া তার সুযোগও ছিল। উঠোন ছিল ফাঁকা। সে অনায়াসে উঠোন পেরিয়ে মিসেস সেনকে হত্যা করে নিজের ফটোগ্রাফির ঘরে ফিরে আসতে পারতো। কেউ তাকে দেখার কথা নয়। আমি বলছি না সেই খুনী। তবে সুযোগ ও উপায়ের কথা মনে রাখলে তাকেই সন্দেহ হয়।

বিতংস কোন কথা বললেন না। গভীর ভাবে কিছু ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এখন আলোচনা মুলতবী থাক। চলুন মিসেস ইভা সেনের ঘরটা দেখব।

নিশ্চয়ই। ডঃ সুমন্ত্র সেন বলে উঠলেন। তারপর নিজের প্যান্টের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। চাবি পেলেন না। বললেন—

পুলিশ ইন্সপেক্টর রথীন মিত্র চাবিটা নিয়ে গেছেন।

রথীনবাবু চাবিটা আমার কাছে রেখে গেছেন। এই কথা বলে ডাঃ বোস চাবিটা বের করে দিলেন। ডঃ সেন বললেন—

কিছু মনে করবেন না—মানে—আপনাদের সঙ্গে ঐ ঘরে আবার যাবো—মানে—।

ঠিক আছে, আপনার মানসিক অশান্তি বাড়ুক এটা আমি চাই না। বিতংস বললেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার যেতে আপত্তি আছে?

না—না—চলুন। আমি বললাম।

মিসেস ইভা সেন এর মৃতদেহ খুরদায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে পোস্টমর্টেমের জন্যে। তার ঘরের জিনিসপত্র আগের মতই রয়েছে। যেটা যেখানে ছিল। খুব সামান্য আসবাবপত্রই আছে ঘরটায়। কাজেই তল্লাসী চালাতে পুলিশকে বেগ পেতে হয় নি।

ঘরটির দরজা দিয়ে ঢুকলে ডানদিকে বিছানা। দরজার উল্টোদিকে দুটো জানালা বাইরের গ্রামাঞ্চলের দিকে। জানালায় গরাদ রয়েছে। একপাশে একটা সাধারণ ওককাঠের টেবিল। এটাই ছিল ইভার ড্রেসিং টেবিল। টেবিলে দুটো ড্রয়ার। দরজার বাঁ দিকে হাত মুখ ধোবার বেসিন।

ঘরের মাঝখানে একটা ওক কাঠের বড় টেবিল। তা'তে কলম রাখা হ'ত।

ড্রেসিং টেবিলও আছে আর আছে একটা এ্যাটাচি কেস। এই কেস এই ইভা সেন তার কাছে আসা উড়ো চিঠিগুলো রেখেছিলেন। জানালা দরজায় সাদা কাপড় কমলা রঙের ডোরা কাটা। মেঝের ঢাকা হিসেবে ছাগলের চামড়ার আচ্ছাদন গালিচার মত। একটা জানালা আর বিছানার মধ্যে পাতা। অন্যটা পাতা লেখার টেবিল আর বেসিনের মাঝখানে।

অন্য কোন কাবার্ড বা তেমনি ধরণের কিছু নেই যার পেছনে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। বিছানা লোহার। তিনটি বালিশ। এটাই যা শৌখিনতা। আর কারো এরকম বালিশ নেই।

অল্প কথায় ডাঃ বোস দেখালেন বিছানার সামনে মেঝের গালিচার মত আস্তরণের ওপর ইভা সেনের মৃতদেহ কীভাবে পড়েছিল। কী ভঙ্গীতে মৃতদেহটা পড়েছিল এটা দেখাতে ডাঃ বোস আমাকে বললেন। আমি সেইমত মেঝেয় ইভা সেনের ভঙ্গীর মত শুয়ে পড়লাম। ঠিক যেমনটি আমি দেখেছিলাম।

খুবই সোজা ব্যাপার, বিতংস বলতে লাগলেন। ইভা দেবী বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ঘুমিয়ে থাকতেও পারেন আবার বিশ্রামও করতে পারেন। কেউ দরজাটা খুলল—ইভা সেন দেখলেন—বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—

আর সেই খুনী তখনই তাঁর মাথায় আঘাত করল ডাঃ সেন বললেন—আঘাতটা তাঁকে অজ্ঞান করে দেয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ইভা সেনের মৃত্যু হয়। এই ব'লে ডাঃ বোস ডাক্তারীর ভাষায় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন।

তাহ'লে খুব রক্তপাত হয়নি? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন।

না - ইণ্টারনাল হেমারেজ—মানে মস্তিষ্কের ভেতর রক্তক্ষরণ হয়েছে। শরীরের বাইরে বেশী রক্ত বেরোয় নি।

একটা কথা, বিতংস বললেন, খুনী যদি অপরিচিত কেউ হবে তবে তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ইভা সেন চীৎকার করে উঠলেন না কেন? উনি সাহায্যের জন্যে চীৎকার করে উঠলে নার্স মিসেস বিশ্বাস শুনতে পেতেন। শোভেন ঘোষ নাথালু তারাও শুনতে পেত।

কারণ খুব সহজ ডাঃ বোস বললেন, যে ঢুকেছিল সে অপরিচিত কেউ নয়। বিতংস মাথা ঝাঁকালেন। বললেন, হ্যাঁ। ইভা সেই লোকটিকে দেখে আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু ভয় পায় নি। তারপর যখন লোকটি আঘাত করল ইভা তখন হয়তো অর্ধস্ফুট চীৎকার করে উঠেছিল কিন্তু তখন দেরী হ'য়ে গেছে, বড়

দেরী হয়ে গেছে।

—এই অর্ধস্ফুট চীৎকারই বোধ হয়, ইন্দ্রানী সরকার শুনেছিল। বিতংস বললেন।

হ্যাঁ যদি সে আদৌ শুনে থাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে শুনেছিল কিনা। কারণ দেয়ালগুলো বেশ পাকাপোক্ত।

তাছাড়া জানালা দুটোও বন্ধ ছিল। বিতংস বললেন।

তারপর বিতংস বিছানার কাছে গেলেন। আমাকে বললেন—

ইভা সেনএর মৃতদেহ মেঝেয় পড়ে আছে—এই অবস্থায় আপনি শেষ দেখেছেন?

আমি বুঝিয়ে বললাম কী ভাবে আমি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি।

ইভা সেন কি ঘুমুতে যাচ্ছিলেন না বই পড়তে তৈরী হ'য়েছিলেন?

আমি তাকে দুটো বই দিয়েছিলাম, একটা একটু হাল্কা ধরনের বই অন্যটা স্মৃতিকাহিনী। উনি সাধারণতঃ কিছুক্ষন পড়েন তারপর কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে নেন।

—এবং তিনি—মানে কী বলবো স্বাভাবিক অবস্থাতেই ছিলেন? বিতংস বললেন।

আমি একটু ভেবে নিলাম। বললাম—ওকে স্বাভাবিকই দেখেছি এবং বেশ খোশ মেজাজেই ছিলেন তখন। অবশ্য একটু আড়ষ্টভাব ছিল। কারণ তার আগের দিন উনি আমাকে সব গোপন কথাই বলেছিলেন। এর জন্যে লোকে পরবর্তীকালে একটু অস্বস্তিই বোধ করে।

বিতংস চোখ পিট পিট করলেন।

হুঁ—তা হয়। জানি সেটা।

বিতংস এবার ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিলেন। আমাকে বললেন, খুনের পরে আপনি যখন এই ঘরে ঢুকলেন কী দেখলেন? সব কিছু তেমনি আছে। যেমনটি আপনি দেখে গিয়েছিলেন।

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বললাম, হ্যাঁ সব তেমনি আছে। অন্য রকম কিছু মনে পড়ছে না।

—যে জিনিসটা দিয়ে ইভাকে খুন করা হয়েছে সেটা তো পাওয়া যায় নি।

—না।

বিতংস ডাঃ সেনের দিকে তাকালেন। বললেন, এ ব্যাপারে আপনার

অভিমত কী ?

ডাঃ বোস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, বেশ বড় ভারী এবং শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। সেই জিনিসটার ধারালো কোন নেই।

গোলালো। মূর্তিটুর্তির গোল বেদীর মত কিছু। মনে রাখবেন, আমি বলছি না জিনিসটা ঠিক ওকমই, মানে ঐ ধরনের আর কি। যথেষ্ট শক্তিতে আঘাত করা হয়েছে।

বেশ শক্তিশালী হাতের কাজ কি ? কোন পুরুষ মানুষের ?

– হ্যাঁ – অবশ্য—

—অবশ্য কী ?

ডাঃ বোস ধীরে ধীরে বললেন, একটা সম্ভাবনার কথা বলছি, ইভা দেবী তখন নিশ্চয়ই হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। ওপর থেকে ভারী আঘাতটা নেমে এসেছে। বেশ জোরালো আঘাত।

ইভা সেন হাটু গেঁড়ে বসেছিলেন, বিতংস বিড়বিড় করে বললেন, একটা নতুন তথ্য।

কিন্তু সেটা সত্যি নাও হতে পারে।

—কিন্তু সম্ভব।

হ্যাঁ তা সম্ভব। অন্ততঃ তখনকার পরিবেশে। ইভা দেবী ভীত হয়েছিলেন এবং ভয় থেকেই তিনি প্রাণরক্ষার মিনতি জানিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। তিনি চীৎকার করে ওঠেন নি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন এখন চীৎকার করা বৃথা। মৃত্যু সুনিশ্চিত। কেউ এসে তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। ডাঃ বোস বললেন।

হুঁ—একটা অভিমত আর কি।

আমি কিন্তু এই অভিমতটা স্বীকার করতে পারছিলাম না। ইভা সেন হাঁটু গেড়ে করুন ভিক্ষা করবে, এ অসম্ভব।

বিতংস ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। জানালার গরাদ দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিলেন। মাথাটা বেরুলো কিন্তু কাঁধ আটকে গেল। তার মানে জানালা গলে কারো ঘরে ঢোকা অসম্ভব।

আচ্ছা মিস বিশ্বাস, যখন এ ঘরে ঢুকে মৃতদেহ দেখেন তখন কি জানালা দুটো বন্ধ ছিল ?

হ্যাঁ। আমি মাথা নেড়ে বললাম।

যখন ইভা দেবী শোবার উদ্যোগ করছিলেন এবং আপনি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কি জানালা দুটো বন্ধ দেখে গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ।

বিতংস বললেন, ঘরটার দেয়াল বেশ পাকাপোক্ত। দরজাও একটা। এ ছাড়া ঘরে ঢোকার আর অন্য কোন উপায়। যে কাউকে এই ঘরে ঢুকতে গেলে উঠোন পেরিয়ে আসতেই হবে। উঠোনে আসতে গেলে বড় গেট দিয়ে ঢুকতেই হবে। বড় গেটএর কাছে পাঁচজন লোক ছিল। তারা প্রায় একই কথা বলেছে। না ওরা মিথ্যে কথা বলে নি। ওদের মুখ বন্ধ করার জন্য ঘুষও দেওয়া হয় নি। খুনী এখানে এসেছিল।'

আমি কিছু বললাম না। বিতংস ধীর পায়ে ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগলেন। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছবি ছিল টেবিলটার ওপর। বিতংস তার ফটো নিলেন। আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম—উনি ইভা সেনের পিতা, উনি ইভা সেন আমাকে ফটোটা দেখিয়ে বলেছিলেন। বিতংস এক টিপ নস্যি নিলেন।

ড্রেসিং টেবিলের জিনিসপত্র দেখলেন। তারপর শেলফে রাখা বইগুলো দেখতে লাগলেন এবং জোরে জোরে বইয়ের নামগুলো পড়তে লাগলেন—আর্য জাতির পরিচয়, মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল, ব্যাক টু ম্যাথ জেলা, বিজ্ঞান প্রবন্ধ, ক্রাইস সাইকোলজি, কালপেঁচার বঙ্গদর্শন। হুঁ—ভদ্রমহিলাকে অনায়াসে সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্ন বলা যায়। কী বলেন মিস বিশ্বাস ?

আমি একমত। আমি বললাম, ইভা সেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। ভালো পড়াশুনো ছিল।

আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত ছিলেন না।

বিতংস হেসে আমার দিকে তাকালেন, হুঁ আমি বুঝেছি।

উনি একপাশে সরে গিয়ে হাতমুখ ধোয়ার বেসিনের কাছে দাঁড়ালেন। সেখানে কয়েকটা বোতল সাজানো আর কয়েকটি রূপসজ্জার ক্রীম। সে সব দেখতে হঠাৎ বিতংস হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মেঝের গালিচা সব জিনিসটা দেখতে লাগলেন একটা ছোট গোল দাগ। গভীর বাদামী রঙ। গালিচার রঙের মধ্যে ঐ একফোঁটা গভীর বাদামী রঙ প্রায় নজরেই পড়ে না। বললেন—

ডঃ বোস আপনি কী বলেন ? এটা কি রক্তের দাগ ?

ডঃ বোসও হাঁটু গেড়ে বসলেন। বললেন, হতে পারে। আপনি চাইলে

নিশ্চিত হবার জন্যে পরীক্ষা করতে হবে।

যদি এই সাহায্যটুকু করেন।

বিতংস এবার জাগ আর বেসিনটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। জাগটা বেসিনের একপাশে ছিল। বেসিনটা খালি। বিতংস আমার দিকে তাকালেন, আপনি মনে করুন তো যখন ইভা দেবী দিবানিদ্রার আয়োজন করছেন এবং আপনি চলে গেলেন তখন জাগটা কোথায় ছিল? বেসিনের বাইরে না বেসিনের মধ্যে?

ঠিক বলতে পারছি না—যতদূর মনে পড়ছে জাগটা বেসিনের মধ্যে ছিল। আমি বললাম।

—আঃ।

দেখুন আমি দ্রুত বলে উঠলাম, মানে আমার মনে হচ্ছে। কারণ জাগটা বরাবর বেসিনের ওপর রাখাই দেখেছি।

—খুনের পর?

আমি লক্ষ্য করিনি। আমি বললাম, আমি শুধু দেখছিলাম খুনী কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা। অথবা খুনী কোন চিহ্ন ফেলে গেছে কিনা।

ডাঃ বোস এসময় বললেন—হ্যাঁ, ঐ গাঢ় বাদামী ফোঁটাটা রক্তের ফোঁটা। এটা কি জানা খুব প্রয়োজন? বিতংস দুহাত ছড়িয়ে বললেন, ঠিক বলতে পারছি না। এটা একেবারে অর্থহীনও হতে পারে। এটুকু বলতে পারি খুনী মৃতদেহ স্পর্শ করেছিল তার হাতে রক্ত লেগেছিল—সামান্য রক্ত তবু রক্ত তো - কাজেই খুনী বেসিনের কাছে এসেছিল রক্ত ধুয়েছিল। অবশ্যই দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। ঐ ফোঁটার দাগটার হয়তো কোন গুরুত্বই নেই। ডাঃ বোস বললেন, সামান্য রক্তই বেরিয়েছিল। ক্ষত থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছিল।

আমার শরীরটা কেঁপে উঠল। একটা বিশ্রী ছবি যেন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। যে কেউ হতে পারে ফটোগ্রাফার রঙ্গনাথন এক আঘাতে ইভা দেবীর মুখ কপাল থেঁৎলে—ওঃ রঙ্গনাথনের মুখটা তখ। কেমন দেখাচ্ছিল একেবারে অন্যরকম, ভয়ংকর উম্মাদের মত।

ডাঃ বোস আমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। বললেন, মিস বিশ্বাস কী হয়েছে আপনার?

কিছু না, শরীরটা কেমন করে উঠলো। বললাম, বিতংস আমার দিকে

ঘুরে তাকালেন। বললেন, বুঝতে পারছি আপনি এই পরিবেশটা সহ্য করতে পারছেন না। চলুন খুরদায় ডাঃ বোসের বাড়ি যাবো। ডাঃ বোস মিস বিশ্বাসকে চা খাওয়াবেন তো? আনন্দের সঙ্গে। ডাঃ বোস বললেন।

না-না। আমি গিয়ে কী করবো?

আপনার কাছ থেকে আরো কিছু সংবাদ চাই। সব কথা এখানে হবার অসুবিধে আছে। চলুন। বিতংস বললেন।

সেই ভালো। আমি বললাম, বলা যায় না এরপরে আমিই হয়তো খুন হয়ে গেলাম। কথাটা হেসেই বললাম।

ডাঃ বোসও হাসলেন। কি বিতংস মেঝের ওপর স্থির দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, বিপদ রয়েছে, ভীষণ বিপদ। কিন্তু কী করে আত্মরক্ষা করা যায়।

বিতংসবাবু, আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছিলাম।

আপনি অথবা অন্য কেউ। বিতংস একই ভঙ্গীতে বললেন।

কিন্ত আমাকে কেউ হত্যা করবে কেন? বিতংস সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন। বললেন, আমার পেশা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক শিক্ষাটা হচ্ছে, খুন করার প্রবৃত্তিটা বড় অদ্ভুত। এটা একটা অভ্যাস, বুঝলেন, অভ্যাস।

খুরদা রওনা হবার আগে বিতংস এক্সকাভেশন ক্যাম্পের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। যে সব চাকরবাকর দারোয়ান ছিল সবাইকে কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। চাকর-বাকর ওড়িয়া ভাষায় উত্তর দিল। ডাঃ দোভাষীর কাজ করলেন। বিতংস বিশেষ করে সেই আগন্তুক ওড়িয়া ভদ্রলোকের কথাই ওদের জিজ্ঞেস করলেন। সেই ভদ্রলোককে আমি ও ইভা সেন পথে দেখেছিলাম আলী সঙ্গে কথা বলতে এবং ইভা সেনের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিতে।

গাড়িতে উঠে ডাঃ বোস বললেন, আপনি কি মনে করেন এই ব্যাপারে সেই আগন্তুক ভদ্রলোকের কোন হাত আছে?

আমি সব তথ্যই জানতে চাই। বিতংস বললেন।

পরে দেখেছিলাম বিতংস অতি নগণ্য ব্যাপারও জানেন। গুজবটুজব সবই আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন।

ডাঃ বোসের বাড়িতে চায়ের আসর বসল। বিতংসকে দেখলাম চায়ে খুব চিনি খান। চা খাওয়া শেষ করে বিতংস নস্যির কৌটো বের করলেন। আঙুল দিয়ে ঠুকে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, এখন আমরা

কথাবার্তা শুরু করতে পারি। এখন আমরা বিচার বিবেচনা করতে পারি খুনী কে?

আলী সাহেব, মিঃ সিং শোভেন ঘোষ অথবা রঙ্গনাথন? ডাঃ ঘোস প্রশ্নের ভঙ্গীতে কথাটা বললেন।

না—না এখন ওসব নয়। ইভা দেবীর প্রথম স্বামী শিবতোষ বা তার ভাই বরুণ এখন আমাদের বিবেচ্য নয় সাধারণ ভাবে এখন আমরা আলোচনা করবো এক্সকাভেশন পার্টির কোন সদস্যের পক্ষে ইভা সেনকে খুন করার উপায় ও সুযোগ রয়েছে। বিতংস বললেন।

ভেবেছিলাম এটা নিয়ে আপনি বেশী চিন্তা করেন নি।

চিন্তা করেছি কিন্তু ডঃ সুমন্ত্র সেনের সামনে আলোচনা করিনি। ওটা উচিত হ'ত না। একটা ব্যাপার আমি বুঝেছি যে ইভা সেন সকলেরই প্রিয় ছিল এই ধারণাটা সুমন্ত্র সেনের মনে বদ্ধমূল ছিল।

বিতংস বললেন—

এখন আমরা নির্দ্বিধায় সব আলোচনা করতে পারবো এবং মিস বিশ্বাস আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। ও'র দৃষ্টি খুব পরিষ্কার।

ও, আমি ওসব ব্যাপারে কিছু জানি না। আমি ব'লে উঠলাম। ডাঃ ঘোস এক প্লেট গরম সিঙারা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন—এই সিঙারা খেয়ে নিজের মনকে শক্ত করুন।

আসুন, বন্ধুর ভঙ্গীতে বিতংস বললেন, এবার বলুন তো এক্সকাভেশন পার্টির সদস্যরা কে কেমন দৃষ্টিতে মিসেস ইভা সেনকে দেখতেন।

আমি মাত্র এক সপ্তাহ হল পলাশগড়ে এসেছি। আমি বললাম।

যথেষ্ট আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে পার্টির সদস্যদের সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। একজন নার্স খুব সহজেই দ্রুত অভিমত গড়ে তোলে। এবার বলুন তো আলী সাহেব সম্পর্কে।

কী বলবো মানে সত্যি কিছু বলার নেই। ইভা সেন আলী সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। দু'জনেই উর্দুতে কথা বলতেন আর আমি উর্দু জানি না। তবে তাঁরা বেশীর ভাগই নানান বই সম্পর্কে কথা বলতেন।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক আর কি। বিতংস বললেন।

হ্যাঁ। তা বলা যায়। তবে কথাবার্তার মধ্যে মাঝে মাঝেই আলী সাহেবকে দেখেছি কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়তেন।

তারপর আমি বললাম খননকার্যের জায়গায় আলী সাহেব যে সব কলা-কাহিনী আমাকে বলেছিলো তার কথা, কথা প্রসঙ্গে আলী সাহেব ইভা সেন সম্পর্কে বলেছিলেন। সাংঘাতিক মহিলা।

হুঁ—ইণ্টারেস্টিং—বিতংস বললেন, ইভা সেন আলী সাহেব সম্পর্কে কী ভাবতেন ?

বলা কঠিন। তবে ইভা সেন একবার তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন আলী সাহেবকে ঠিক বিদগ্ধ পণ্ডিত বলে মনে হয় না।

হুঁ। বিতংস এবার ডাঃ বোসকে বললেন তিনি যেন এবার তাঁর রোগী-পত্তর দেখতে যান। ডাঃ বোস হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তাই যাচ্ছি।

বিতংস বললেন—এবার বলুন তো আপনার মনে হয় কে ইভা সেনকে পছন্দ করতো না।

—আমার মনে হয়—বললাম—মিসেস চন্দ্রা সিং ইভা সেনকে বেশ ঘৃণা করতো।

—ও। আর মিঃ সিং ?

উনি ইভা সেন সম্পর্কে একটু স্পর্শকাতর ছিলেন। লোকেরা কিছু বললে ইভা সেন তা মনে রাখতো।

আচ্ছা মিসেস চন্দ্রা সিং কি তাহলে স্বামী আর ইভা সেনের সম্পর্কের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না ?

চন্দ্রা সিং ঈর্ষাকাতর ছিল। স্বামীর ব্যাপাবে স্ত্রীরা নানা আজগুবী ধারণা পোষণ করে। তাই থেকে হয় তো চন্দ্রা সিং এরকম ঈর্ষাকাতর হয়েছিল। তবে চন্দ্রাকে এমনভাবে ইভা সেনের দিকে তাকাতে দেখেছি যেন বাগে পেলে খুন করে ফেলবে—বলেই আমি বলে উঠলাম—এটা বললাম বলে ভাববেন না যে আমি বোঝাতে চাইছি যে চন্দ্রা সিংই ইভা দেবীকে খুন করেছে।

ঠিক আছে। আমি বুঝেছি। আচ্ছা চন্দ্রা সিংএর এই শত্রু সুলভ মনোভাবের জন্যে ইভা সেন কি অস্বস্তি বোধ করতো ?

—আমার তো মনে হয় না। ইভা সেনকে এসব গ্রাহ্য করতে দেখিনি।

চন্দ্রা সিংএর মনোভাব আপনি কী ক'রে বুঝলেন ? সেদিন ছাতে চন্দ্রা সিংয়ের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল সে সব বললাম।

হুঁ—বিতংস বললেন—চন্দ্রা সিং ইভা সেনের প্রথম বিয়ের কথা এবং আরো কিছু জানতো।

আমার তো মনে হয় জানালায় টোকা দেওয়া উড়োচিঠি লেখা এসব চন্দ্রা সিংএরই কাজ।

চন্দ্রা সিং এটা করবে কেন? বিতংস জানতে চাইল।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। এই একটা ব্যাপারে ইভা সেন ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ে এটা চন্দ্রা জানতো।

হুঁ—কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা মাফিক খুন করা—চন্দ্রা অতটা পারবে না। অবশ্য একটা কথা একটু অদ্ভূত চন্দ্রা আপনাকে বলেছিল—আমি জানি আপনি কেন এখানে এসেছেন। এই কথাটার দ্বারা চন্দ্রা কী বোঝাতে চেয়েছিল?

আমি বলতে পারবো না। আমি বললাম।

চন্দ্রা সিং ধরেই নিয়েছিল আপনাকে পলাশগড়ে আনানোর পেছনে অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। প্রশ্ন হল—চন্দ্রা সিংএর এ ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? আরো অদ্ভূত ব্যাপার আপনি যেদিন প্রথম আসেন চন্দ্রা সিং সর্বক্ষণ আপনার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিতংস বললেন।

চন্দ্রা সিং অভদ্র মহিলা।

—এটা যুক্তি নয়। যাক্ গে—অন্য সভাদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

আমি একটু ভেবে নিলাম। তারপর বললাম, ইন্দ্রানী সরকার ইভা সেনকে মোটেই পছন্দ করত না। অবশ্য এই মনোভাব সে পরিষ্কার বলতো। নিজেকে এইজন্যে সে ঈর্ষাকাতর বলতো। দেখুন–ইন্দ্রানী ডঃ সুমন্ত্র সেনকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতো। বেশ কয়েক বছর তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। অবশ্য বিবাহবন্ধন মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনে।

ঠিক—বিতংস বললেন, ইন্দ্রানী সরকারের মতে ডঃ সেন ও ইভার বিয়েটা সঠিক হয়নি। সঠিক হত যদি ডঃ সেন ইন্দ্রানী সরকারকে বিয়ে করতেন।

তাই হত। আমিও স্বীকার করলাম—একটা কথা স্বীকার করতেই হয় ইন্দ্রানী সরকার ইভা সেনএর মত সুন্দরী নয়। ইভার অবশ্য একটু বয়েস হয়েছিল। তবু তাকে দেখলে বুঝতেন—সুন্দরী কাকে বলে। ইভা সম্পর্কে জয়ন্ত নন্দী বলেছিল—ইভা দেবী জসার আলেয়ার মত তার আকর্ষণ এড়ানো

কঠিন। ইভা সেনের মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে তাকে অপার্থিব কিছু বলে মনে হত।

হুঁ—উনি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারতেন—এটা বুঝতে পারছি, বিতংস বললেন।

মনে হয় সন্দীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে ইভা সেনের সম্পর্কটা ছিল কেমন ঠাণ্ডা। দু'জনেই দু'জনের সঙ্গে বড্ড বেশী ভদ্রতা করতো। ইভা সেন সন্দীপকে মিঃ চ্যাটার্জী বলে ডাকতো। সন্দীপ ডাঃ সুমন্ত্র সেন পুরোনো বন্ধু ছিল। এইজন্যেই বোধ হয় ইভা সেন তাকে সহ্য করতে পারতো না।

হুঁ বুঝলাম। বাকী তিন যুবক—রঙ্গনাথন, শোভেন জয়ন্ত। জয়ন্ত সম্পর্কে অবশ্য বললেন একটু রোমাণ্টিক।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম না বিতংসবাবু, জয়ন্ত একেবারে কঠোর বাস্তববাদী।

—আর দুজন?

শোভেন সম্পর্কে ঠিক বলতে পারবো না। খুব চুপচাপ থাকে ভদ্রলোক, কথাও কম বলে। ইভা সেন তার সঙ্গে খুব সহৃদয় ব্যবহার করতো। সবসময় নাম ধরে ডাকতো। ডাঃ বোসের মেয়ে রুবি বোসকে জড়িয়ে একটু রসিকতা করার সুযোগ পেলে ছাড়তো না।

—এটা কি শোভন উপভোগ করতো? বিতংস জানতে চাইল।

ঠিক বুঝতাম না। তবে শোভেন এ সময় ইভা সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। কী ভাবতো কে জানে।

—আর রঙ্গনাথন?

ইভা সেন বঙ্গনাথনকে নিয়ে বেশ কড়া ঠাট্টা বিদ্রুপ কবতো।

বঙ্গনাথন কি এতে কিছু মনে করতো?

বেচাবার মুখ চোখ লাল হ'য়ে যেত। অবশ্য ইভা সেন সত্যি সত্যি ওর প্রতি নির্দয় ছিল না। কথাটা ব'লেই আমার কেমন মনে হ'ল রঙ্গনাথনই ঠাণ্ডা মাথায় ইভা সেনকে খুন করে নি তো? বাইরের ব্যবহার ওর অভিনয় মাত্র।

—ওঃ—বিতংসবাবু—আমি বলে উঠলাম—। সত্যি সত্যি কী ঘটেছে বলুন তো?

বিতংস চিন্তিতভঙ্গী মাথাটা একবার নাড়লেন। বললেন—আচ্ছা—আজ

রাত্রে পলাশগড়ে ফিরে যেতে আপনার ভয় করছে না তো ?

না না। আমি বললাম - আপনি যা বলেছিলেন মনে আছে, খুন একটা অভ্যেস। কিন্তু আমাকে কে খুন করবে ?

মনে হয় না কেউ আপনাকে খুন করবে, বিতংস আস্তে আস্তে বললেন, কতকটা এই কারণেই আপনি যা জানেন সব জানতে চাইছিলাম। না, আমার মনে হয় আপনার জীবনাশঙ্কা নেই আপনি নিরাপদ।

এই সময় মিস রুবি বোস ঘরে ঢুকল। পরনে টেনিস খেলার পোশাক। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। বিতংস আগে খুরদাতেই এসেছিলেন। কাজেই রুচির সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচয় হয়েছে। রুবি আমাকে 'কেমন আছের' গোছের হাসি নিয়ে দু'একটা কথা বলল। টেবিল থেকে বিস্কুট তুলে নিয়ে গেল। বলল—মিঃ বিতংস চৌধুরী পলাশগড়ের রহস্য সমাধানে কতদূর এগোলেন ?

এই কাজ চলছে আর কি। বিতংস বললেন।

দেখছি মিস বিশ্বাসকে আপনি এক দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। রুবি বলল।

মিস বিশ্বাস আমাকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়েছেন বিশেষ করে এক্সকাভেশন পার্টির সদস্যদের সম্পর্কে। মৃতা ইভা সেন সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জেনেছি ওঁর কাছ থেকে। মৃতের স্বভাব চরিত্রের মধ্যে অনেক সময় খুনের সূত্র পাওয়া যায়।

রুবি বলল, আপনি বুদ্ধিমানের মতই কথা বলেছেন। এটা স্পষ্ট সত্য যে ওখানে যে মহিলাটি খুন হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তিনি ছিলেন ইভা সেন।

মিস বোস আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

রুবি বোস হাসল। বিশ্রী লাগল হাসিটা।

আঃ—রুবি বলল - আপনি সত্যি কথাটা সহ্য করতে পারছেন না। বিতংসর দিকে তাকিয়ে বলল—আমি চাই আপনি যেন খুনীর পাত্তা না করতে পারেন। পারলে আমিও ইভা সেনকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতাম।

আমার বিরক্তি লাগছিল। বিতংস খুশীর স্বরে বললেন, তাহলে সম্ভাব্য খুনীর তালিকায় আপনিও রইলেন ?

একটুক্ষণের স্তব্ধতা। রুবির হাত থেকে টেনিস র‍্যাকেটটা মেঝেয় পড়ে গেল। ও সেটা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টাও করল না। বলল—

ও মিঃ চৌধুরী আমি তখন ক্লাবে টেনিস খেলছিলাম। আমি সিরিয়াসলি বলছি মিঃ চৌধুরী—আপনি কি ইভা সেন সম্পর্কে সব জেনেছেন? কেমন ছিলেন সেই মহিলা।

আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই। বিতংস বললেন। রুবি বোস বলতে লাগল—দেখুন একটা রীতি আছে মৃতের অপ্রশংসা করতে নেই। একটা বোকাটে ধারণা। সত্য চিরদিনই সত্য। বরং জীবিতদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে নেই এটাই আমার মনে হয়। মৃতেরা অতীত। কিন্তু কখনও কখনও মৃতেরা জীবিতদের ক্ষতি করে যায়। মিস বিশ্বাস কি আপনাকে কে বলেছেন যে পলাশগড়ে একটা অদ্ভুত পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। কী একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ওখানে। সবাই পরস্পরের দিকে তাকাতো যেন তারা শত্রু। এ অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন ইভা সেনই। তিন বছর আগে আমি যখন পলাশগড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম—দেখেছি সবাই যেন একটা সুখী পরিবার গড়ে তুলেছিল। আনন্দ হৈ হল্লা ফুর্তি। এমন কি গত বছরও অনেকটা ঐ পরিবেশ দেখে এসেছি।

এ বছর দেখলাম একটা হতাশা যেন ওদের গ্রাস করেছে। এর মূলে রয়েছে ইভা সেন। উনি কাউকে সুখী দেখতে রাজী নন। এ রকম মহিলা দেখা যায় এবং উনি তাই ছিলেন। তিনি সব কিছু ভেঙে ফেলতে ভালোবাসতেন। কে জানে—হয়তো মজা দেখতে—অথবা নিজের ক্ষমতা দেখাতে অথবা তাঁর চরিত্রের কাঠামোটাই ছিল এমনি। সব পুরুষগুলো তাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলুক এটাই তিনি চাইতেন।

দেখুন মিস বোস—আমি বললাম—আমার মনে হয় না এটা সত্যি। আমি জানি এ সত্যি নয়।

আমার মন্তব্যে কান না দিয়ে রুবি সেন বলতে লাগল—'শুধু স্বামীর পুজো পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ঐ যে মিঃ প্রীতম সিং একটা গবেট ওকে বোকা বানাতে ইভা সেন খুব ভালোবাসতেন। জয়ন্তকেও উনি পাকড়াবার চেষ্টা করেছেন। জয়ন্ত অল্পবয়সী বুদ্ধিমান। তাকেও হেনস্থা করার চেষ্টা করবেন। রঙ্গনাথনের মনে জ্বালা ধরিয়ে আনন্দ পেতেন। রঙ্গনাথন স্পর্শ-কাতর ছেলে।

শোভেনের সঙ্গে অবশ্য সহজ সম্পর্ক রাখতেন। কারণ শোভেন হার মানতো না লড়ে যেত। ইভা সেনের আকর্ষণকে সে অনুভব করতো কিন্তু

ভেসে যেত না। এটা বুঝতো যে ইভা সেন খেলুড়ে মেয়ে। এইজন্যেই আমি ইভা সেনকে ঘৃণা করতাম। ইভা কামুকি মহিলা ছিলেন না। প্রেম ঘটিত ব্যাপারে নিজেকে কখনও জড়াতে চাইতেন না। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন। কিন্তু নিজে আলগা থাকতেন। তিনি জীবনে কোনদিন কারো সঙ্গে ঝগড়া করতেন না কিন্তু যেখানে তিনি যেতেন সেখানেই ঝগড়া ঝাঁটির সৃষ্টি হত। তিনি ঝগড়া বাধিয়ে দিতেন। তিনি নাটকীয়তা পছন্দ করতেন কিন্তু নিজে তার মধ্যে জড়াতেন না। পেছন থেকে পুতুলনাচের সুতো টানতেন অন্যদের পুতুলের মত নাচাতেন। মিঃ চৌধুরী আমি কী বলতে চাইছি আশা করি বুঝতে পারছেন।

মিস বোস—আমি আপনার চেয়েও বেশী জানি।

বিতংস বললেন। রুবি চোখ মুখ লাল হ'ল। বলল—আপনি যেমন খুশী ভাবতে পারেন। ইভা সেনের চরিত্র বিচারে আমি সঠিক। অত্যন্ত চতুর মহিলা। পলাশগড়ের একঘেয়ে জীবন। কাজেই সময় কাটাবার জন্য ওখানকার লোকদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন। রসায়নবিদরা যেমন রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তেমনি। আমার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেছেন।

কাছাকাছি মানুষদের জীবনের গোপন কথা জানতে উনি খুব আগ্রহী ছিলেন। জানতেনও সে সব। তারপর সেইসব লোকদের সামনে এমন ভাব দেখাতেন যে আমি তোমার সব গোপন কথা জানি। ব্ল্যাকমেল করতেন না কিন্তু এ ভাবটা দেখিয়ে আনন্দ পেতেন। হা ভগবান – সেই ভদ্রমহিলা এসব ব্যাপারে একজন শিল্পী ছিলেন।

আর তাঁর স্বামী—সুমন্ত্র সেন ? বিতংস জানতে চাইলেন।

ইভা তাঁর স্বামীকে কখনও আঘাত করেন নি। স্বামীর সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতেন। স্বামীকে পছন্দ করতেন। সুমন্ত্র সেন নিজের জগৎ—খনন কার্য আর নানা তথ্য তত্ত্ব এসব নিয়েই থাকতে ভালোবাসতেন। উনি ইভাকে প্রায় পুজো করতেন।

এতে অন্য মহিলারা হয়তো বিরক্ত হত। এক অর্থে সুমন্ত্র সেন ভুলের স্বর্গে বাস করতেন। ইভাকে তিনি যেমন কল্পনা করতেন তেমনি দেখতেন। রুবি চুপ করল।

—বলে যান মিস বোস। বিতংস বললেন।

রবি হঠাৎ আমার দিকে তাকাল। বলল—সন্দীপ চ্যাটার্জী সম্বন্ধে কী বলেছেন?

—সন্দীপ চ্যাটার্জী সম্বন্ধে? আমি বেশ অবাক হলাম।

—হ্যাঁ ইভা সেন আর সন্দীপ চ্যাটার্জি সম্পর্কের?

—আমি বলেছি যে ও'দের দু'জনের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। রবি জোরে হেসে উঠল। আমি আবার আশ্চর্য হলাম। রবি বলল—

—আপনি বোকা। সন্দীপ ইভার প্রতি প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

আবার সন্দীপ ডঃ সুমন্ত্র সেনকেও শ্রদ্ধা করেন। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব দু'জনের। কাজেই সন্দীপ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিলেন।

ইভা দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। মনে হয়—রবি বলতে লাগল—এই একটি ক্ষেত্রে ইভা অনেকদূর এগিয়ে গেল। সন্দীপ অত্যন্ত সুদর্শন রূপবান পুরুষ। ইভা তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলল।

—এটা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়—আমি বললাম—তাঁরা পরস্পর কথা পর্যন্ত বলতেন না।

—ওঃ কথা বলতেন না? রবি বলল—কিছুই জানেন না আপনারা। ইভা সেন আর সন্দীপ চ্যাটার্জী প্রায় দিনই নদীর ধারে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতেন। ইভা সেন হেঁটে নদীর ধারে যেত সন্দীপ খননকার্যের জায়গা থেকে সময় করে ওখানে চলে আসতেন। নদীর ধারে আমগাছের তলায় দেখা করত দু'জনে একটু থেমে রবি বলল—

একবার আমি দূর থেকে দেখেছিলাম সন্দীপ চ্যাটার্জী খননকার্যের জায়গার দিকে পা বাড়িয়েছেন আর ইভা সেন দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে সন্দীপের দিকে। আমিও তো মেয়ে! সবই বুঝলাম। দূর থেকে দেখলাম ইভা সেনের লজ্জারুণ মুখ। এবার রবি বিতংসর দিকে তাকিয়ে বলল—কিছু মনে করবেন না—আপনার ব্যাপারে নাক গলিয়ে ফেললাম। একটু অদ্ভুত হেসে বলল—এখানকার ঘটনাবলী আপনি ভালোভাবে জানতে চান বলেই যা জানি যা দেখেছি সব বললাম।

রবি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিতংস আমার দিকে তাকালেন। তারপর আপনমনে বললেন· এটুকু আলোর প্রয়োজন ছিল।

ডাঃ বোসের অনুরোধে রাতের আহারটা তাঁর বাড়িতেই সারতে হ'ল। তারপরে সেই অর্ধেক গাড়ি অর্ধেক লরীতে চড়ে পলাশগড়ে ফিরে এলাম। আসার পথে দু একটা কথা আমার মনে হল। রুবির কথা শুনে আমার মনে হ'য়েছিল রুবি ইভা সেনে এর প্রতি ঈর্ষাকাতর। কিন্তু এখন আমার একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেদিন নদীর ধারে বেড়াতে যাবার সময় ইভা সেন একাই গিয়েছিল। ডঃ সেন বলা সত্ত্বেও আমাকে সঙ্গে নেয় নি। যখন ফিরে এসেছিল তখন দেখেছিলাম।

ইভার চোখ মুখ আনন্দোজ্জ্বল। সেদিন এর অর্থ বুঝি নি। আজকে বুঝলাম রুবির কথাই সত্যি। সেদিন ইভা লুকিয়ে সন্দীপ চ্যাটার্জির সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিল। ইভা সবাইকে নাম ধ'রে ডাকতো। শুধু সন্দীপবাবুকে ডাকতো মিঃ চ্যাটার্জী বলে। সন্দীপকে কখনো ইভার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখিনি। হয়তো তিনি ইভাকে পছন্দ করতেন না। আবার উল্টোটাও হ'তে পারে।

রাত ন'টা নাগাদ পলাশগড় ক্যাম্পে পেঁছিলাম। ক্যাম্পের সবাই তাড়াতাড়িই শুতে যান। সব শোবার ঘরেই আলো নেভানো। শুধু নক্সা ঘরে আর ডঃ সুমন্ত্র সেনের অফিস ঘরে আলো জ্বলছে।

নক্সাঘরের সামনে দিয়ে নিজের ঘরে যাবার সময় দেখলাম সন্দীপ চ্যাটার্জী জামার হাতা গুটিয়ে একটা বেশ বড় নক্সা পরীক্ষা করছেন। দেখে মনে হ'ল ভদ্রলোক যেন খুব অসুস্থ। বেশ বেদনা বোধ করলাম। আমাকে দেখে সিগারেট মুখ থেকে নামিয়ে বললেন—এই যে খুরদা থেকে ফিরলেন বুঝি?

—হ্যাঁ। সবাই তো শুয়ে পড়েছে আপনি এখনও কাজ করছেন?

—কাজটা এগিয়ে রাখছি আর কি। কালকে সারাদিনই তো ঢিবি খোঁড়ার কাজ চালাতে হবে। আমরা কালকেই খোঁড়ার কাজ শুরু করবো।

—কালকেই?' বেশ আশ্চর্য হ'য়ে বললাম। বেদনাও বোধ করলাম। সন্দীপ আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বললেন—আমার মনে হয় এটাই ভাল। আমি সুমন্ত্রকে বলেছি। কালকে ও খুরদা গিয়ে অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়ার ব্যবস্থা করবে। আমরা এখানে আমাদের কাজ চালিয়ে যাবো। এভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না।' সন্দীপ ঠিকই বলেছেন। প্রত্যেকেই একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে রয়েছে।

—আপনি ঠিকই করেছেন।' আমি বললাম—'কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে

অনেক আজেবাজে চিন্তা এড়ানো যায়।

সন্দীপ আবার নক্সাটার ওপর ঝুঁকলেন। ভদ্রলোকের জন্যে কেমন একটা বেদনা বোধ করলাম। বুঝতেই পারছিলাম। উনি সারারাত জাগবেন। একটু ইতস্তত ক'রে বললাম—সন্দীপবাবু—আপনি একটা ঘুমের ওষুধ খাবেন?' আমি বললাম। সন্দীপ হেসে মাথা নাড়লেন—'ঠিক আছে মিস বিশ্বাস। ঘুমের ওষুধ খাওয়া—খারাপ অভ্যাস।'

—আমি কি আপনার জন্যে কিছু করতে পারি?' বললাম।

—ধন্যবাদ—কিছু করতে হবে না।' সন্দীপ বললেন।

—আমি সত্যি খুব দুঃখিত।' একটু আবেগের সঙ্গেই বললাম।

—দুঃখিত?' উনি অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালেন।

—হ্যাঁ, আমি বললাম 'সকলের জন্যেই। কী সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। অবশ্য আমি বিশেষ করে আপনার জন্যেই বড় দুঃখিত।

—আমার জন্যে? কেন? সন্দীপ বললেন।

—আপনি তো ডঃ সেন ও ইভা সেনের পুরানো বন্ধু।

—হ্যাঁ— সুমন্ত্রর পুরানো বন্ধু আমি। বিশেষ ক'রে ইভা সেনের বন্ধু নই মানে ছিলাম না।' সন্দীপ বললেন। এমনভাবে বললেন যেন তিনি সত্যই ইভাকে ঘৃণা করেন। বললাম—'আচ্ছা চলি।'

নিচের ঘরে এসে হাত মুখ ধুলাম। দু'টো রুমাল কাচলাম। দেখলাম অফিসঘরে তখনও আলো জ্বলছে। ভাবলাম যাই ডঃ সুমন্ত্র সেনকে শুভরাত্রি জানিয়ে আসি। আবার ভাবলাম কাজ করছেন এ সময় বিরক্ত না করাই ভালো। কিন্তু একটা অস্বস্তি আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

দেখি অফিসঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু ইন্দ্রানী সরকার ছাড়া অফিসঘরে আর কেউ নেই। মাথা নীচু ক'রে টেবিলে মাথা রেখে ইন্দ্রানী কাঁদছে। ওর সমস্ত শরীর কান্নার বেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমি বেশ চমকে উঠলাম। ইন্দ্রানী এত শান্ত আর আত্মসংযমী মেয়ে। সে কাঁদছে? দুঃখ পেলাম।

—কী হ'য়েছে মিস সরকার?' আমি গলা চাড়িয়েই ডাকলাম।

ওর পিঠে হাত রেখে মৃদু চাপড় দিলাম। বললাম—আপনি এভাবে কাঁদবেন না।' ইন্দ্রানী কোন কথা বলল না। কেঁদেই চলল। আমি বললাম—'নিজেকে সংযত করুণ। এক কাপ গরম চা ক'রে আনছি।' ইন্দ্রানী মুখ

তুলল। বলল—'না না ঠিক আছে মিস বিশ্বাস। আমি একটা নিরেট বোকা।

—কী হ'য়েছে বলুন তো?' আমি জানতে চাইলাম।

ইন্দ্রানী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। পরে বলল—'কী জঘন্য ব্যাপার—।'

—ওসব ভাববেন না।' আমি বললাম—'যা হ'য়েছে হ'য়েছে। তা'তো আর ফেরানো যাবে না। ওসব ভেবে কী হবে।

ইন্দ্রানী চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসল। মাথার চুল আঙ্গুল দিয়ে পাট করল। কেমন একটা কর্কশ স্বরে বলল—

—নিজেকেই নিজে বোকা বানাচ্ছি। অফিসের ফাইল কাগজপত্র গোছাচ্ছিলাম। কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চেয়েছি। তখনই হঠাৎ হাতে পড়ল—

হ্যাঁ হ্যাঁ—বুঝেছি' আমি বললাম—'আপনার চাই এক কাপ গরম চা আর বিছানায় শুয়ে একটা গরম জলের ব্যাগ। আমি এসবেব ব্যবস্থাও করলাম।

ইন্দ্রানীকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে ইন্দ্রাণী বলল—'ধন্যবাদ মিস বিশ্বাস। আপনি খুব সহানুভূতিশীল বুদ্ধি-মতী মহিলা। অবশ্য নিজেকে আমি সবসময় বোকা মনে করি না।

—এরকম হ'তেই পারে' আমি বললাম-'যা চলছে এখানে। মানসিক শ্রম। পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস তার ওপর পুলিশী তৎপরতা - মাঝে মাঝে নিজেকে ভয়ানক উত্তেজিত মনে হয়। একটু অদ্ভুত সুরে ইন্দ্রানী বলল—যা বললেন তা সত্যি। যা ঘটে গেছে তার তো আর চাড় নেই। ইন্দ্রানী দু'এক মিনিট, চুপ করে রইল। তারপর বলে বসল—ইভা কখনই ভালো মেয়ে ছিল না।

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। ভাবলাম ইভা সেনের মৃত্যুতে ইন্দ্রানী হয়তো খুশী হ'য়েছে। আবার একথাটা ভেবে ইন্দ্রানী এখন হয়তো লজ্জিত বোধ করছে। আমি বললাম—এবার ঘুমোন। আজেবাজে চিন্তা একেবারে করবেন না।

ঘরের কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে গাছিয়ে রাখলাম। মেঝেয় একটা দলা পাকানো কাগজ পড়ে ছিল। হয়তো পড়ে গেছে। আমি কাগজটা তুলে ভাজ ভেঙে টান টান করছি। পড়ে দেখছি ফেলে দেবার মত কাগজ কিনা। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ইন্দ্রানী কাগজের টুকরোটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। চাপা স্বরে বলল—ওটা আমাকে দিন। কাগজটা নিয়ে

মোমবাতির শিখায় ধরল। কাগজটা পুড়ে কুঁকড়ে গেল। ইন্দ্রানী এত তাড়াতাড়ি কাগজটা ছিনিয়ে নিল যে আমি কীসের কাগজ দেখতেও পারলাম না। পোড়া কাগজটার গায়ে কালিতে লেখা কতকগুলো অক্ষর দেখলাম।

ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম—ঐ হাতের লেখাটা কেমন পরিচিত মনে হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে চমকে উঠলাম—ঐ হাতের লেখাটা ঠিক উড়ো চিঠিগুলোর হাতের লেখার মত। তবে কি ইন্দ্রানী সরকারই ঐ চিঠিগুলো লিখতো? এইজন্যেই কি ইন্দ্রানীর আজকের অনুশোচনা?

পরদিন বিতংস চৌধুরী এলেন। আমি আড়ালে তাকে আমার সংগৃহীত নতুন তথ্যটা তাকে জানাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই ভদ্রলোককে একা পেলাম না। যখন একা পেলাম তখন আমি কিছু বলার আগে উনিই ফিসফিস ক'রে আমাকে বললেন—মিস বিশ্বাস—একটা পরীক্ষার জন্য আপনার সাহায্য চাই।

— বলুন।

— শুনুন—আমি এই অফিস ঘরে ইন্দ্রানী সরকার আর অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকবো। আপনি মিসেস ইভা সেনের ঘরে ঢুকে—ঘরের চাবি আপনার কাছেই আছে—দরজা বন্ধ করে একবার চীৎকার ক'রে উঠবেন—খুব তীব্র স্বরে নয়—মানে অস্বাভাবিক বা অকল্পনীয় কিছু দেখলে আমরা যেমন বিস্ময়াহত চীৎকার করে উঠি—তেমনি। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম তখন ইন্দ্রানীকে দেখলাম উঠোন পেরিয়ে এই অফিসঘরের দিকে আসছে।

ইভা সেনের বন্ধ ঘরটায় ঢুকে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বন্ধ ঘরটায় পায়চারী করতে করতে একটা অলস কল্পনাবিলাস আমাকে পেয়ে বসল। আমি আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। নিজেকে ভাবতে লাগলাম—ইভা সেন। এই অলস কল্পনাকে আমি প্রশ্রয় দিতে লাগলাম।—আমি ইভা সেন—আমি ইভা সেন—এখানে শুয়ে আছি—দরজা খুলে যাচ্ছে—আমি জালে জড়িয়ে পড়ছি—রহস্যের সমাধান হবে—কিন্তু আমি বোধ হয়······দরজাটা খুলে যাচ্ছে······কে যেন ঘরে ঢুকছে···। হঠাৎ দেখি সত্যি দরজাটা খুলে যাচ্ছে—ধীরে ধীরে—নিঃশব্দে। উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপতে লাগল—আমার হাত পা অসাড় হ'য়ে এল।

দরজাটা খুলে যেতে লাগল।

নিঃশব্দে।

ধীরে ধীরে দরজাটার ফাঁক বাড়তে লাগল—বাড়তে লাগল। কে যেন ঘরে ঢ্বকল। জয়ন্ত নন্দী। হাতে কী যেন ধরা রয়েছে। আমি বিস্ময়াহত চীৎকার করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। তারপর ছ্বটলাম খোলা দরজার দিকে।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্ময়ে ওর ম্বখ হাঁ হ'য়ে গেছে। ও ব'লে উঠল—

—মিস বিশ্বাস—কী—কী হ'য়েছে?

আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। এতক্ষণে সহজ শ্বাস ছেড়ে বললাম—। ওঃ জয়ন্তবাব্। এত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

—দ্বঃখিত। জয়ন্ত লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল।

—হাতে কী আপনার? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—ও কিছ্ব না—ব্বনো ফুল। মাথা নীচু ক'রে ও সলজ্জভঙ্গীতে বলল —ইভা সেন ফুল ভালোবাসতেন—কিছ্ব না—টেবিলে রেখে দেব—এই আর কি।

আমি অফিস ঘরে ফিরে এলাম। দেখি বিতংস আর ইন্দ্রানী পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন। ব্বঝলাম বিতংসের পরীক্ষাটা কীসের? ইন্দ্রানী যে বলেছিল একটা অস্পষ্ট চীৎকার সে এই অফিসঘর থেকে শ্বনতে পেয়েছিল সেটা নেহাৎই তার কল্পনা না সত্যিকারের কিছ্ব। ইন্দ্রানী তখন বলছিল— আমরা দ্বজন মানে সন্দীপবাব্ব আর আমি ডঃ স্বমন্ত্র সেনের সঙ্গে অনেকদিন কাজ করছি। গত সীজন এই ধর্বন না—কত আনন্দে এখানে কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন কেটেছে। ডঃ সেন তো ছেলেমান্বষের মত হৈ চৈ করতেন। একটু ঠাট্টা রসিকতাও যে আমাদের মধ্যে না চলত তা' নয়। এ বছর কেমন যেন সব—অন্য রকম হ'য়ে গেল।

—মিসেস ইভা সেনই কি এর জন্য দায়ী?

—ঠিক তাই বা বলি কী ক'রে।

—আচ্ছা ইভা সেন কেমন মান্বষ ছিলেন? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন।

—কয়েকটা বিশেষণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি—মেজাজী, অন্যদের সম্পর্কে উৎস্বক বা কৌতূহলী, নার্ভাস, কল্পনাবিলাসিনী—সবচেয়ে বড় কথা ডঃ স্বমন্ত্র সেনের মত একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি যে তাঁর স্বামী এ সম্পর্কে তিনি

মোটেই সজাগ ছিলেন না।

—হুঁ। আচ্ছা উড়ো চিঠিগুলো সম্পর্কে আপনার কী অভিমত।

—ইভা সেন কলকাতার মেয়ে। তিনি সুন্দরী ছিলেন। সুতরাং বলা বাহুল্য সেখানে তাঁর শত্রুর অভাব নেই। তেমনি কোন ঈর্ষাকাতর মেয়ের কাজ এটা। ইভা সেন অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির ছিলেন। এইসব চিঠি পাঠিয়ে তাঁর মনকে বিপর্যস্ত করা অতি সহজ ছিল।

—রুবি বোস তো আপনি চেনেন।

—হ্যাঁ আগের সীজনএ খুব আসতো টাসতো। এবারের সীজনএ বার দু'য়েক বেড়াতে এসেছিল।

—আপনাদের এক্সকাভেশন পার্টির কারো সঙ্গে কি ও'র—

ইন্দ্রানী হেসে ফেলল—ও প্রেমের ব্যাপার। হ্যাঁ জয়ন্ত আর শোভেনবাবুর সঙ্গে রুবির সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ। ওদের দু'জনের মধ্যে এই নিয়ে বোধ হয় বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে।

—তাহ'লে ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন।

ইন্দ্রানী একটু গম্ভীর হ'ল। বলল—তাই বা বলি কী ক'রে। কিছুদিন আগে ইভা সেন রুবী বোসের সঙ্গে বেশ দুর্ব্যবহার করেছিলেন? তারপর থেকে রুবি আর আসেনি। তাছাড়া ইভা সেন এই নিয়ে শোভেনবাবুকে বেশ ঠেস দিয়ে কথা বলতেন। একটু থেমে ইন্দ্রানী বলল—একবার রুবি বোসকে নদীর দিক থেকে একা ফিরে আসতে দেখেছিলাম। তার চোখে মুখে কেমন একটা বিস্ময় বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ ইন্দ্রানী থেমে গিয়ে বলল —কিন্তু এসব খবরের সঙ্গে আপনার তদন্তের যোগ কোথায়? বিতংস তরলস্বরে বললেন—দেখুন মিস সরকার—গোয়েন্দাগিরি করি বলে কি আমাদের রসকস কিছু থাকতে নেই?

—না, না, তা' কেন?' ইন্দ্রানী ব'লে উঠল।

—মানে নরনারীর প্রেমের কাহিনী শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। প্রেম একটা স্বর্গীয় ব্যাপার।' বিতংস বললেন। বেশ আবেগ দিয়েই বললেন। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে, যেন বেশ কষ্ট ক'রে ইন্দ্রাণী শুধু বলল—'যদি প্রেমের পথে কোন বাধা না থাকে।,' বিতংস হঠাৎ উঠে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন—এখন কা'কে কা'কে পাওয়া যাবে এখানে?' ইন্দ্রাণীই উত্তর দিল—চন্দ্রা সিংকে ছাতে পাবেন।'

ছাতে উঠতে উঠতে আমি মৃদুস্বরে গত রাত্রির ঘটনাটা বিতংসকে বললাম। বিতংস একবার একটু থমকে দাঁড়াল তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। কোন মন্তব্য করলেন না। ইভা সেনের ঘর থেকে আমার চীৎকার শুনতে পেয়েছিলেন?'

—না।

—তাহ'লে ইন্দ্রানী যে শব্দ শুনেছিল বলেছে সেটা মন-গড়া?

—না।

বিতংস চন্দ্রা সিং এর কাছে ইভা সেন সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাইলেন। চন্দ্রা একগাদা মিথ্যে কথা ব'লে গেল—তারা সকলেই ইভা সেনকে ভালোবাসতেন। প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে ইভা সেনের নাকি খুব উৎসাহ ছিল। ইভা নাকি প্রীতম সিং এর সঙ্গে রাসায়নিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতেন। এখানে যে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এটা চন্দ্রা সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে গেল। বলল মনগড়া ব্যাপার। 'আমরা সকলেই বেশ আনন্দে ছিলাম।' চন্দ্রা সিং সবশেষে এই মন্তব্য করল।

ছাত থেকে নামার সময় বিতংস যেন আপনমনেই বলল—

যখন কারো মুখ মিথ্যে কথা বলে তার চোখ তখন সত্য বলে। চন্দ্রা সিং-এর চোখেমুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন দেখেছি। কিন্তু কেন ভয়? কীসের ভয়?'

ইন্দ্রানী সরকারও মিথ্যেবাদী।' আমি বললাম।

হুঁ। চলুন ঢিবির দিকে যাওয়া যাক।'

যেখানে ঢিবিগুলোয় খননকার্য চলছে সেখানে এলাম। প্রথমেই রঙ্গনাথনের সঙ্গে দেখা। সে তখন মাটি কাদা ভর্তি একটা পাথরের দেওয়ালের ফটো তুলছিল। ফটো তোলা হ'লে বিতংস ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা ব'লে সোজা প্রশ্ন ক'রে বসলেন—'ইভা সেনকে আপনার কেমন লাগতো?'

রঙ্গনাথন একটু থতমত খেয়ে বলতে শুরু করল—'ইয়ে ভালোই বুদ্ধিমতী হ্যাঁ, যথেষ্ট বুদ্ধি রাখতেন, আর ইয়ে, কী সুন্দরী।'

থাইছে।' বিতংস মন্তব্য করলেন।

কী বললেন?'

কিছু না। মোটকথা আপনি তাকে পছন্দ করতেন এবং তিনিও আপনাকে পছন্দ করতেন।'

রঙ্গনাথনের মুখটা লজ্জারুণ হ'ল। বলল—'কী যে বলেন—আমাকে উনি পাত্তাই দিতেন না। ইভা দেবীর জন্যে কিছু করতে গিয়ে এমন সব কাণ্ড করে বসতাম যে উনি ভীষণ বিরক্ত হতেন। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেত, বুঝলেন—

বুঝেছি। নমস্কার।' বিতংস বললেন।

অন্যদিকে যাবার সময় বিতংস যেন আপন মনেই বললেন, 'রঙ্গনাথন হয় অতি সরলমনা নয়তো চোস্ত্ এ্যাক্টর—অভিনেতা।'

একটু এগোতেই দেখি প্রীতম সিং কুলীদের কাজের নির্দেশ দিচ্ছে। বিতংস বললেন—'নমস্কার মিঃ সিং। প্রীতম সিং মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখে গর্ত থেকে উঠে এল। জামার হাতা গোটানো। বুক খোলা। তার গায়ে হাতে কুসকুরীর মত কী যেন। চোখদু'টো জবাফুলের মত লাল। বিতংস তার সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় নিয়েই বেশী কথা বললেন। এখানে মাটি খুঁড়ে কী কী পাওয়া গেছে সেসব নিয়েও কথা হ'ল। তারপর বিতংস অন্যদিকে চললেন। যেতে যেতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—

—বুঝলেন কিছু?

—প্রীতম সিং মদ্যপায়ী এবং ড্রাগ আসক্ত।

—আপনার প্রশংসা করছি—আপনি বুদ্ধিমতী।

আস্তে আস্তে বিতংসর ওপর আমার বিশ্বাস বাড়তে লাগল। মনে হ'তে লাগল যেন আমি নার্স তিনি ডাক্তার—আমরা একটা জটিল অস্ত্রোপচার ক'রে চলেছি।

ঢিবি খোঁড়ার এলাকাতেই সন্দীপ চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা হ'ল। সন্দীপবাবু সরাসরি বললেন—আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবো ব'লে মনে হয় না।

—তবু আপনার সঙ্গে ইভা সেনের সম্পর্কটা কেমন ছিল?

—ভালো ছিল না। শত্রুতা নয় তবে ওঁর স্বামীর পুরোনো বন্ধু আমি এই জন্যেই বোধ হয় উনি আমার সম্পর্কে ঈর্ষাকাতর ছিলেন। অবশ্যই তিনি আকর্ষণীয়া মহিলা ছিলেন—তবে আমাদের সম্পর্কটা ভদ্রতার সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঘনিষ্ঠতর হ'তে পারে নি।

প্রশংসনীয় ব্যাখ্যা। বিতংস মন্তব্য করল—তাহ'লে আপনাদের মধ্যে সম্পর্কটা ভালো ছিল না?

—যা বোঝেন। একটু থেমে সন্দীপবাবু বললেন—ইভা সেন যদি সুমন্ত্র সেনের স্ত্রী না হতেন তাহ'লে হয়তো তাকে আমার ভালো লাগত। এই অদ্ভুত কথাটা নিজেই উপভোগ ক'রে সন্দীপ হেসে উঠলেন।

—দেখুন মিঃ চ্যাটার্জী—ইন্দ্রানী সরকার আর চন্দ্রা সিং দু'জনেই ইভা সেনকে আকর্ষনীয়া বলেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলেছেন যে তাঁরা তাকে পছন্দ করতেন না।

—তাঁরা সত্য কথাই বলেছেন। সন্দীপবাবু সহজ সুরে বললেন '

—কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি—বিতংস বললেন—এবং এখন আপনি যা বললেন তাও বিশ্বাস করি না।

আপনার অভিরুচি। নিস্পৃহ স্বরে সন্দীপবাবু বললেন।

দেখুন—বিতংস বললেন—এখানে অনেক গল্প আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেউ শোনে—কেউ শোনে না।

সন্দীপবাবু তীব্রদৃষ্টিতে বিতংসর দিকে তাকালেন। স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম তার কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে। তা'তে তাকে দেখতে আরো সুন্দর লাগছে।

—কী গল্প? একটু গম্ভীর সুরে সন্দীপবাবু বললেন।

—আপনিও বুঝতে পারছেন—আপনাকে আর ইভা সেনকে জড়িয়ে—

—কী কুৎসিৎ মন মানুষের। আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

—আমি সত্যকে উদ্ঘাটন করতে চাই।

—তাহ'লে সত্যি কথাটা শুনুন—আমি ইভা সেনকে ঘৃণা করতাম—হ্যাঁ ঘৃণা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতাম। বেশ ক্রুদ্ধভঙ্গীতে লম্বা লম্বা পা ফেলে সন্দীপবাবু চলে গেলেন। বিতংস বিড় বিড় ক'রে বললেন—

—হুঁ—বুঝেছি।

—আপনার কী মনে হয় সন্দীপবাবু কি সত্যিই ইভা সেনকে ঘৃণা করতেন জিজ্ঞেস করলাম?

—হ্যাঁ—সত্যিই ঘৃণা করতেন। বিতংস বললেন।

আর একটা ঢিবির কাছে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ঢিবিটার ওপরের দিকে তখন খননকার্য চলেছে। ওপরে উঠে শোভেন ঘোষের দেখা পাওয়া গেল। তাকে দেখা গেল একটা কঙ্কালের হাড়গুলো থেকে ছুরি দিয়ে চেঁছে মাটি তুলছে। শোভেন বলল—কঙ্কালটা এইমাত্র পাওয়া গেল। আপনারা কি

জায়গাটা ঘুরে দেখছেন ? বিতংস সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

একটু অপেক্ষা করুন আমার এক্ষুনি হ'য়ে যাবে। কথাটা বলে শোভন পাশে দাঁড়ানো একজন সর্দারগোছের কুলীকে ডাকল। ছুরি দিয়ে কীভাবে হাড়ের গায়ে-লাগা মাটি তুলতে হবে দেখিয়ে দিল। সর্দারটি সেইভাবে মাটি তুলতে লাগল।

—কঙ্কালটা পুরুষের না নারীর ? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন।

—নারীর। মনে হয় হাজার দুয়েক বছর আগেকার। মাথার খুলিটায় আঘাতের চিহ্ন আছে। অবশ্য এটা মিঃ সিংই ভালো বলতে পারবেন। তবে মনে হয় মৃত্যুটা সন্দেহজনক।

—দু'হাজার বছর আগেকার মিসেস ইভা সেন। বিতংস বললেন।

—হয়তো। কথাটা ব'লে শোভেন অন্য পাশে কর্মরত জয়ন্তর দিকে তাকাল। বলল—জয়ন্তবাবু কাজটা একটু চালিয়ে নিন। আমি একটু খেতে যাচ্ছি। আপনিও আসুন।

আমরা ক্যাম্পের দিকে ফেরার পথ ধরলাম। বিতংস কথায় কথায় বললেন —আবার কাজে কর্মে লাগতে পেরে আপনারা সবাই নিশ্চয়ই খুশী হ'য়েছেন।

একটু গম্ভীরস্বরে শোভেন বলল—হ্যাঁ ক্যাম্পে ব'সে শুধু পরস্পর কথা-বার্তা বলা তার চেয়ে কাজ ভালো বৈ কি।

—আর কখনোই আপনারা ভুলতে পারছেন না যে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন একটা নরহত্যা করেছেন।

শোভেন কোন উত্তর দিল না। অপ্রিয় কথাটা শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে এমন ভাবও প্রকাশ করল না। কয়েকমিনিট পর শান্তস্বরে বলল—আপনার কি কোন উদ্দেশ্য আছে মিঃ চৌধুরী ?

গম্ভীরস্বরে বিতংস বললেন—নিশ্চয়ই। আপনার সাহায্য চাই করবেন কি ? —অবশ্যই।

—ইভা সেন সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

খুনের ব্যাপারে এটা জানা আপনার কি খুবই প্রয়োজন ?

—অবশ্যই।

—কিন্তু আমি কি বুঝিয়ে বলতে পারবো ?

—চেষ্টা করুন।

শোভেন এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল—এটা তো মিস বিশ্বাসই ভালো বলতে পারবেন। মেয়েদের চরিত্র মেয়েরাই ঠিক বোঝে।

—কিন্তু আমি জানতে চাই পুরুষের অভিমত। বিতংস বললেন।

দেখুন—এক জায়গায় কাছাকাছি বেশ কিছুদিন থেকেছি। কাজেই ইভা সেন সম্পর্কে একটা মত আমার নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে। তবে সেটা কতদূর নির্ভুল জানি না।

—তবু শুনি।

কিন্তু ইভা সেন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রে কি কোন সমাধানে পৌঁছোতে পারবেন? শোভেন সংশয় প্রকাশ করে বলল।

—ঐটিই একমাত্র পথ। এখানকার সমস্ত কাহিনীর কেন্দ্র চরিত্র ইভা সেন।

ঠিক ঐটিই আমার অভিমত মিঃ চৌধুরী। ইভা সেন সব কিছুর কেন্দ্রে থাকতে চাইতেন। আশেপাশের সকলে তার অস্তিত্বকে তাদের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি দিক এটাই তিনি চাইতেন। তা'তে এতটুকু শৈথিল্য ঘটলে তার ভদ্র কোমল চেহারাটি একেবারে পাল্টে যেত। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার।

—হুঁ—। আচ্ছা শোভেনবাবু—সাধারণভাবে কা'কে আপনার হত্যাকারী ব'লে মনে হয়?

—কী ক'রে বলি। তবে আমি যদি রঙ্গনাথন হতাম তাহ'লে নিশ্চয়ই ইভা সেন আমার হাতেই খুন হতেন।

—বলেন কি।' বিতংস বিস্ময় প্রকাশ করল।

—রঙ্গনাথনের সঙ্গে উনি এমন অপমানজনক ব্যবহার করতেন সে বলবার নয়। অবশ্য রঙ্গনাথনেরও দোষ আছে। গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গেলে কে না চড় মারবে?

তাহ'লে রঙ্গনাথন চড়ই খেয়েছিলেন?

—না। ইভা সেনের অপমান করার পদ্ধতিটা বড় সূক্ষ্ম।

—তাহ'লে আপনার বিশ্বাস রঙ্গনাথন এই খুন করতে পারেন না?

—অসম্ভব। রঙ্গনাথনটা একটা ভাঁড়।

আমরা খাবার ঘরের দিকে যাচ্ছি দেখি আলী সাহেব তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। আলী সাহেব বিতংসকে তার ঘরে ডাকল। বিতংস তার ঘরে গেলেন। আমি খাবার ঘরে চলে এলাম।

খাবার ঘরে আমি, গোজেন, ইন্দ্রানী সরকার আর চন্দ্রা সিং খেতে বসেছি। চন্দ্রা নাথালকে বলল আলী সাহেবকে খাওয়ার জন্য ডাকতে। ঠিক এই সময় একটা চাপা চীৎকারে আমরা চমকে উঠলাম। কম বেশি আমরা প্রায় সকলেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। শব্দটা আলী সাহেবের ঘরের দিক থেকে এসেছিল। তখনই প্রীতম সিং, রঙ্গনাথন আর জয়ন্ত খাবার ঘরে ঢুকল।

—কী হ'ল?' ইন্দ্রানী সরকার প্রায় আর্ত চীৎকার ক'রে উঠল।

চন্দ্রা সিং আর ইন্দ্রানীর দিকে তাকিয়ে বলল—'অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন। হয়তো বাইরে ক্ষেতখামারের দিক থেকে শব্দটা এসেছে।'

এমন সময় বিতংস আর আলী সাহেব ঘরে ঢুকলেন। বিতংস গলা চড়িয়ে বললেন—'আপনাদের সকলের কাছে মাফ চাইছি। ব্যাপারটা হয়েছে কি আলী সাহেবের ঘরে একটা চেয়ারে পা বেঁধে পড়ে যাচ্ছিলাম। তাই চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম।

—আমরা ভাবলাম বুঝি আর একটা খুন।' চন্দ্রা হেসে বলল।

—চন্দ্রা!' প্রীতম সিং ধমকের সুরে ব'লে উঠল। চন্দ্রা দাঁতে দাঁত চেপে চুপ ক'রে গেল। ইন্দ্রানী প্রত্নতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে কী একটা কথা ব'লে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল। ঘরের সকলেই এতে যেন স্বস্তি পেল।

খাওয়াদাওয়ার পর আলী সাহেব ছাড়া পুরুষরা সকলেই খনন কার্যের জায়গায় চলে গেল। মেয়েরাও যে যার ঘরে চলে গেল, আলী সাহেব বিতংসকে এ্যান্টিকা রুমে নিয়ে গেল।

আমিও সঙ্গে গেলাম। সোনার ত্রিশূল, তরবারির খাপ এসব আমি আগে দেখেছিলাম। বিতংস দেখতে দেখতে মৃদুস্বরে বলে উঠলেন—'অপূর্ব'। আলী সাহেব উৎসাহের সঙ্গে ওগুলোর গঠন সৌকার্যের কথা বলতে লাগলেন। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে ত্রিশূলে তরবারির খাপগুলোর গায়ে মোম লাগানো নেই। তাই বললাম—

—আজকে কিন্তু এগুলোতে মোম লাগানো নেই।

—মোম?' বিতংস বেশ অবাক চোখে আমার দিকে তাকালেন।

—মোম?' আলী সাহেবও আমার দিকে তাকাল।

আমি তখন ইভা সেনের সঙ্গে এ ঘরে আসার কথা—নখ খুঁটে ইভা সেন যে এগুলোর গায়ে মোম লাগানো দেখেছিল, সেই কথা বুঝিয়ে বললাম।

—ও তাই বলুন—' আলী সাহেব বলল—'মোমবাতির মোম।'

তারপরেই সেই গভীর রাত্রে এ্যাণ্টিক্যারুমে চোর ঢোকার কথা উঠল। বিতংস পরিষ্কার উর্দুতে আলী সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমি চলে এলাম।

অফিস ঘরে এসে দেখি ইন্দ্রানী সরকার চুপচাপ ব'সে আছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি এমন সময় বিতংস সেখানে এলেন। চেয়ারে বসতে বসতে আপনমনেই বলে উঠলেন, অদ্ভুত মানুষ।

—কার কথা বলছেন? ইন্দ্রানী জিজ্ঞেস করল।

ঐ আপনাদের আলী সাহেব।

—ওর তো কোন কাজই নেই। মাত্র কয়েকটা শিলালিপি পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত।

ওগুলোই সারাদিন নাড়াচাড়া করছেন উনি।

আচ্ছা মিস সরকার—আপনারা শিলালিপির ছাপ তোলেন কী করে? সেদিন তো আপনি এ ঘরে ঐ কাজই করছিলেন?

—হ্যাঁ দাঁড়ান। দেখাচ্ছি আপনাকে।

দেয়ালের কাছে রাখা একটা আলমারী থেকে ইন্দ্রানী কয়েকটা প্ল্যাস্টিসিনের খণ্ড নিয়ে এল। বলল—এগুলো হচ্ছে প্ল্যাস্টিসিন। এগুলোর ওপরে চাপ দিন শিলালিপির ছাপ তোলা হয়। কয়েকটা ছাপ ইন্দ্রানী দেখাল। লেখা আর তার চারপাশের নক্সাগুলো সুন্দর ফুটে উঠেছে।

—আপনারা অনেক প্ল্যাস্টিসিন ব্যবহার করেন—তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু এ বছরে এরমধ্যেই কী ক'রে যেন প্ল্যাস্টিসিনের স্টক ভীষণ কমে গেছে প্রায় অর্ধেক হ'য়ে গেছে স্টক।

—প্লাস্টিসিন তো ঐ আলমারীতেই রাখা হয়? বিতংস জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ দেখবেন আসুন।' ইন্দ্রানী ডাকল, দু'জনে আলমারীটার কাছে গেল। আলমারীর ডালা খুলে ইন্দ্রানী প্লাস্টিসিনের রোলগুলো দেখাল বিতংসকে। ফটোগ্রাফিদের প্লেট, কিছু ওষুধপত্র, তুলো প্রয়োজনীয় নানা জিনিস রয়েছে আলমারীতে।

—এটা কী মিস সরকার? কথাটা ব'লে বিতংস আলমারীর তাকের কোনা থেকে তালগোলপাকানো প্লাস্টিসিনের একটা ডেলা মত বের করল। ডেলাটা টেনে টেনে পাট করতে দেখা গেল একটা রঙমাখা মুখোশ। চোখ নাকের ফুটোও রয়েছে মুখোশটার। বিস্ময়ের সঙ্গে ইন্দ্রানী ব'লে উঠল—'আশ্চর্য'—

'এটা তো আগে দেখিনি, এটা এল কোত্থেকে ?'

এমন সময় চন্দ্রা সিং ঘরে ঢুকল। সেও মুখোশটা দেখল। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট ভীতি ফুটে উঠল। বিতংস ধীর স্বরে বললেন—

—অলীক কল্পনা নয়। মিসেস ইভা সেন এই মুখোশটাই জানলার ওপর ঝুঁকে পড়েছে দেখেছিলেন।' বিতংসের মুখটা গম্ভীর হ'য়ে গেল। ইন্দ্রানী বলে উঠল, জঘন্য রসিকতা। চন্দ্রা সিং চাপা চীৎকার করে বলে উঠল, তাহলে তো যে লোহার অস্ত্রটা দিয়ে খুনী খুন করেছে সেটাও তো রক্তমাখা অবস্থায়—উঃ আমি আর ভাবতে পারছি না। ইন্দ্রানী শান্তস্বরে বলল, মিসেস সিং ডঃ সেন আসছেন। চুপ করুন। ডঃ সেন ঘরে ঢুকলেন। তাকে বড় ক্লান্ত আর অসহায় লাগছিল। ইন্দ্রানী তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল।

—তারপর মিঃ চৌধুরী আপনার কাজকর্ম, ডঃ সেন বললেন।

—এগোচ্ছে। বিতংস বললেন। ইন্দ্রানী এ সময় এক কাপ গরম কফি হাতে ফিরে এল। ডঃ সেনের মুখটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। নরম গলায় বলল কেন কষ্ট ক'রে আর, কথাটা শেষ না ক'রে কাপে চুমুক দিলেন। ইন্দ্রানীর মুখেও একটা সলজ্জ কৃতার্থতার হাসি ফুটে উঠল। ইন্দ্রানী এমন একটা অনুনয়ের দৃষ্টিতে বিতংসের দিকে তাকাল যেন বলতে চাইল – ডঃ সেনকে যেন মুখোশটার ব্যাপারে কিছু বলবেন না। বিতংসও ইচ্ছে থাকলেও মুখোশটার ব্যাপারে ডঃ সেনকে কিছু বলতে পারলেন না।

বিতংস অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। আমি সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিলাম। অনেক কথাই তাকে জিজ্ঞেস করার ছিল। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করা হ'য়ে উঠল না। গাড়ি থেকে হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে বিতংস বললেন, একটু সাবধানে থাকবেন। নিজের ঘরের দরজার কাছ থেকে আজী সাহেব বিতংসকে লক্ষ্য করে হাত নাড়ল। বিতংসও প্রত্যুত্তরে হাত নাড়তে নাড়তে যেন আপনমনেই বলল—অদ্ভুত মানুষ।

পরের দিন ডঃ সুমন্ত্র সেনের সঙ্গে আমার কলকাতা ফেরা নিয়ে কথা বললাম। আমার তো পলাশগড়ে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এবার ফেরা। স্থির হল একদিন পরে আমি খুরদার ডঃ বোসের বাড়িতে যাবো। ওখানে একদিন থেকে কলকাতা রওনা হবো।

বিকেলে নিজের ঘরে স্যুটকেসে কাপড়চোপড় গোছগাছ করছি, হঠাৎ

দরজায় টোকার শব্দ শুনলাম। বিতংসর সাবধান বাণীটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা না খুলে একটু অপেক্ষা করলাম। আবার টুক্‌টুক দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। গলা চড়িয়ে বললাম, কে ?

—আমি আলী সাহেব। নিজের মনেই হেসে দরজাটা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকে আলী সাহেব বলল, আপনি চলে যাচ্ছেন—শুনে খুব খারাপ লাগছে।

আপনাদের ছেড়ে যেতে আমারও খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় কি ?

আলী সাহেব দ্রুত প্রসঙ্গ পালটাল। বলল—

আচ্ছা মিস বিশ্বাস, মিঃ চৌধুরী, মানে বিতংসবাবুকে আজকে দেখছি না। মনে পড়ল বিতংস কথায় কথায় বলেছিলেন আজকে উনি এখানে আসবেন না। সারাদিন প্রায় খুরদার পোস্টাফিসেই কাটবে। নানান জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।

বললাম সে কথা। বেশ আশ্চর্য হ'ল আলী সাহেব। বলল—

টেলিগ্রাম পাঠাবেন ? কোথায় ? কলকাতায় ?

হতে পারে।

বাব্বাঃ সারা ভারতে টেলিগ্রাম পাঠাবেন নাকি। সারাদিন ধ'রে ? মজা মন্দ না।

তারপর সেই ওড়িয়া ভদ্রলোককে আমরা কোথায় কখন কী অবস্থায় দেখেছিলাম এইসব নিয়ে দু'একটা কথা বলে আলী সাহেব চলে গেলেন।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে গিয়ে বেশ পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম যাই ছাতে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। ছাতে উঠলাম। দেখি, ইন্দ্রানী একা যেন স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছে গেলাম। তবু ইন্দ্রানীর সম্বিত ফিরে এলো না। একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। একটা অবিশ্বাস্যরকমের কিছু দেখেছে এমনি ভঙ্গীতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি মৃদুস্বরে ডাকলাম, মিস সরকার ?

ইন্দ্রানী ভীষণ ভাবে চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। কেমন শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হ'ল ?

—অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। অতিকষ্টে কথাটা বলল সে। তার গলাটা যেন শুকিয়ে গেছে।

—কী দেখলেন ?

দেখলাম, কী ক'রে একজন লোক সকলের অলক্ষ্যে ভেতরে আসতে পারে। বেশ অবাক হলাম। ও বলছে কি? ইন্দ্রানী যেদিকে তাকিয়েছিল সেদিকে আমিও তাকালাম। খুবই সাধারণ দৃশ্য। রঙ্গনাথন ফটোগ্রাফি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আলী সাহেব উঠোন পেরোচ্ছে। সবই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

কই, আমি তো অস্বাভাবিক কিছুই দেখছি না। আমি বললাম।

এখন নয়, পরে। চিন্তা ক'রে দেখতে হবে। অস্ফুটস্বরে ইন্দ্রানী বলল। ওর যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

—বলুনই না?

না এখন নয়, ইন্দ্রানী দ্রুত ছাতের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

আমি আবার বুঝতে চেষ্টা করলাম। ইন্দ্রানী যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেখানে এসে দাঁড়ালাম। নীচে তাকিয়ে ভালো ক'রে দেখলাম। চারদিকেই বন্ধ। মেন গেটএ দারোয়ান ব'সে আছে। রাঁধুনী আর নাথালু ওখানে গিয়ে জুটেছে আড্ডা দিচ্ছে। অসম্ভব! মেন গেট দিয়ে ছাড়া কারো পক্ষে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। মেন গেট দিয়ে কেউ ঢুকলে তার পক্ষে কারো নজর এড়ানোও সম্ভব নয়।

এই জটিল ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি নীচে নেমে এলাম।

রাত তখন দ'ুটো আড়াইটে হবে।

কী একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসলাম। অস্পষ্ট শব্দটা কিছুটা স্পষ্ট হল। কান পেতে শুনলাম। গোঙানির শব্দের মত। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে টর্চটা হাতে নিয়ে ছুটলাম। আবার সেই গলা চাপা গোঙানির শব্দ এল। আমার পাশের ঘর থেকে। ইন্দ্রানী! ভীষণভাবে চমকে উঠলাম? ছুটে গিয়ে ইন্দ্রানীর ঘরে ঢুকলাম। দেখি ও বিছানায় কাটা ছাগলের মত ছটফট করছে আর গোঙাচ্ছে।

আমাকে দেখে বিস্ফারিত চোখে তাকাল। কিছু বলতে চাইল। কিন্তু কর্কশ শব্দ ছাড়া কোন কথা বেরোল না। ইন্দ্রানীর মুখের কষে চিবুকে কী একটা ছাইরঙের জলীয় পদার্থ লেগে রয়েছে। গ্যাঁজলাও উঠছে মুখ দিয়ে। ইন্দ্রানী কথা বলতে না পেরে শুধু হাত বাড়িয়ে একবার মেঝেয় পড়ে থাকা একটা গ্লাশের দিকে ইঙ্গিত করল। তাড়াতাড়ি গ্লাশটা তুলে ভেতরে আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করতে গেলাম। আঙুলটা যেন জ্বলেপুড়ে গেল। নিশ্চয়ই

হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড। ইন্দ্রানী এ্যাসিড খেয়েছে। দ্রুতপায়ে ছুটলাম ডাঃ সেনের ঘরের দিকে। তাঁকে ডেকে তুললাম। একেএকে সকলেই এল।

জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে খুরদা ছুটল ডাঃ বোসকে খবর দিতে। কিন্তু ডাঃ বোস আসার আগেই সব শেষ। ইন্দ্রানী মারা গেল। উঃ কী যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু! আমি যখন ইন্দ্রানীর যন্ত্রণার উপশমের জন্যে মর্ফিয়া ইনজেকশান দিচ্ছিলাম তখন সে মরণপণ চেষ্টা করল কথা বলার জন্যে। দমবন্ধ করা গোঙানির সঙ্গে সে কী যেন বলল। আমি ঝুঁকে শুনলাম—

জানালা, মিস বিশ্বাস জানালাটা। এটাই তার তার শেষ কথা। তারপরই তার সমস্ত শরীরটা স্থির হ'য়ে গেল।

সেই ভয়াবহ রাত্রির কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না। ডাঃ বোস আর ইন্সপেক্টর রথীন মিত্র সেই রাত্রেই এলেন। বিতংস যখন এলেন তখন ভোর হয় হয়।

বিতংস আমাকে খাবার ঘরে এনে বসালেন। নাথালুকে ডেকে এক কাপ কড়া কফি বসাতে বললেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—'আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন।'

—উঃ কী কষ্টদায়ক মৃত্যু! ইন্দ্রানীর চোখ দু'টো যেন বেরিয়ে আসছিল—মুখ দিয়ে——" আর বলতে পারলাম না। আমার সমস্ত শরীরটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল।

—আপনি কিন্তু একজন নার্স—ভুলে যাবেন না।' নাথালু দু'কাপ কফি টেবিলে দিয়ে গেল। বিতংস বললেন—'যাক গে—আপনার যা করার তা তো করেছেন। নিন কফি খান।' কফি খেতে খেতে আমি বললাম 'হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড।'

—হুঁ—তাই মনে হচ্ছে। তবে পরীক্ষাসাপেক্ষ। হয়তো—আত্মহত্যা।

—অসম্ভব। আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম।

—কারণ? গতকাল বিকেলে ছাতে ইন্দ্রানীকে কী অবস্থায় দেখেছিলাম, ও আমাকে কী বলেছিল সবই বললাম। তারপর বললাম—

—নিশ্চয়ই ও কিছু দেখেছিল।

—হুঁ।' চিন্তান্বিত ভঙ্গীতে বিতংস একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ঠিক ঠিক বলুন তো ইন্দ্রানী কী বলেছিল—দ্য এগ্‌জাকট ওয়র্ড'স।'

—জানালা—মিস বিশ্বাস, জানালাটা। এই কথা ক'টা বলেছিল।

—'চিন্তামরী তারা তুমি' চলুন, ছাতে যাবো।' বিতংস উঠে দাঁড়ালেন।

ছাতে উঠে বিতংস বললেন—'ইন্দ্রানী ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে কথাটা বলেছিল ?' আমি ছাতের সেই জায়গাটা দেখালাম। বিতংস ঠিক সেখানটায় এসে দাঁড়ালেন। তখন পূর্বদিকে সূর্য উঠেছে। ভোরের মৃদু হাওয়া বইতে শুরু ক'রেছে। বিতংস ধীরে বললেন—

কী সুন্দর সূর্যোদয়।'

সত্যি সুন্দর দৃশ্য। দূরে চষা ক্ষেত। নদীর ধারে ধারে গাছের সারি। মুগ্ধ হ'য়ে আমি সুন্দর ভোরটা দেখছিলাম।

হঠাৎ বিতংসকে দেখি কপালে আঙ্গুল ঠুকতে ঠুকতে চোখ বুঁজে আপনমনে বিড় বিড় ক'রে বলছে—'আমি একটা মহামূর্খ। এত স্পষ্ট অথচ আমি—।' চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস বিশ্বাস আপনি নীচে যান।'

খাবার ঘরে তখন সকলেই উপস্থিত। শুধু আলী সাহেব নেই। তখন জবানবন্দীর পালা চলছে। রথীন মিত্র আমাকে ঢুকতে দেখে বললেন—'আসুন, আপনার জবানবন্দীটা এখনো নেওয়া হয় নি।' আমি চেয়ার টেনে বসলাম। রথীন মিত্র একটু কেশে নিয়ে বললেন—

—তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে ল্যাবরেটরী থেকে এ্যাসিডটা—'প্রীতম সিং দ্রুত ব'লে উঠল, 'কী ক'রে যে এ্যাসিডটা, মানে দেখুন—ওটা—'

রথীন ইসারায় প্রীতম সিংকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, 'যেমন ক'রেই হোক মিস ইন্দ্রানী সরকার ল্যাবরেটরী থেকে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড সংগ্রহ করেছেন এবং গত রাত্রে তা পান ক'রে আত্মহত্য করেছেন। 'এখন—' আমি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলাম—'অসম্ভব।'

অসম্ভব কেন ?' রথীন মিত্র আমার দিকে তাকালেন।

সাধ ক'রে কেউ এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু মেনে নেয় না।

যদি বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা তার চেয়েও বেশী হয় ?

তবুও না।

এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত।

তাছাড়া—তাছাড়া' 'আমি বেশ উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছি বুঝলাম—ইন্দ্রানী বোধ হয় কিছু জেনে ছিল।

কী জেনেছিল ?

আমি তখন ছাতে ইন্দ্রানী যা বলেছিল আর মৃত্যুর আগে যা বলেছিল সব বললাম।

সকলের অগোচরে বাইরে থেকে আসা—'ডঃ বোস বিড়বিড় করে বললেন'

জানালা ?' ভ্রূকুঁচকে রথীন মিত্র বললেন, 'মিস সরকারের ঘরে কটা জানালা ?

একটা।

ওটা তো খোলা ছিল।

হ্যাঁ বরাবর খোলা ছিল।

ব'লে যান।

রাত্রে ঘুম ভাঙলে ইন্দ্রানীর জল খাওয়ার অভ্যাস ছিল।

কী ক'রে জানলেন ?

খাওয়া দাওয়ার পর প্রত্যেকদিনই এক গ্লাস জল নিয়ে যেতে দেখেছি।

হুঁ তারপর ? রথীন জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ হয়তো জলের গ্লাসটা বদলে এ্যাসিড ভর্ত্তি গ্লাসটা রেখে দিয়েছিল।

জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সেটা সম্ভব কি ?

হ্যাঁ সম্ভব।

রথীন মিত্র ডাঃ বোসের দিকে তাকালেন। ডঃ বোস একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, 'দেখুন মিঃ মিত্র, যদি ইন্দ্রানী সরকার কথা বলতে পারতেন তাহলে তিনি বোধহয় এই কথাটা বলতেন, 'আমি আত্মহত্যা করিনি। নিজে ইচ্ছে ক'রে এ্যাসিড খাই নি। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা সরিয়ে সেখানে কেউ এ্যাসিডের গ্লাসটা রেখে গেছে।'

হুঁ। একটু থেমে রথীন বললেন, 'দু'দিক থেকে ঘটনাটা দেখা যায়। ইন্দ্রানী সরকারের আত্মহত্যার স্বপক্ষেও একটা গুরুতর কারণ আমি পেয়েছি।'

রথীন নীচু হ'য়ে চেয়ারের নীচে থেকে একটা কাগজে জড়ানো ভারী জিনিস ঝাঁকুনি দিয়ে তুললেন। সবাই অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। রথীন কাগজটা খুলে ফেললেন। দেখা গেল বেদীসমেত একটা বড় শিবলিঙ্গ। ডাঃ সেন বললেন, 'এরকম শিবলিঙ্গ মাটি খুঁড়ে প্রায় খান পাঁচেক পাওয়া গেছে। এতো সাধারণ জিনিস।'

এর অসাধারণত্ব এইখানে।' ব'লে রথীন মিত্র আঙ্গুল দিয়ে শিবলিঙ্গের মাথার দিকটা দেখালেন। সেখানে একটা কালো দাগ আর তার গায়ে কয়েকটা চুলের মত কী লেপ্টে আছে। রথীন বললেন—

এটা ইন্দ্রাণী সরকারের খাটের নীচে পাওয়া গেছে। ইভা সেনকে হয়তো

এটা দিয়েই হত্যা করা হ'য়েছে। ইভা সেনের মৃত্যুর পর আমরা সব ঘরই তল্লাসী করেছিলাম। এটা যে কী করে ইন্দ্রানী সরকার কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন জানিনা।' রথীন ডাঃ বোসের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আচ্ছা ডাঃ বোস, দেখুন তো এটা কীসের দাগ?' ডাঃ বোস ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করলেন। বললেন—হুঁ রক্ত, মানুষের মাথার চুল চামড়া লেপ্টে আছে। আপাত-দৃষ্টিতে এটাই মনে হচ্ছে। তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে আরো পরীক্ষা প্রয়োজন।' ডাঃ বোস চেয়ারে গা এলিয়ে দিতে দিতে বললেন—তাহ'লে ইন্দ্রানীই ইভা সেনকে হত্যা করেছে, তারপর অনুশোচনায় দগ্ধ হ'য়ে—বেচারী!''

উঃ ভগবান!' ডঃ সেন অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠলেন। দেখি ডঃ সেন মুখে হাত চাপা দিয়ে আছেন। তাঁর সারা শরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে।

এই সময় বিতংস চৌধুরী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলেন। রথীন মিত্রের হাতে ধরা শিবলিঙ্গটা দেখে বিতংসর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। উনি হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'নিরবধি কাল— বিপুলা চ পৃথ্বী।'

সকলেই বিতংসর দিকে তাকাল। বিতংস রেডিও ঘোষকের মতে ব'লে উঠলে 'বন্ধুগণ, আলী সাহেব নিরুদ্দেশ। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' রথীন মিত্র ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'এটা বাসি খবর বিতংসবাবু। আমার লোকেরা তাকে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছে।' বিতংস বললেন—

আলী সাহেব এবং তার ট্যারা সঙ্গী যে আসলে ট্যারা নয় দুজনে এতক্ষণে উড়িষ্যা বিহারের বর্ডারের কাছাকাছি। লক্ষ্য নেপাল, কাঠমণ্ডু।

—সে কি রথীন মিত্র চমকে উঠলেন—তাহলে এক্ষুনি বর্ডার আউট পোস্টে খবর পাঠাতে হয়।

—সোজা পথে যাবার পাত্র তারা নয়। যে পথে চোরাচালানীর করবার চলে তারা সেই পথ ধরছে। ইন্সপেকটার মিত্র আশা এই সবগুলোই টাটকা খবর।

কিন্তু—রথীন চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলেন।

বসুন ইন্সপেক্টার মিত্র, আমি যথাস্থানে উপযুক্ত জায়গাগুলোতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।

তাহলে আপনি অনেককিছুই জানেন। রথীন বললেন।

জানতাম না—আজকে জেনেছি। সত্যকে জেনেছি ছাতে দাঁড়িয়ে সর্যোদয়

দেখতে দেখতে। এক অপূর্ব সূর্যোদয়।

রথীন মিত্রের পাশের চেয়ারটা বসে বিতংস পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করলেন। সশব্দে এক টিপ নস্যি নিলেন। আমরা সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছি। বিতংস বলতে শুরু করলেন, মানুষের জীবনকে একজন আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাস বলেছেন

……দুই শব্দহীন শেষ সাগরের

মাঝখানে কয়েক মুহূর্ত এই সূর্যের আলো।

মানুষের জীবন তো তাই, কয়েক মুহূর্ত তারপরই মৃত্যু শব্দহীন অন্ধকার সমুদ্র। আমরা সকলেই ধীরে ধীরে চলেছি সূর্যহীন শব্দহীন সেই অন্ধকার সমুদ্রের দিকে। আমরা চলেছি সেইদিকে। কিন্তু আমরা সেখানে পেঁছিবার আগেই আমাদেরই মধ্যে থেকে দুজন মিসেস ইভা সেন আর ইন্দ্রানী সরকার সেখানে পেঁছে গেল। তবু আমাদের যাত্রা চলেছে সেই সূর্যহীন শব্দহীন অন্ধকার সমুদ্রের দিকে। বিতংস থামলেন। একবার সকলের দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, পলাশগড়ে দুটি মৃত্যু রহস্যের সমাধানের জন্যে আমি প্রথমেই স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছেছিলাম যে এই রহস্যের চাবিকাঠি বাইরে নেই—আছে ব্যক্তিত্বের সংঘাত আর মানুষের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে। একটু থেমে বললেন, আমি এখন সমাধানে এসে পেঁছেছি যদিও প্রমানের জন্য বাস্তব কোন উপাদান আমার হাতে নেই, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, এ ছাড়া অন্য কোন সমাধান অসম্ভব। থেমে বলতে লাগলেন, প্রথমেই শুরু করি সমস্ত ঘটনার কেন্দ্র চরিত্র মিসেস ইভা সেনকে নিয়ে। ইভা সেনের চরিত্র বর্ণনার জন্যে উর্বরশীর কয়েকটি পংক্তি যথোপযুক্ত—'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ—সুন্দরী রূপসী উর্বশী'। এক অদ্ভুত ব্যক্তি সত্ত্বার অধিকারিনী ছিলেন মিসেস ইভা সেন। এসকাভেশন পার্টির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং সদস্যদের মনে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে আমি ইভা সেন সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমি—

১। তিনি সুন্দরী ছিলেন (প্রায় সকলেই একবাক্যে তাঁকে 'সুন্দরী ও আকর্ষনীয়া' বলেছেন।

২। তাঁর রুচি বোধ ছিল (তাঁর ঘরের রুচিসম্পন্ন সাজসজ্জা দ্রষ্টব্য)

৩। তিনি শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন (তাঁর সেলফে রাখা পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য)

৪। তাঁর অহংকার প্রবল ছিল।

৫। তিনি ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন।

৬। তিনি মক্ষীরানী বৃত্তি পছন্দ করতেন।

৭। তাঁর নেশা ছিল পুরুষ হৃদয় শিকার করা এবং সেই শিকার ধরে খেলা করা তার বেশী কিছু নয়।

৮। তিনি জীবনে নাটকীয়তা পছন্দ করতেন।

উপরোক্ত গুনাবলীর অধিকারিনীরা সব খেলার শেষে হয় অপরের নয় তো নিজের মহানিপাত ঘটিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ইভা সেন নিজের মহানিপাত ঘটিয়েছিলেন।

এবার আমাদের বছর পনেরো কুড়ি পিছিয়ে যেতে হবে। তবু ইভা সেন বিবাহ করেছিলেন। বুঝতে হবে তাঁর প্রথম স্বামী শিবতোষ যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

তারপর ইভা সেন শিবতোষের গুপ্তচরবৃত্তির কথা জানতে পারলেন এবং তৎকালীন বৃটিশ সরকারকে জানালেন। ইভা সেন নার্স সন্ধ্যা বিশ্বাসকে এর স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজ সরকার এই যুদ্ধে জিতলে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে যাবে। ইভা সেন একটা মহৎ কারণ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। আসলে ইভা সেন শিবতোষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি মুক্তি চাইছিলেন। শিবতোষের মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী।

এইজন্য কিন্তু তাঁর মনে একটা অপরাধ বোধ বরাবরই ছিল।

এবার সোজা উড়ো চিঠির প্রসঙ্গে আসি। ইভা সেন আকর্ষনীয়া মহিলা ছিলেন, কাজেই তাঁর পানিপ্রার্থী যুবকের অভাব ঘটে নি। কিন্তু কোন যুবকের সঙ্গে হৃদ্যতা হলেই শাসানি দিয়ে উড়ো চিঠি আসতে লাগল।

এখন প্রশ্ন কে লিখতো ঐ চিঠিগুলো? শিবতোষ? •শিবতোষের ভাই বরুণ? না ইভা নিজেই নিজেকে লিখতেন?

আমার বিশ্বাস শিবতোষ মনেপ্রাণে ইভা সেনকে ভালোবাসতেন। অন্য কেউ ইভা সেনকে বিবাহ করুন এটা তার পক্ষে ছিল অসহ্য। ইভা একমাত্র তাঁরই থাকবে অন্য কারো নয় শিবতোষের এই মনোভাব ছিল।

অন্যদিকে ইভা সেন কিছুতেই আবার বিবাহবন্ধনে জড়াতে চাইছিলেন না। আগেই বলেছি তিনি পুরুষদের শিকার করে খেলতে ভালোবাসতেন।

তার বেশী কিছু নয়। জীবনে নাটক ভালবাসতেন তিনি। কাজেই উড়ো চিঠির জন্যে তিনি বিয়ে করতে পারছেন না এই ব্যাপারটা বেশ নাটুকে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তিনি বিষাদময়ী নায়িকা হয়ে গেলেন যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে এই ব্যাপার চলল। যখনই কাউকে বিয়ে করবেন ভেবেছেন তখনই উড়ো চিঠির শাসানি আসতে লাগল।

এবার একটা খুব আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার ঘটল। ডঃ সুমন্ত্র সেন ইভা সেনের জীবনে এলেন। কোন শাসানির চিঠি এলো না। বিয়ের ব্যাপারে আর বাধা রইল না। ইভার বিয়ে হ'ল ডঃ সুমন্ত্র সেনের সঙ্গে। বিয়ের পর একটা চিঠি এলো। যদি চিঠিগুলো ইভা নিজেই নিজের কাছে লিখতো তাহলে দেখা যাচ্ছে সুমন্ত্র সেনের সঙ্গে বিয়েতে তার মত ছিল। আর যদি শিবতোষ বা বরুণ চিঠি লিখতো ব'লে ধ'রেনি তাহ'লে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ইভার এই বিয়ের আগে তারা চিঠি লিখল না কেন?

এর পেছনে একটা দুর্বল যুক্তি দেওয়া যায় যে তারা সে সময় কলকাতা ছিল না। অন্যত্র কোথাও গিয়েছিল সেটা এদেশেই কোথাও হোক বা বাইরে কোথাও হোক।

এবার আমি সোজা ইভা সেনের হত্যা প্রসঙ্গে আসছি। মাত্র তিনজন বাদে আর সকলের পক্ষেই এই হত্যা করা সহজ ছিল। তিনজন বাদের মধ্যে রয়েছেন ডঃ সেন উনি খুনের প্রায় সোয়া একঘণ্টা পরে ছাত থেকে নেমে আসেন তার আগে তিনি ছাত থেকে নামেন নি। দুই—সন্দীপ চ্যাটার্জী উনি খনন কার্যের জায়গায় ছিলেন। তিন—জয়ন্ত নন্দী উনি খুরদায় ছিলেন কিন্তু সত্যিই কি সন্দীপ চ্যাটার্জী সারাক্ষণ খনন জায়গায় ছিলেন? জয়ন্ত নন্দীও কি খুনের সেই সময়টায় খুরদাতেই ছিলেন।

জয়ন্ত নন্দীর চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল। কিছু বলতে গেল। না ব'লে অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকাতে লাগল।

সন্দীপ চ্যাটার্জী অনড় ব'সে রইলেন। কোনরকম চঞ্চলতা প্রকাশ করলেন না। বিতংশ বলতে লাগলেন, খুনের দিন এবং খুনের সময় ডাঃ বোসের মেয়ে রুবি বোস গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছিলেন। কিন্তু ক্যাম্প পর্যন্ত আসেন নি। তিনি বলেছেন তখন তিনি জয়ন্ত নন্দীকে দেখেছেন গাড়ি থামিয়ে জয়ন্ত নন্দী মাটিতে কী খুঁজছেন। জয়ন্ত ব'লে উঠল—শুনুন সত্যি আমি মাটিতে খুঁজছিলাম।

—কী খ‍ুজছিলেন ?

আমার সিগারেট লাইটারটা। কী ক'রে ওটা প্যান্টের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা খ‍ুজেও পাই নি। তারপর গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পে চলে আসি। সবাই ভেবেছিল আমি তখনই ফিরলাম।

তাহ'লে কাউকে ধোঁকা দেন নি? বিতংস জিজ্ঞেস করলেন।

ধোঁকা দেবার কী আছে। তা ছাড়া কেউ আমাকে উঠোন পেরিয়ে হে'টে যেতে দেখে নি। বল‍ুক কে দেখেছে আমাকে?

সেটাই হল গণ্ডগোলে ব্যাপার। দারোয়ান, নাথাল‍ুকে কী জিজ্ঞেস করা হ'য়েছিল ওরা কোন অপরিচিত লোককে ঢ‍ুকতে দেখেছে কিনা? তাদের তো এ কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি এক্সকাভেশন পার্টি'র কাউকে ওরা ঢ‍ুকতে দেখেছে কি না।

ঠিক আছে ওদেরই জিজ্ঞাসা কর‍ুন—সন্দীপবাব‍ু বা আমাকে ওরা ঢ‍ুকতে দেখেছে কি না।

সেখানেই তো ম‍ুস্কিল। আপনাদের এখানে ঢোকা বের‍ুনো তো স্বাভাবিক ব্যাপার। ওরা এটা মনেও রাখবে না এটাই তো স্বাভাবিক।

অর্থহীন প্রলাপ। জয়ন্ত মন্তব্য করল।

বিতংস শান্তস্বরে ব'লে যেতে লাগলেন, আপনাদের দ‍ু'জনের মধ্যে সন্দীপবাব‍ুর আসা যাওয়াটা ওরা কম লক্ষ্য করতো। জয়ন্তবাব‍ু সেদিন সকালেই গাড়ি নিয়ে খ‍ুরদা গেছেন। কাজেই পায়ে হে'টে উনি এলে সকলেরই নজর পড়তো।

নিশ্চয়ই। জয়ন্ত বলল। সন্দীপবাব‍ু মাথা তুলে সরাসরি বিতংসর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ চৌধ‍ুরী, আপনি কি আমাকে অপরাধী সব্যস্ত করছেন? গম্ভীর স্বরে কথাটা বললেন তিনি।

বিতংস মাথাটা একটু নীচু ক'রে তুলে বললেন—আমরা অন্ধকার শব্দহীন ম‍ৃত্যুর সম‍ুদ্রের দিকে চলেছি। একট‍ু থেমে বললেন, তাহ'লে একটা সত্যে আমি আপনাদের পে'ৗছোতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে এই এক্সকাভেশন পার্টি'র যে কেউ এমন কি নার্স মিস বিশ্বাস পর্যন্ত ইভা সেনকে খ‍ুন করতে পারতেন।

ওঃ মিঃ চৌধ‍ুরী। আমি প্রায় চে'চিয়ে বললাম—আমি এখানে অপরিচিত আগন্তুক। সবে এসেছি মাত্র।

মিস বিশ্বাস ভুলে যাবেন না, ইভা সেন কীসের ভয় করতেন? কোন

আগন্তুকের ভয়ই তো করতেন।

কিন্তু, কিন্তু, ডাঃ বোস সবই জানেন।

কী জানেন? আপনি যা বলেছেন তাই জানেন। আপনার পক্ষে ছদ্ম-পরিচয়ে এখানে আসা কি খুব অসম্ভব?

আপনি ডাঃ খাসনবীশের কাছে আমার হাসপাতালে খোঁজ নিতে পারেন। বিত্তংস দুহাত তুলে বললেন,আমি এখন বলছি না যে আপনিই খুনী।

—ধন্যবাদ।

এবার আমি প্রথমে চন্দ্রা সিং সম্পর্কে বলবো। উনি দৈহিক শক্তিতে দুর্বল। অতবড় একটা শিবলিঙ্গ তুলে আঘাত করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এক যদি ইভা সেন কোন কারণে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতেন তাহলে চন্দ্রা সিং আঘাত করতে পারতেন। কিন্তু কেন তিনি খুন করবেন? মিস বিশ্বাস চন্দ্রা সিংকে ইভা সেনের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখেছেন। চন্দ্রা সিং ঈর্ষাকাতর মহিলা। উনি স্বামীকে ভালোবাসেন এবং স্বামীর বিপদে মরণপণ লড়তে প্রস্তুত। তাঁর যে অস্বস্তি. চিন্তা সেটা তাঁর নিজের জন্যে নয় স্বামীর জন্যে।

বিচার ক'রে তদন্ত ক'রে দেখেছি, মিঃ প্রীতম সিং শুধু মদ্যপ নন, তিনি নেশার বড়িতেও অভ্যস্ত। দীর্ঘদিন ধ'রে নেশার বড়ি খেলে মানুষের নীতি বোধ শিথিল হ'য়ে যায়। এরকম নেশাগ্রস্ত লোকেরা বিনা দ্বিধায় নরহত্যা করতে পারে।

ভেবে দেখলাম প্রীতম সিংএর জীবনে কোন অতীত ঘটনা আছে যার জন্যে চন্দ্রা সিং সব সময় শঙ্কাকাতর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই ঘটনাটা অপরাধ-মূলক। কোনক্রমে ঘটনাটা প্রকাশ পেলে মিঃ সিংএর কেরিয়ারের সর্বনাশ ঘটে যাবে। চন্দ্রা সিং এইজন্যে স্বামীকে সর্বপ্রকারে পাহারা দিয়ে রাখতেন। কিন্তু ইভা সেন? ইভা সেনের ছিল ধারালো বুদ্ধি আর ক্ষমতার আকাঙ্খা। তিনি কথায় কথায় মিঃ সিংএর 'কাছ থেকে সেই গোপন অপরাধের ঘটনাটা জেনে নেন। ইভা সেন খুশী হলেন এই ভেবে যে এমন গোপন কথা তিনি জানেন যা প্রকাশ করে দিলে প্রীতম সিংয়ের সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। এই ভাবনাটাই ইভা সেনের কাছে ছিল আনন্দদায়ক।

সুতরাং প্রীতম সিং-এর পক্ষে ইভা সেনকে হত্যা করা অসম্ভব কিছু নয়। প্রীতম সিং এবং চন্দ্রা সিংয়ের পক্ষে এই খুন করা অসম্ভব নয় কারণ সেই দশ

মিনিট যখন উঠোন ফাঁকা ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে এটা করা সম্ভব।

মিথ্যা কথা। চন্দ্রা সিং চেঁচিয়ে ব'লে উঠল।

বিতংস সে কথা কানে তুললেন না। বলতে লাগলেন, এবার মিস ইন্দ্রানী সরকার। তার পক্ষে কি এই খুন করা সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। তার ছিল প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তি আর আত্মসংযম। এমন মানুষ দেখা যায় সহ্য করতে করতে এমন অবস্থায় এসে পেঁৗছোন যখন প্রচণ্ডশক্তিকে জ্বলে ওঠেন। যদি ইন্দ্রানী হত্যা ক'রে থাকেন তাহ'লে করেছেন ডঃ সুমন্ত্র সেনের জন্যেই। ইভা সেন ডঃ সেনের বিপুল সম্ভাবনাময় জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছেন এইজন্যে তার মনে একটা গোপন ক্রোধ থাকা স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি ঈর্ষা তো রয়েইছে। সুতরাং ইন্দ্রানী সরকার একেবারে সন্দেহমুক্ত বলা যায় না।

তারপর তিনজন যুবক।

এক মিঃ রঙ্গনাথন। যদি শিবতোষের ভাই বরুন এই এস্কাভেশন পার্টির সঙ্গে ছদ্মবেশে আসতে পারেন তাহলে সে রঙ্গনাথন সেজে আসতে পারে। কিন্তু রঙ্গনাথন যদি সত্যিকারের রঙ্গনাথন হয় তাহলে কি তার পক্ষে ইভা সেনকে খুন করা সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। বেচারা! ইভা সেন তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে নিষ্ঠুর রসিকতা করতেন। রঙ্গনাথনের জীবনটা তিনি নরক ক'রে তুলেছিলেন। সুতরাং এই অসহ্য অবস্থার জন্যে যে দায়ী তাকে হত্যা করা রঙ্গনাথনের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

দুই—জয়ন্ত নন্দী, ইনি বরুণ হ'তে পারেন। সকলের সঙ্গে বেশ হাসি-খুশী দিল দরিয়া মেজাজে ব্যবহার ক'রে ইনি সহজেই নিজের আসল পরিচয়টা লুকিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু উনি যদি সত্যিই জয়ন্ত নন্দী হন তাহলে বলবো খুনের মানসিকতা তাঁর নেই।

তিনি মিস বিশ্বাসকে বলেছিলেন, কারো সই, হাতের লেখা এসব নকল করার অভ্যেস তাঁর ছোটবেলা থেকে। যদি তাই হয় তাহ'লে ইভা সেনের কোন পুরোনো চিঠির হাতের লেখা নকল ক'রে উড়ো চিঠি পাঠানো জয়ন্ত নন্দীর পক্ষে সম্ভব। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

অসহ্য, জয়ন্ত ব'লে উঠল, কী বকছেন আপনি?

বিতংস ব'লে চলল, তিন—শোভেন ঘোষ। ইনিই ঠিক ইভা সেনের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মতামতই আমার কাছে

সবচেয়ে মূল্যবান মনে হ'য়েছে। শোভেন ঘোষকে আমি সবটা বুঝতে পারি নি। বিশেষ ক'রে ইভা সেনের ব্যক্তিত্ব তাঁর মনে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল এটা আমি বুঝতে পারি নি।

ইভা সেন তাঁকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু এটাই খুন করার যথেষ্ট কারণ নয়। তবে একটা কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে চরিত্র ও সম্ভাব্যতার দিক থেকে এই এক্সকাভেশন পার্টির মধ্যে একমাত্র শোভেন ঘোষই বুদ্ধি আর চাতুর্যের সঙ্গে এই খুন করতে পারতেন।

শোভেন ঘোষ এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রে নিজের পায়ের বুটের দিকে তাকিয়েছিল। এবার মুখ তুলে বলল—

ধন্যবাদ। কথাটায় একটু ব্যঙ্গের ছোঁয়া রয়েছে বোঝা গেল। বিতংস ব'লে যেতে লাগলেন, অতঃপর দুজন, সন্দীপ চ্যাটার্জী আর আলী সাহেব।

মিস বিশ্বাস এবং অন্যেরা বলেছেন যে ইভা সেন আর সন্দীপ চ্যাটার্জী পরস্পরকে ঘৃণা করতেন। দু'জনের এই আপাত সম্পর্কের ওপর প্রথম আলোকপাত করেন মিস রুবি বোস। আমি কথায় কথায় সন্দীপবাবুকে উত্তেজিত ক'রে তুলি। উনি একেই মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিলেন। আমার প্রশ্ন তাঁকে আরো উত্তেজিত ক'রে তোলে। তিনি সরল সত্য কথাই বললেন যে তিনি ইভা সেনকে ঘৃণা করেন। কিন্তু কেন ঘৃণা করেন?

সন্দীপবাবু সুদর্শন পুরুষ। ইংরেজীতে যাকে বলে "সেক্স অ্যাপীল" সেটা তার চেহারায় ব্যক্তিত্বে পুরোপুরি রয়েছে। তাঁর চেহারার এই আবেদনকে কোন মেয়ের পক্ষেই উপেক্ষা করা অসম্ভব। বন্ধুপত্নী ইভা সেনও পারেন নি উপেক্ষা করতে। তিনি সন্দীপবাবুকে জালে জড়াতে চাইলেন। আগেই বলেছি ইভা সেন মক্ষীরা নীবৃত্তি পছন্দ করতে। এইবার একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। জীবনে এই প্রথম ইভা সেন সত্যিসত্যি গভীর প্রেমে পড়লেন। সন্দীপবাবু তাকে বাধা দিতে পারলেন না। শুরু হল তার মানসিক দ্বন্দ্ব। তিনি ইভা সেনকে ভালোবাসতেন সত্যি আবার ঘৃণা করতেন। একদিকে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা অন্যদিকে প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ এই দুয়ে মিলে তাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। সুতরাং সে সুন্দর মুখটা তার মনে এই মোহ সৃষ্টি করছিল সেই মুখটাকে এক নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ করে নিজেকে সেই মোহ থেকে মুক্ত করার দুর্বার ইচ্ছা তার পক্ষে স্বাভাবিক। ইভা সেনের খুনটা ছিল প্রবৃত্তিজাত। সেদিক থেকে বিচার করলে সন্দীপবাবু ছিলেন

খুনী হিসেবে সবদিক থেকে উপযুক্ত।

এবার—আলী সাহেব, তাঁর সম্পর্কে আমার প্রথম সন্দেহ জাগে যখন একটি লোকের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আমাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেন। মিস বিশ্বাসের দেওয়া বর্ণনা সঙ্গে আলী সাহেবের বর্ণনা মিলল না। যে লোকটাকে মিস বিশ্বাস ইভা সেনের জানালা দিয়ে উঁকি দিতে দেখেছিলেন সে লোকটা আসলে এ্যানিটকারুমের জানালাটা দেখে নিচ্ছিল। রাত্রে সেখানে চোর ঢুকল। কিন্তু কিছুই চুরী হল না। ডঃ সেন সেখানে গিয়ে আলী সাহেবকে দেখালেন। আলী সাহেবের বক্তব্য তিনি পায়ের শব্দ শুনেছেন এবং আলো দেখেছেন। এ দুটোরই সাক্ষী তিনি নিজে আর কেউ নয়।

এবার একটা প্রশ্ন—আপনার কেউ কি এর আগে আলী সাহেবকে দেখেছেন কেউ কোন কথা বলল না। তার মানে দেখেন নি। সুতরাং যে কারো পক্ষে আলী সাহেব সেজে আসা অসম্ভব কিছুই নয়। লিপিবিশারদ আপনাদের মধ্যে আর কেউ নেই। তাছাড়া এখানে আপনারা মাত্র কয়েকখানা শিলালিপি পেয়েছেন। কাজেই যে কোন বুদ্ধিমান লোক এখানে নিজেকে লিপিবিশারদ বলে চালাবার সব সুযোগই পাবে এবং বাস্তবে আলী সাহেব সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। আলী সাহেবের সঙ্গে বাংলা ইংরেজী উর্দু সব ভাষাতেই অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছি। তাই থেকে একটা সত্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও লিপিবিশারদের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তার কোনটাই এই ভদ্রলোকের নেই। আমার সন্দেহ হল। আমি প্রয়োজনীয় জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগালাম। তারপর সন্দেহ দৃঢ়তর হল একটা ছোট্ট ঘটনায়। এ্যানিটকারুমে রাখা নানা জিনিসগুলো আমরা দেখছিলাম। মিস বিশ্বাস নির্বোধের মত বলে উঠেছিলেন যে জিনিসগুলোতে তো মোম লাগানো নেই। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম 'মোম'? আলী সাহেবও বলে উঠলেন 'মোম'। তার 'মোম'? বলার অদ্ভুত ভঙ্গীটা শুনেই বুঝলাম কী হেতু তার হেথা আগমন।

একটু থেমে বিতংস ডঃ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন—ডঃ সেন। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার এ্যানিটকারুমে যে সোনার ত্রিশূলে হীরে বসানো তরবারি ছোরার খাপ ইত্যাদি রয়েছে সে সবগুলোই জাল। আসলগুলো নিয়ে আলী সাহেব আর তার সঙ্গী পালিয়েছে, আমি এইমাত্র আমার টেলিগ্রামের জবাব পেয়েছি। তাতে জেনেছি আলি সাহেব আসলে একজন আন্তর্জাতিক

কুখ্যাতি সম্পন্ন দাগী হীরে চোর। সোনা হীরে জহরৎ এসব চুরি ও চোরাকারবারী তার পেশা। আসল নাম রাজা। সে মোম দিয়ে এ্যাণ্টিকারুমের জিনিসগুলোর ছাপ তুলে নিয়েছিল, সঙ্গীকে দিয়ে ওগুলোর নকল তৈরী করিয়ে এনেছিল। আসলে সেই রাত্রে রাজা যখন নকল জিনিসগুলো রাখছিল তখনই ইভা সেন শব্দ পেয়েছিলেন। কাজেই ডঃ সেন এলে তাকে মোমবাতির আলো দেখবার গল্প বানিয়ে বলতে হল। জিনিসগুলোতে মোমের চিহ্ন ইভা সেন দেখেছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী। সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন দুয়ে দুয়ে চার অর্থাৎ আলী সাহেবের মতলব তিনি ধরে ফেলেছিলেন। বাইরে এমন ভাব দেখালেন যে তিনি আলী সাহেবকে সন্দেহ করেন কিন্তু সঠিক জানেন না যে আসলে আলী সাহেব কী?

এটা একটা মারাত্মক খেলা। কিন্তু ইভা সেন এই মারাত্মক খেলাটা উপভোগ করেছিলেন। খেলাটা রাজা বেশীদূর গড়াবার আগেই ইভা সেনকে খতম ক'রে দিল।' তাহলে রাজাই কি চোর ও খুনী।

একটু থেমে বিতংস কয়েকবার পায়চারী ক'রে নিলেন। তারপর কৌটো বের ক'রে একটিপ নস্যি নিয়ে শুরু করলেন—'আজ সকাল অবদিও আমি এই পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলাম। সবসুদ্ধ আটটি সম্ভাবনার কথা আমি ভেবেছিলাম তখন। তখনও জানতাম না আসল খুনী কে?

খুন করা একটা অভ্যেস। তাই ইন্দ্রানী সরকার খুন হলেন। আমি জানতাম যে আঁচ করতে পারবে খুনী কে সেই খুন হবে। আমি উদ্বেগ বোধ করেছিলাম নার্স মিস বিশ্বাসের নিরাপত্তা নিয়ে। কিন্তু খুন হলেন ইন্দ্রানী সরকার। শুধু যুক্তি দিয়ে আমি সত্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলাম। ইন্দ্রানীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমি দ্রুত সত্যে এসে পৌঁছলাম।

একজনের ওপর আর সন্দেহের অবকাশ রইল না—তিনি ইন্দ্রানী সরকার। তিনি আত্মহত্যা করেছেন এটা আমি কখনো বিশ্বাস করি নি। দ্বিতীয় খুনের পেছনে তিনটি ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ—

প্রথম ঘটনা—এক রাত্রে মিস বিশ্বাস দেখেছেন যে ইন্দ্রাণী কাঁদছেন। তাঁর কোল থেকে একটা চিঠি পড়ে গিয়েছিল। মিস বিশ্বাস লক্ষ্য করেছেন যে সেই চিঠির হাতের লেখা হুবাহু উড়ো চিঠির হাতের লেখার মত।

দ্বিতীয় ঘটনা—মৃত্যুর আগের দিন বিকেল বেলা মিস বিশ্বাস ছাতে ইন্দ্রাণীকে বিমূঢ় এবং ভীত মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। মিস

বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রাণী শুধু বলেছিলেন—'আমি দেখলাম কী ক'রে একজন লোক সকলের অলক্ষ্যে ভেতরে আসতে পারে।' তখন আলী সাহেব উঠোন পেরোচ্ছিলেন এবং রঙ্গনাথন ফটোগ্রাফিক ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তৃতীয় ঘটনা—মৃত্যুকালে ইন্দ্রানীর শেষ কথা জানালা—জানালাটা।

এবার প্রশ্ন—ইন্দ্রানী সরকার কি আলী সাহেবকে খুনী বলে সন্দেহ করেছিলেন ? আলী সাহেবের ছদ্মবেশ কি তিনি ধরতে পেরেছিলেন ?

আলী সাহেব বা রাজাই ঘাতক আমি এটাই চিন্তা করলাম। রাজা ইভা সেনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ইন্দ্রানী এটা যে কারনেই হোক সন্দেহ করেছিল সুতরাং তাকেও চিরদিনের মত চুপ করিয়ে দিতে হবে—এবং তাই করল রাজা।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়—ইন্দ্রানী 'জানালা জানালাটা' কথাটার দ্বারা কী বুঝিয়েছিলেন ? কেন তিনি একটা চিঠি নিয়ে কাঁদছিলেন ? ছাতে কী দেখেছিলেন ? এসবের মনস্তাত্ত্বিক সমাধান আমি পাচ্ছিলাম না।

ছাতে দাঁড়িয়ে তিনটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম—চিঠি—ছাত—জানালা। আমি দেখলাম যা ইন্দ্রানী দেখছিলেন। আমি সবকিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখা পেলাম।

বিতংস সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন।

আমরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছি। বিতংসর কথাগুলি আমাদের কানে বাজতে লাগল—চিঠি—ছাত—জানালা।

বিতংস শান্তস্বরে বলতে লাগল—এতক্ষণ যাঁর কথা বিশেষ করে উল্লেখ করিনি সেই ডঃ সুমন্ত্র সেনের কথা বলি তিনি স্ত্রীর খুনের সময় ছাতে ছিলেন. ইভা সেনের মৃত্যুর প্রায় দুঘণ্টা পরে তিনি ছাত থেকে নেমেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে তিনি সন্দেহমুক্ত। কিন্তু—একটু থেমে বলতে লাগলেন, আমি বলি-না। তিনি সন্দেহমুক্ত নন। তিনি খুন করতে পারতেন হ্যাঁ—ছাতের ওপরে থেকেও তিনি খুন করতে পারতেন শুধু পারতেন না, ডঃ সুমন্ত্র সেনই তাঁর স্ত্রী মিসেস ইভা সেনকে খুন করেছেন। এই আমার শেষ এবং স্থির সিদ্ধান্ত।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় আমরা এ রকমভাবে চমকে উঠতাম না। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। কেউ একটি কথাও বললেন না। ডঃ সুমন্ত্র সেনও নয়। নৈঃশব্দ ভঙ্গ করল শোভেন ঘোষের কণ্ঠস্বর আমি মিথ্যে বলি না। আমি

বলছি ডঃ সেন এক সেকেণ্ডের জন্যও ছাত থেকে নামেন নি। বিতংস হেসে বললেন—আমিও তো বলিনি তিনি ছাত থেকে নেমেছিলেন।

—তাহলে ?

ইন্দ্রানী সরকার এবং আমি ছাত থেকে দেখেছিলাম ডঃ সেন ছাত থেকে না নেমেও ইভা সেনকে হত্যা করতে পারতেন এবং তিনি তাই করেছেন।

আমরা সকলেই বিতংসর দিকে তাকিয়ে আছি।

"জানালা" গলা চাড়িয়ে বিতংস বললেন কোন ঘরের জানালা। যেমন ইন্দ্রানী বুঝেছিলেন আমিও তাই বুঝলাম। ইভা সেনের ঘরের জানালা। কোন জানালাটা ? যেটা বাইরের গ্রাম প্রান্তরের দিকে। বাইরের দিকের সেই জানালার ওপরেই ছাত। ছাতে ছিলেন ডঃ সুমন্ত্র সেন। একা ধারে কাছে কেউ নেই যে তাঁর কাজের সাক্ষী থাকবে। তারপর ছাতে রাখা বেদীসুদ্ধ পাথরের শিবলিঙ্গগুলো। কী সুন্দর কত সহজ ব্যাপার!? অবিশ্বাস্য রকম সহজ ব্যাপার।

এইবার শুনুন—কী ঘটেছিল ?—

ডঃ সেন ছাতে শিবলিঙ্গগুলো আর খুঁড়ে পাওয়া মাটির পাত্রগুলো সাজাই বাছাই করছিলেন। তিনি শোভেন ঘোষকে ডাকলেন এবং মিনিট দশেক তাঁকে নির্দেশ দেবার অছিলায় আটকে রাখলেন। তিনি যা ভেবেছিলেন তাই ঘটল। নাথালু ফাঁকা তালে ছুটল গেটএর বাইরে। সেখানে রাঁধুনী দারোয়ানদের সঙ্গে আড্ডা জমাল। শোভেন ঘোষ ছাত থেকে নেমে নাথালুকে ডাকতে গেলেন এবং বকাঝকা করে ফিরিয়ে আনলেন। সেই দশ মিনিট সময়টুকু উঠোনটা ছিল জনহীন। শোভেন ঘোষ ছাত থেকে নামার সঙ্গে ডঃ সেন তার পূর্বপরিকল্পনামত কাজ শুরু করলেন। পকেট থেকে রঙ্‌করা প্ল্যাস্টিসিনের মুখোশটা বের করলেন। এই মুখশটা দিয়ে এর আগে তিনি ইভা সেন কে ভয় দেখিয়েছিলেন। মুখোশটা সুতো বেঁধে ছাতের কার্নিশ থেকে ঝুলিয়ে দিলেন ইভা সেনের ঘরের জানালা বরাবর মনে রাখবেন উঠোনের দিকে নয় উল্টো দিকে গ্রাম চষাক্ষেতের দিক থেকে। মুখোশটা ঠুকে ঠুকে ইভা সেনের জানালায় শব্দ করলেন। ইভা সেন তখন অর্দ্ধনিদ্রিত জানালার ওপাশে মুখোশ দেখে উনি ভয় পেলেন না কারন তখন প্রকাশ্য দিবালোক। তিনি মুখোশটা দেখেই বুঝলেন কী জঘন্যধরনের ধোঁকাবাজি যে কোন মেয়ে এই অবস্থায় যা করতেন তিনিও তাই করলেন। তদুপরি একটা সত্যি কথা

স্ত্রী লোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না, তারা সবটুকু জানতে চায়। সুতরাং ইভা সেন জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে ছাতের দিকে তাকালেন, কে এরকম ইতরামো করছে? ডঃ সেন বেদীসুদ্ধ একটা ভারী শিবালিঙ্গ হাতে তুলে অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক মুহূর্তে ইভা সেনের মাথা লক্ষ্য করে শিবালিঙ্গ ছেড়ে দিলেন। প্রচণ্ড বেগে শিবলিঙ্গটা ইভা সেনের মাথায় কপালে আঘাত করল। একটা অস্ফুষ্ট আর্ত চীৎকার করে (এই মৃদু আর্ত চীৎকার ইন্দ্রানী অফিস-ঘর থেকে শুনেছিলেন) ইভা সেন জানালার ধারে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়লেন এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। এখন সেই শিবলিঙ্গটার বেদীর সঙ্গে ডঃ সেন আগেই একটা দড়ি বেঁধে রেখেছিলেন। এরপরের কাজটি খুবই সহজ। দড়ি দিয়ে শিবলিঙ্গটাকে টেনে তুললেন তারপর ওটার রক্তমাখা দিকটা উল্টো মুখো করে অন্যসব শিবলিঙ্গের সঙ্গে ছাতেই বেখে দিলেন। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ছাতে থেকে নীচে নেমে এলেন। শোভেন ও মিস বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ইভা সেনের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

এইবার পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়। ঘরে ঢুকেই তিনি দুহাতে দস্তানা পরে নিলেন খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। ইভা সেনের মৃতদেহটা টেনে এনে খাট আর দরজার মাঝামাঝি জায়গায় রাখলেন। তারপর দস্তানা খুলে ফেললেন। তখনই নজরে পড়ল হাতে ওপরের দিকে রক্ত লেগে রয়েছে। তাড়াতাড়ি বেসিনের জলে ধুয়ে ফেললেন। এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে। বেসিন থেকে শেষ রক্তচিহ্নটুকু মুছে ফেলতে পেরেছেন কি না সেটা পরীক্ষা করবার অবকাশ নেই। রক্তের দাগ রয়ে গেল।

একটু থেমে বিতংস ডঃ বোসের দিকে তাকালেন, ডঃ বোস আমরা সেই রক্তের দাগটাই দেখেছিলাম।

ডঃ সেন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তারপর শোককাতর স্বামীর অভিনয় করলেন। সেটা তাঁর পক্ষে কঠিন হল না। কারণ উনি সত্যিই স্ত্রীকে ভালোবাসতেন।

ডঃ বোস চেঁচিয়ে উঠলেন, যদি ডঃ সেন তাঁর স্ত্রীকে সত্যি ভালোবাসতেন তবে তাঁকে হত্যা করতে যাবেন কেন? কী উদ্দেশ্য এই হত্যা? ডঃ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডঃ সেন আপনি প্রতিবাদ করুন। বলুন বিতংসবাবু পাগলের প্রলাপ বকছেন।

ডঃ সুমন্ত্র সেন কথা বললেন না এমন কি চেয়ার ছেড়ে নড়লেন না পর্যন্ত।

বিতংস বলতে লাগলেন, মানুষের হৃদয় এক বিচিত্র জগৎ, যখনই এইসত্য আমার কাছে স্পষ্ট হল ডঃ সেনই তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন তখনই সবকিছুর ব্যাখা পাওয়া সব সহজ হয়ে গেল। আবার পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করুন। ইভা সেনের প্রথম বিবাহ, উড়ো চিঠির শাসানি তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। কিন্তু কোন শাসানির চিঠি এল না অর্থাৎ ডঃ সেনের সঙ্গে বিবাহে তাঁর প্রথম স্বামীর কোন আপত্তি নেই। কী সহজ। যদি দুই আর দুইয়ে যোগ করলে চার হয় তাহলে ডঃ সেন ও শিবতোষ একই ব্যক্তি হতে বাধা কোথায়?

পূর্ব ইতিহাসে ফিরে চলুন। যুবক শিবতোষ ইভাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। ইভা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। শিবতোষের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হল। শিবতোষ পালালেন। ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হলেন। সেই দুর্ঘটনা ডঃ সুমন্দ্র সেন নামে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক মারা গেলেন। বিকৃত মৃতদেহ তার শিবতোষ চক্রবর্তী হিসেবে তাঁকে দাহ করা হল। নবজন্ম ঘটল তাঁর।

শিবতোষের নতুন পরিচয় হল ডঃ সুমন্দ্র সেন। এবার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর প্রতি তাঁর কী মনোভাব হবে? কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল শিবতোষ তবু তার স্ত্রীকে গভীরভাবে তখনও ভালোবাসতেন। কঠোর পরিশ্রম করে নতুন পরিচয়ে তিনি প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কিন্তু তাঁর হৃদয়বৃত্তি? ইভার প্রতি ভালোবাসা? কাজেই ইভার প্রত্যেকটি কাজ গতিবিধির ওপর নজর রাখলেন। শিবতোষ সম্পর্কে ইভা একটা সত্যকথা মিস বিশ্বাসকে বলেছিল ভদ্র কিন্তু ওর ব্যবহার কখনও কখনও রূঢ়তা দেখেছি শিবতোষ ঠাণ্ডা মাথায় স্থির করলেন ইভাকে আর কারো হতে দেবনা ইভা আমার হবে শুধু শিবতোষ শাসানির চিঠি পাঠাতে শুরু করলেন। তিনি ইভার হাতেরলেখা নকল করে চিঠিগুলো লিখলো যাতে ইভা যদি পুলিশের সরণাপন্ন হয় তাহলে পুলিশ যেন বোঝে ইভা নিজেই নিজের কাছে চিঠিগুলো লিখেছেন। অর্থাৎ পুলিশ ব্যাপারটার কোন গুরুত্বই দেবেনা, এই চিঠিগুলো আবার একই সঙ্গে ইভা সেনের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে শিবতোষ বেঁচে আছে কি নেই?

বেশ কয়েকবছর পর শিবতোষ ইভার জীবনে প্রবেশ করলেন। মনে রাখবেন শিবতোষ এখন আর যুবক নয়। তাঁর মুখে ফ্রেঞ্জকাট দাড়ি, ট্রেনদুর্ঘটনায় একটু বিকৃত মুখ, শান্ত, ধীর। তাঁকে চেনা ইভার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সবই ভালোভাবে চলল। ইভা শিবতোষকে বিবাহ করতে সম্মত হলেন। আর কোন শাসানির চিঠি এলো না।

কিন্তু পরে একটা চিঠি এল। কেন? আসলেই তার মনে যাতে কোন সন্দেহ না জাগে তার জন্যই এই চিঠি। অর্থাৎ ইভা যেন মনে করে শিবতোষ ও ডঃ সুমন্ত্র সেন দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি। কলকাতায় ইভা ও ডঃ সেনের ফ্ল্যাটে যে আগুন লেগেছিল এটাও শিবতোষের একটি চাল।

আর কোন শাসানির চিঠি এলো না। তাঁদের সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাতে লাগল।

কিন্তু বছর দুয়েক পরে শাসানির চিঠি এল। কারণ ইতিমধ্যে ইভার জীবনে এসেছেন সন্দীপ চ্যাটার্জী। ইভা গভীর ভাবে তার প্রেমে পড়লেন।

এই সত্যটি জেনে ডঃ সেন ইভাকে খুন করার পরিকল্পনা রচনা করতে লাগলেন। এই পরিকল্পনার নিজের অজান্তেই জীবনটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নার্স মিস বিশ্বাসের। ইভাকে দেখাশোনার জন্যে একজন নার্সকে বহাল করা হল কেন এই প্রশ্ন আমার মনে দেখা দিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য সুদূর-প্রসারী। ইভা সেনের মৃতদেহ দেখে যাতে একজন পেশাদার নার্স বলতে পারেন যে একঘণ্টারও আগে ইভার মৃত্যু হ'য়েছে। সে সময় সুমন্ত্র সেন ছাতে ছিলেন কাজেই তিনি সন্দেহমুক্ত থেকে যাবেন।

এসকাভেশন পার্টির মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি ঈর্ষা দ্বন্দ্ব চলছিল তারও মূলে ছিলেন ডঃ সুমন্ত্র সেন ইভা সেন নয়। ডঃ সেন ওপরে ওপরে ছিলেন শান্ত ভদ্র কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখনও তিনি উন্মাদ নব হত্যা উদ্যত। নিখুঁত খুনের পরিকল্পনা করে চলেছেন।

এবার দ্বিতীয় হত্যা—মিস ইন্দ্রানী সরকার। ইন্দ্রানী আনঅফিসিয়ালি ডঃ সেনের কাজ করে দিতেন, অফিসে ডঃ সেনের কাগজপত্র গোছগাছ করতে গিয়ে তিনি উড়ো চিঠির একটা খসড়া পান। ইন্দ্রানী প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলেন। তাহলে ডঃ সেনই তাঁর স্ত্রীকে ভয় দেখাচ্ছেন? ইন্দ্রানীর নিজেকে সংযত করতে পারল না। কথাটা ভেবে তাঁর চোখে জল এলো মিস বিশ্বাস তখনই তাঁকে কাঁদতে দেখেন।

ইন্দ্রানী তখনই ডঃ সেনকে সন্দেহ করেন নি। আমি দুটো পরীক্ষা করেছিলাম। আলী সাহেবের ঘরে আমি আর্তচীৎকার করে উঠেছিলাম। আপনার খাবার ঘর থেকে সেটা শুনেছিলেন। কারণ জানালা খোলা ছিল। মিস বিশ্বাস ইভা সেনের বন্ধ ঘর থেকে আর্ত চীৎকার করেছিলেন। আমি

অফিস ঘর থেকে তা শুনতে পাইনি। কারণ ইভা সেনের ঘরের জানালা বন্ধ ছিল। এবার ইন্দ্রানী সরকার অফিস ঘর থেকে একটা মৃদু আর্তচীৎকার শুনেছিল। তাঁর সন্দেহ হয় এটা ইভার সেনের চীৎকার। তার 'অর্থ' হল সেই সময় ইভা সেনের ঘরের বাইরের দিকের জানালা খোলা ছিল। তাহ'লে এই খুনের ক্ষেত্রে জানালার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তারপব একা বিকেলে ছাতে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ইন্দ্রানীর মনে বিদ্যুৎ ঝলকের মত সত্য ঘটনাটা ঝলসে উঠল। ছাতে থেকেও ডঃ সেন ইভাকে দিয়ে জানালা খুলিয়ে তাঁকে হত্যা করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে ডঃ সেনের প্রতি তাব শ্রদ্ধা ভালোবাসার কথা তাঁর মনে পড়ে। তাই মিস বিশ্বাসকে তিনি সত্যি কথাটা বললেন না।

'ডঃ সেন উদ্বেগের সঙ্গে ইন্দ্রানীর আচরণ লক্ষ্য করছিলেন। দেখলেন ইন্দ্রানী তাব অসহায় অবস্থা ও ভীতি ঢুকোলেন না। ইন্দ্রানী সব বুঝে ফেলেছে। তিনি ভাবলেন ইন্দ্রানী নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু পরে? কী ক'রে ওর ওপর নির্ভর ক'বে থাকা যায়? কাজেই আবার খুনের পরিকল্পনা। খুন করা একটা অভ্যেস।

ডঃ সেন সেই রক্তমাখা শিবালিঙ্গটা ইন্দ্রানীর খাটের নীচে রেখে দিলেন। রাত্রে জলেব গ্লাসের জায়গায় এ্যাসিডের গ্লাস রেখে দিলেন। শিবালিঙ্গটা প্রমান করবে ইভা সেনকে ইন্দ্রানীই হত্যা করেছিলেন তারপর অনুশোচনায় এ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

মৃত্যুকালে তাই ইন্দ্রানী শেষ সত্যটা জানিয়ে গেল 'জানালাটা' তা'ব মানে দরজা দিয়ে নয় জানালা দিয়ে ইভা সেনকে খুন করা হয়েছে।

অতএব—সবকিছুর মনস্তাত্ত্বিক সমাধান পাওয়া গেল—সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কিন্তু—বিতংস একটু থেমে বললেন—'আমার কাছে কোন প্রমান নেই—কোন প্রমান নেই।

আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। আমরা যেন এক ভীতির সমুদ্রে ডুবে আছি······শুধু ভীতি নয় সেই সঙ্গে করুনাও।

ডঃ সেন এতক্ষণ চুপচাপ নিস্পন্দ বসেছিলেন। এতক্ষনে একটু নড়লেন। শান্ত ক্লান্ত চোখে বিতংসর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন প্রমান নেই তাতে কিছু না। সত্যকে আমি অস্বীকার করবো না···কোনদিন সত্যকে অস্বীকার করিওনি···আমি খুশী হয়েছি···আমি বড় ক্লান্ত···।

সাদামাটাভাবে পরে বললেন—ইন্দ্রানীর জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। মনে হয় ওকে হত্যার পরিকল্পনা যে করেছিল যে আমি নয় যেন অন্য কেউ। খুব কষ্ট হয়েছে ইন্দ্রানীর কিন্তু…।

ডঃ সেনের দুঃখকাতর মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটল। বললেন—বিতংস বাবু আপনি অতীতকে সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন—আপনি একজন ভালো প্রত্নতাত্ত্বিক হতে পারতেন। একটু থেমে বললেন—,আমি সত্যিই ইভাকে ভালোবাসতাম…ইভাকে আবার আমিই হত্যা করেছি…বিতংসবাবু মনে হয় ইভার ব্যক্তিসত্ত্বাকে আপনি সঠিক বুঝেছিলেন।'

পলাশগড়ে আমার অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানেই শেষ।

আমার আর কিছু বলার নেই আলী সাহেব অর্থাৎ রাজা আর তার সঙ্গী নেপাল বর্ডারের কাছে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। আসল সোনার ত্রিশূল তরবারির খাপ, ছাড়া সবই উদ্ধার করা হয়েছিল।

শোভেন রেবা বোসকে বিয়ে করেছিল।

ইভা সেনকে আমি ভুলতে পারি নি। ডঃ সুমন্ত্র সেন যিনি দু' দু'টো খুনের অপরাধী তাঁকেও ভুলতে পারি নি। তিনি ইভা সেনকে কী গভীরভাবেই না ভালোবাসতেন!

রাশিয়ার গল্প

জনৈক পাগলের আত্মকথা।

লিও তলস্তয়

আমাকে আজ হাজির করা হ'ল এক 'মেডিকেল বোড' এর সামনে। উদ্দেশ্য আমাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা। আমার সম্বন্ধে 'বোড" এর ডাক্তাররা একমত হতে পারলেন না। এক একজন এক এক মতামত পেশ করতে লাগলেন। অনেক তর্কবিতর্ক হ'ল তাঁদের মধ্যে, অবশেষে তাঁরা তাঁদের সিন্ধান্ত ঘোষণা করলেন, আমি মানসিক রোগাগ্রস্ত নই।

আমি পাগল নই। যে কারণে তারা এই সিন্ধান্ত গ্রহণ করলেন তার পেছনে আমার একটু হাত ছিল অর্থাৎ তাঁরা যখন নানাভাবে আমাকে পরীক্ষা করছিলেন। তখন আমি একবারে নিশ্চুপ ছিলাম। একটা টু শব্দও করি নি। কারণ কথা বলতে গেলেই আমার পাগলামি ধরা পড়ে যেত। নিজেকে এ ভাবে সামলে রেখেছি একটি কারণে পাগলাগারদকে আমি ভীষণ ভয় করি। পাগলাগারদে গেলে আমাকে আর ওরা পাগলামি করতে দেবে না। তার চেয়ে এই ভাল। 'বোর্ড' এর ডাক্তাররা বললেন—আমার অসুখটা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অসুখ অথবা ঐ ধরনের অন্য কোন রকমের অসুখ। আসলে আমি প্রকৃতিস্থ পাগল নই। এটা অবশ্য ঐ ডাক্তরদের মতামত। আসলে আমি ভালো করেই জানি যে আমি পাগল। একজন ডাক্তার আমাকে একটা প্রেসক্রিপশন লিখেছিলেন। বললেন—এই ওষুধগুলো খেলে এবং তার নির্দেশ মত চললে—আমার অসুস্থতার উপসর্গ গুলো কেটে যাবে। আমি সুস্থ হব। ডাক্তারের কথামত কাজ হলে তো আমি বেঁচেই যেতাম। সত্যি কথা বলতে কি এসব আমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল।

তাহলে এখন প্রথম থেকেই সব কথা বলি, কী ক'রে আমার মাথায় ওলট-পালট ঘটলো কী করে আমার পাগলামির লক্ষণগুলো দেখা দিল আর এসব দেখে কেন আমাকে 'মেডিকেল বোর্ড" এর সামনে হাজির করা হ'ল ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যে।

আরো পাঁচজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত আমিও জীবন কাটিয়েছি পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত। কোন রকম অস্বাভাবিকতা আমার মধ্যে ছিল না। তবে আমার দশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত, আমাকে এরকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তবে মাঝেমধ্যে। এখন কিন্তু সর্বদাই এই কষ্ট ভোগ ক'রে থাকি। শৈশবে এই কষ্ট ভোগটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে আসে।

এই কষ্টভোগটা কী করে প্রথম শুরু হয় সেকথা বলি—

আমার বয়েস তখন পাঁচ কি ছয়। আমাদের একজন নার্স ছিল। তার নাম একপ্রাক্সিয়া। সে আমাকে কাপড় জামা ছাড়িয়ে বিছানায় শোয়াতে চাইছিল। নার্স একপ্রাক্সিয়ার চেহারাটা আমার বেশ মনে আছে। রোগা লম্বাটে শরীর, সবুজ রঙের পোশাক পরনে। রাত্রে শোবার সময় যে টুপী পরা হয় তার মাথায় সেই টুপী। একপ্রাক্সিয়া মেয়ে। কিন্তু তার থুতনিতে স্বল্প দাড়ির মত চুল। থুতনির নীচে চামড়ার ভাঁজ।

—আমি নিজেই উঠছি। এই কথা ব'লে আমি নিজেই নার্সের সাহায্যে ছাড়াই বিছানায় উঠতে গেলাম। নার্স বলল—ঠিক আছে এবার শুয়ে পড় ফে ফেঙকা। ঐ দেখ মিত্যা কত লক্ষ্মী ছেলে এর মধ্যেই দিব্যি শুয়ে পড়েছে। মিত্যা আমার ছোট ভাই। তার দিকে তাকিয়েই নার্স একথাগুলি বলল। নার্স হাত বাড়াল। তার হাত ধরে এক লাফে আমি বিছানায় উঠে পড়লাম। পা দিয়ে দ্রুত কম্বল সরিয়ে শুয়ে পড়ে কম্বলটা শরীরের জড়ালাম। আঃ কী আরাম।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—আমি আমার বোন নানীকে ভালোবাসি। নানী আমাকে আর মিত্যাকে ভালোবাসে। আবার আমি মিত্যাকে ভালোবাসি আবার মিত্যা আমাকে আর নানী ভালোবাসে। নানী তারাসকে ভালোবাসে। আমিও তারাসকে ভালোবাসি। মিত্যাও তারাসকে ভালোবাসে তারাস আবার আমাকে আর নানীকে ভালোবাসে। মা আমাকে আর নানীকে ভালোবাসে। নানীও আমাকে মাকে বাবাকে ভালোবাসে। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ভালোবাসি কী সুন্দর।

হঠাৎ শুনলাম আমাদের গৃহরক্ষকটার উচ্চ কণ্ঠস্বর। চীৎকার ক'রে চিনির পাত্র কোথায় এসব নিয়ে কি বলছে আর নানী উত্তেজিতস্বরে চেঁচিয়ে বলছে— 'আমি নিই নি'। এসব শুনে কেমন একটা শারীরিক অবসাদ বোধ করলাম। ভীষণ ভয় পেলাম আমি মাথাটা কম্বলে ঢেকে দেখলাম। হঠাৎ একটা

দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফোকা একদিন খুব রেগে গিয়েছিল। একটা ছেলেকে মেরেছিল। ওঃ কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল ফোকার মুখ। ছেলেটাকে ফোকা এক নাগাড়ে বেদম মারছে আর ব'লে চলেছে—আর করবি —করবি আর এরকম কাজ? ছেলেটা বলে চলেছে—'না—আর কক্ষনো করবো না।' কিন্তু ফোকার সেদিকে কান নেই। ও একইভাবে মারছে আর চীৎকার ক'রে বলছে করবি আর এ্যাঁ বল্ আর করবি? দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। কাঁদতে লাগলাম। কিছুতেই আর কান্না থামাতে পারছি না। ঐ কান্না আর হতাশার মধ্যে দিয়ে আমার প্রথম পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পেল।

আর একটি ঘটনা। আমার পিসি যীশুর গল্প শোনাচ্ছিল। তখন আমার কী মনে হয়েছিল তা স্পষ্ট মনে আছে। গল্প বলা শেষ হল, পিসি চলে যাবে বলে উঠেছে তখন আমরা বললাম—

আরও কিছু বলো—যীশুর গল্প।

এখন সময় নেই রে।' পিসি বলল।

পিসি বলো না।' আমরা বললাম। মিত্যা বরাবর বলতে লাগল—পিসি যীশুর গল্প বলো।' পিসি আবার প্রথম থেকে বলতে লাগল সেই গল্প—লোকে কী ভাবে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করল, চাবুক মারল। অথচ যীশু তাদের জন্যেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সেই অত্যাচারীদের বিচার করতে গেলেন না।'

আচ্ছা পিসি ঐ লোকেরা যীশুকে এ ভাবে মারল কেন?

—ওরা সব ছিল খুব খারাপ লোক।

—অথচ যীশু তো ভালো মানুষ ছিলেন তাই না?

—হ্যাঁ তা তো বটেই' যাকগে আটটা বেজে গেল—এখন আর না।

আচ্ছা পিসি ঐ লোকগুলো যীশুকে মারল কেন? যীশু তো ওদের ক্ষমা করেছিলেন তবু ওরা যীশুকে হত্যা করল কেন? আচ্ছা পিসি—যীশু খুব যন্ত্রনা ভোগ করেছিলেন—তাই না?

—ঠিক আছে ঠিক আছে। এখন আর নয়। আমি এখন চা খেতে যাব। পিসি বলল।

—আমার মনে হয় এসব সত্যি নয়। ওরা যীশুকে হত্যা করে নি।' আমি বললাম।

—হ'য়েছে হ'য়েছে।

—না পিসি—তুমি এখন চলে যেও না—আর একটু থাকো।

এইসব শুনলাম। আবার সেই কষ্ট আর হতাশা শুরু হল। দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলাম। কাঁদতে লাগলাম।

এইসব ঘটনাই আমার শৈশবের। চৌদ্দ বছর বয়েস হল আমার। আমার মধ্যে যৌনচেতনা জাগল। যত কুঅভ্যেস গড়ে উঠল আমার। আমার মধ্যে যে পাগলাটে ভাবটা ছিল সেটা কেটে গেল। অন্যান্য স্বাভাবিক ছেলেদের মত আমিও স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। দামী সুস্বাদু খাবার দাবার খেতে লাগলাম কোনরকম দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করতাম না। বাবামায়ের আদর। এর মধ্যে দিয়েই মানুষ হতে লাগলাম। আমার কামনার আগুন জ্বালিয়ে তোলার পরিবেশ চারদিকে, সঙ্গীও জুটল ধনীগৃহের অতি আদরে বখে যাওয়া ছেলে সব। তারাই আমাকে পাপ করতে শিখাল। এক পাপ থেকে আর এক পাপ ক্রমে নারীদের সংস্পর্শে এলাম। এইভাবে আমার জীবনে প'য়ত্রিশ বছর কেটে গেল। একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। কোন পাগলামির লক্ষণ নেই।

এই কুড়ি বছর যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কাটিয়ে ছিলাম সেই জীবন খুবই মনে পড়ে আমার। সেই দিনের কথা মনে করতে আমার কষ্ট হয় বিরক্তি হয়। সামান্য কিছুই মনে পড়ে। আর সব সুস্থ ছেলেদের মত আমিও প্রথমে পড়তে গিয়েছিলাম 'গ্রামার স্কুলে। সেখান থেকে য়ুনিভার্সিটি। সেখান থেকে আইনশাস্ত্রের স্নাতক হয়ে ছিলাম। কিছুদিন আইনব্যবসা করেছিলাম তারপর একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পরে তাকেই বিয়ে করে ছিলাম। বিয়ের পর একা গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। ঘর সংসার করতাম। ছেলেমেয়ে লালনপালন, জমিজেরাত দেখাশুনা এসব করতাম আর কি। অবশ্য জেলাশাসকের পদেও আমি কাজ করেছিলাম। ছেলেবেলার পাগলামির কথা আগেই বলেছি। এবার বিয়ের ঠিক নয় বছর পর আমার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পেল।

আমার স্ত্রীর পৈতৃক সম্পতি ছিল। তার আয় থেকে আমরা কিছু সঞ্চয় করেছিলাম। এ ছাড়াও আমার ছিল কিছু কোম্পানীর কাগজ। এসব দিয়ে অন্য একটা সম্পত্তি কেনার ইচ্ছে ছিল আমাদের। কিছুদিন থেকে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে ছিল আমার মধ্যে কী ক'রে সম্পতি বাড়ানো যায়।

আমার কেমন মনে হত সম্পত্তি কেনা ও সেসব সুষ্ঠুভাবে চালাবার মত ব্যাপারে আমার বুদ্ধি খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারব। এক্ষেত্রে অন্য লোকেদের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি খেলবে। এটা প্রমান করবার জন্যে সম্পত্তি কেনা বেচার সব খবর রাখতাম আজি পত্রিকায় সম্পত্তি বিক্রীর কোন বিজ্ঞপ্তিই নজর এড়াত না। সম্পত্তির খোঁজ করতাম এমন সম্পত্তির যেটার আয় থেকে বা বনভূমির কাঠ থেকে আমার দাম উশুল হয়ে যাবে। সম্পত্তি পেয়ে যাবো একরকম বিনি পয়সাতেই।

এসব ঘোর প্যাঁচ বোঝে না এরকম একটা হাবাগোবা লোকই খুঁজছিলাম যে তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করবে। বরাৎই বলতে হবে জুটে গেল এরকম একটা লোক, সংবাদ পেলাম পেনজা অঞ্চলে একটা সম্পত্তি বিক্রী হচ্ছে বনের গাছপালা সমেত। বুঝে গেলাম ঐ সম্পত্তির মালিক একটা হদ্দ বোকা। নইলে এরকম সম্পত্তি কেউ বিক্রী করে? আরে ঐ বনাঞ্চলের শুধু গাছপালা বিক্রী করলেই সম্পত্তির দাম উশুল হ'য়ে যায়। কাজেই আমি সংবাদ পাওয়া মাত্র রওনা হলাম। উদ্দেশ্য ঐ সম্পত্তি কেনা।

একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে কিছুটা পথ প্রথমে ট্রেনে চড়ে গেলাম। তারপর চললাম ঘোড়ায় টানা ডাক গাড়ীতে। বেশ ভালোই লাগছিল যাত্রাপথ। সঙ্গের চাকরটার বয়েস বেশী নয়। তাকেও দেখলাম খুব খোশ মেজাজে চলেছে। নতুন নতুন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি আশেপাশের লোকজনও নতুন—মনটা খুশীতে নেচে উঠল। বেশ দূরে যেতে হবে। কাজেই স্থির করলাম শুধু ঘোড়া পালটা-বার সময় থামব। তাছাড়া থামব না।

রাত নামল। কিন্তু গাড়ি থামালাম না। গাড়ি চলল। চাকরটার আর আমার দু'জনেরই ঝিমুনি এল। কখন ঘুমিয়েও পড়লাম। হঠাৎ জেগে উঠলাম। কেমন একটা ভয় যেন আমাকে পেয়ে বসল। ভয়টা কষ্ট দায়ক। কেবল মনে হতে লাগল সারারাত আমি আর ঘুমুতেই পারবো না। জেগেই কাটাতে হবে আমাকে। কেমন মনে হতে লাগল—কোথায় আমি যাচ্ছি? কেনই বা যাচ্ছি? এ ভাবনাটা কিন্তু আমার মনে আসে নি যে আমি সস্তায় একটা সম্পত্তি খরিদ করতে যাচ্ছি। তবুও আমার বারবার মনে হ'তে লাগল—এভাবে অত দূরে ছুটে যাওয়া অর্থহীন। কে জানে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়েই আমার মৃত্যু হবে কিনা। বেশ আতঙ্ক বোধ করলাম আমি। আমার চাকরটার নাম সার্জি। দেখি সেও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। ভয় আতঙ্ক এ সবের হাত

থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আমি সার্জির সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম, যে অঞ্চল দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম সেই অঞ্চলের কথাও ওকে বললাম। সার্জি অল্প হাসল। কিন্তু আমি আতংকের হাত থেকে রেহাই পেলাম না। তারপরে ওর সঙ্গে ঘর গেরস্থালির কথা বলতে লাগলাম। সস্তায় যে সম্পত্তি কিনতে যাচ্ছি সে কথাও বলতে লাগলাম। সার্জি বেশ খোশ মেজাজেই কথাবার্তা বলতে লাগল। কিন্তু আমার মন তখনও অশান্ত। সার্জির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে মনটা যেন একটু হাল্কা হ'ল। তাছাড়া নিজেকে কেমন যেন ক্লান্ত বোধ হ'তে লাগল। কারণটা বোধহয় এতক্ষণের ভয় আর কষ্ট। কাজেই কেমন মনে হ'তে লাগল—আর যাবো না। মনে হতে লাগল কোন এক গৃহস্থ বাড়িতে আশ্রয় নি, বাড়িব লোকজনের সঙ্গে কথা বললে, চা-টা খেলে বিশেষ করে একটু ঘুমুতে পারলে নিশ্চয়ই আমার মনটা ভালো হবে। এই সময় আমরা'আজা-মাস' শহরের কাছাকাছি এসে পেঁছেছি।

গাড়ির চালককে বললাম—এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গেলে হ'ত না?

—বেশ তো, বিশ্রাম করে নিন।

—শহরটা কি খুব দূরে?

—না। এই কয়েক মাইল।

গাড়ীর চালকের বেশ শক্তপোক্ত শরীর। কাজকর্মেই চট পটে। কিন্তু ওকে দেখে কেমন বিষাদ গ্রস্ত মনে হয়। চালক আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল।

আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। তখন আর কথা বলছি না। মনটাও বেশ হাল্কা লাগছে। ভাবছি শহরে ঢুকে একটু বিশ্রাম করতে পারলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এগিয়ে চললাম আমরা। চারপাশ অন্ধকার। যাচ্ছি তো যাচ্ছি। পথ যেন শেষ হ'তে চায় না। অবশেষে শহরে এসে পেঁছালাম আমরা। শহরের বাসিন্দারা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকারের মধ্যেই দেখছি-ছোট ছোট বাড়িঘর। নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু শোনা যাচ্ছে আমাদের গাড়ির ঘণ্টার শব্দ আর ঘোড়ার ডাক। মাঝে মাঝে দেখছি সাদা রঙ করা বড় বড় বাড়ি। এই দৃশ্য দেখে আর শব্দ শুনে আমার মনটা কেমন যেন বিষাদে ভ'রে গেল। স্টেশনে পেঁছে একটু স্যামোভার খেয়ে শুয়ে পড়তে পারলে আমি যেন বাঁচি।

তারপর একটা ছোট বাড়ির সামনে এসে আমরা পেঁছলাম। সামনেই ডাকগাড়ির স্টেশন। বাড়িটা সাদা রঙের। বাড়িটার দিকে তাকাতেই আমার মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। বেশ ভয় পেয়ে গেলাম আমি। আস্তে আস্তে গাড়ি

থেকে নামলাম।

সার্জও গাড়ি থেকে নামল। দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দ করতে সাদা বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল। ঐ ঘটাং ঘটাং শব্দ শুনে আমি কেমন যেন অবসন্ন বোধ করতে লাগলাম। বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। একটা চাকর আমাকে পথ দেখিয়ে ওয়েটিংরুমে নিয়ে এল। তার গালে জন্মচিহ্নের জড়ুল। ওর গালের দাগটা দেখে আমি কেমন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। একটা অন্ধকার ঘরে ও আমায় নিয়ে গেল। সেই ঘরে ঢুকে আমার ভয় আরো বেড়ে গেল।

—রাত্তিটায় একটু বিশ্রাম করতে পারি এরকম একটা ঘর দিতে পার না? আমি জানতে চাইলাম।

—নিশ্চয়ই—এই তো ঘর—বিশ্রাম করুন।

রাতে থাকার জন্য যে ঘরটা আমাকে দিল সেটা চৌকোনো ঘর। দেওয়াল চুনকাম করা। পরিচ্ছন্ন। একেবারে চৌকানো ঘরটা দেখে আমি যেন আরো উদ্বিগ্ন হলাম। একটি মাত্র জানালা ঘরটায়। জানালার ছোট পর্দাটা লাল রঙের। ঘরে একটা কাঠের টেবিল। দু'দিক বাঁকানো একটা সোফা।

আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সার্জ ঘরে ঢুকল। চা আর স্যামোভার তৈরী করতে লাগল। ঘুম আসছিল না। বিছানায় শুয়ে শুনলাম সার্জ শব্দ ক'রে চা খাচ্ছে। ও আমাকে ডাকল। কিন্তু উঠলাম না পাছে ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে যায়। ভাবছিলাম—এই ঘরে সারারাত জেগে কাটাতে পারবো না আমি। কাজেই বিছানা ছেড়ে উঠলাম না। একটু তন্দ্রামত এসেছিল বোধ হয়। তন্দ্রা ভাঙতেই দেখি ঘরে কেউ নেই। ঘর অন্ধকার।

গাড়িতেও আমার তন্দ্রামত এসেছিল। তখন তন্দ্রা ভেঙে উঠে আমার মনে হ'য়েছিল, আর ঘুম আসবে। এখনও ঠিক তাই মনে হতে লাগল। মনে হ'ল, ঘুম হবার কোন আশা নেই। অনেক রকম চিন্তা মনে আসতে লাগল, কেন এখানে এলাম? আমি কোথায় যাচ্ছি? কেন আমি পালিয়ে যেতে চাই? পালিয়ে কোথায় যাবো? আমি তো আমার সঙ্গেই রয়েছি। সব রকম ভয় আর যন্ত্রণার উৎস তো আমি নিজেই। ঠিক তাই আমি নিজে। আমার সঙ্গেই তো আমার সব কিছু রয়েছে।

পেনজায় যে সম্পত্তি কিনতে যাচ্ছি সেই সম্পত্তি আমায় কিছু দিতে পারবে না আবার আমার কাছ থেকে কিছু নিতেও পারবে না। এটা যে কোন

সম্পত্তির ক্ষেত্রেই সত্য। নিজেই নিজেকে নিয়ে তো অনেক বছর কাটল। শুধু যন্ত্রণা আর দুঃখই পেলাম। এই সব চিন্তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। নিজের চিন্তার হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাচ্ছিলাম না।

পারলাম না। ঘর থেকে বেরোলাম আমি। বাইরের দালানে সার্জেকে দেখলাম। ছোট্ট একটা বেঞ্চে শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর একটা হাত বেঞ্চ থেকে ঝুলছে। নিশ্চিন্ত ঘুম। গালে জড়ুল অলা চাকরটাকেও দেখলাম ঘুমুচ্ছে। একটা ভীতির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু সেই ভীতি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে না ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।

কেমন বিরক্তি লাগল। ভাবলাম, এ কী জ্বালা। ভয়টা কীসের? মৃত্যু যেন জবাব দিল তার, এই যে আমি মৃত্যু। তোমার ভয় আমাকে। কথাটা ভাবতেই শরীরটা সিঁটিয়ে গেল আমার। ঠিক। একেই ভয়। মৃত্যু আসছে, মৃত্যু! কিন্তু আমি তো মরতে চাই নি। তখন যে বোধ আমার মনে জাগল, যদি সত্যি সত্যি মৃত্যু আমার মুখোমুখি দাঁড়াত, হয়তো ঐ বোধ আমার মনে আসত না। আমি শুধু এটাই বুঝেছিলাম, মৃত্যু আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু মৃত্যু এখন আসবে কেন? আমি তো বাঁচতেই চাইছি। জীবনটা তো আমি ভোগ করতে চাই। অথচ মৃত্যু এগিয়ে আসছে। কিন্তু এ হবে কেন? অসহ্য হ'য়ে উঠল এই দুই চিন্তার দ্বন্দ্ব। একদিকে মৃত্যু এগিয়ে আসছে অন্যদিকে আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে। মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইলাম এই যন্ত্রণা আর এই ভীতি। খুঁজতে খুঁজতে পেলাম একটা ব্রোঞ্জের বাতিদান। খানিকটা মোম রয়েছে তাতে। আলো জ্বাললাম। দেখলাম বাতিদানের তুলনায় মোমটা খুবই ছোট। তখনি ঐ একটা সত্য মনে এসে ধাক্কা দিল, মৃত্যু! মোমবাতিটা পুড়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। মৃত্যু, জীবনে মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। অথচ এ তো হওয়া অনুচিত। চেষ্টা করতে লাগলাম অন্য কিছু ভাবতে, যে সম্পত্তি কিনতে যাচ্ছি তার কথা, আমার স্ত্রীর কথা। কিন্তু এসব ভেবে কোন সান্ত্বনা পেলাম না। উল্টে মনে হতে লাগল, সব মিথ্যে। সত্য, শুধু মৃত্যু।

যা কিছু নিয়েই ভাবতে যাই না কেন, আমার কেবলি মনে হ'তে লাগল,

আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। ঘুমোতে চাই ঘুমোতেই হবে আমাকে। এসে বিছানায় শুলাম। ঘুমোতে হবে। কিন্তু হঠাৎ শিউরে উঠলাম। উঠে পড়লাম। বমি করার আগে লোকে অস্থিরতা বোধ করে এও ঠিক তেমনি। একটা মানসিক উদ্বেগ-কাতরতা বোধ করলাম আমি। ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা। প্রথমে ভেবেছিলাম আমার ভয়টা মৃত্যুভীতি। কিন্তু জীবনের সব কথা যখন মনে পড়তে লাগল তখন মনে হ'ল, এই ভীতি জীবনের ভীতি, সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবার ভয়। যেভাবেই হোক জীবন আর মৃত্যু এক হয়ে গেছে। কিছু একটা যেন আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে নিতে চাইছে কিন্তু পারছে না।

আবার আমি ঘরের বাইরে এলাম। ঘুমন্ত সার্জি আর চাকরটাকে দেখলাম। নিজের বিছানায় ফিরে এলাম। ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এখানেই সেই ভীতি জানালার লাল পর্দা সাদা দেয়াল চৌকোনো ঘর। কী একটা যেন ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ছে না। আমার ভেতরে যেন ভালো কিছু নেই। রয়েছে শুধু রসশূন্য শুকনো পাপ। নিজের ওপরেই একটা অদ্ভুত রাগ হ'ল আমার। আর রাগ হল ঈশ্বরের ওপর।

আমাদের স্রষ্টা কে? ঈশ্বর। এই তো লোকের বিশ্বাস। আমার মনে হল—ঈশ্বরকে ডাকা উচিত। তাঁর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। কতদিন ঈশ্বরকে ডাকি নি। তা প্রায় বছর কুড়ি হবে। আসলে এসব আমি বিশ্বাস করতাম না। প্রচলিত লোকাচার, কাজেই প্রতি বছর কনফেশান আর কমিউনিয়ান-এর পবিত্র অনুষ্ঠানে যেতাম। কিন্তু এ সব কিছুতে আমার বিশ্বাস ছিল না। আজ কিন্তু সত্যি সত্যি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করলাম।

অন্তর থেকে বলতে শুরু করলাম, হে আমাদের পিতা, হে জননী মেরী আমাকে দয়া কর। বুকে ক্রুশ আঁকলাম। মাটিতে শুয়ে প্রণাম করতে লাগলাম। আবার ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়েও দেখছি, কেউ আমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলল কি না। পাছে কারো চোখে পড়ে যাই তাই ভয়ে একেবারে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আবার মনে সেই ভীতি জাগল। এ আমার সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বাইরে চলে এলাম। সার্জি আর চাকরটাকে ডেকে তুললাম। সার্জিকে বললাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। আমরা এবার যাত্রা শুরু করবো।

আবার পথ চলার পথ। বাইরের বাতাস গায়ে লাগছে। একটু ভালো বোধ করলাম আমি। একই সঙ্গে একটা বোধ আমার মনে জন্ম নিল, আমার মন অধিকার ক'রে নিয়েছে। কী একটা জিনিস। আমার পূর্বের জীবনটাকে সে জিনিসটা যেন বিষবৎ ক'রে তুলেছে।

পরদিন সন্ধ্যের সময় আমরা গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলাম। সারাটা দিন আমার মনের সেই ভীতির সঙ্গে আমি লড়াই করেছি। মনে হল যেন সেই ভীতিকে জয় করেছি। কিন্তু মনের গভীরতায় চিহ্নটুকু রয়ে গেছে। কোন দুর্ঘটনার কথা মানুষ ভুলে গেলেও মনের গভীরে তার চিহ্ন যেমন থেকে যায়।

সন্ধ্যেবেলা আমরা সেই সম্পত্তি বিক্রেতার বাড়িতে পেঁছিলাম। বৃদ্ধ-নায়েব আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। অবশ্য তাঁর চোখেমুখে উৎসাহব্যঞ্জক কোন ভাব দেখলাম না। বরং নায়েবমশাই এই সম্পত্তি বিক্রীতে খুশী নন এটাই বোঝা গেল।

একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হ'ল। ঘরের আসবাবপত্র দামী পরিচ্ছন্ন কাপড়ে ঢাকা। খেতে দিল সুস্বাদু স্যামোভাব। চা খেলাম মধুমেশানো। সবই সুন্দর। নায়েবকে সম্পত্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করলাম নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে। কারণ এসব ব্যাপারে আমার বিশ্রী লাগে।

সেই রাত্রে আমার কিন্তু সুনিদ্রা হল। ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম্—আগের দিন রাত্রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম তাই সুনিদ্রা হ'ল। অতঃপর ঠিক আগের মতই জীবন যাপন করতে লাগলাম। কিন্তু ঐ ভীতির ভাবটা আমার মনে বরাবরের মতই রয়ে গেল। আগের দিনগুলোর মত কী কী করবো সেই পরিকল্পনা মাফিক অক্লান্ত কাজ ক'রে যেতে লাগলাম: স্কুলের ছাত্ররা যেমন না ভেবেচিন্তে পড়া মুখস্থ ব'লে যায় তেমনি। ঠিক সেভাবেই জীবন কাটাতে লাগলাম। তবু ভয়—আর্জামাস থাকার সময় যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছিলাম আবার তার পুনরাবৃত্তি না হয়।

তারপর ওখান থেকে মঙ্গলমত বাড়ী ফিরে এলাম। ঐ সম্পত্তি কেনা হ'ল না—কিনতে পারলাম না। বাড়ি এসে সেই আগের মতই জীবন কাটাতে লাগলাম। আমি তবে একটু অন্যরকমভাবে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা শুরু করলাম আর নিয়ম ক'রে গীর্জায় যেতে লাগলাম। আগের মতই জীবন কাটাতে লাগলাম একথাটা বললাম বটে তবে একেবারে ঠিক আগের মত নয়, যে

সব কাজ আগের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে করেছিলাম—কোনরকমে গতানুগতিকভাবে সেই কাজই ক'রে যাচ্ছিলাম। নতুন কোন কোন কাজের দায়িত্ব নিতে সাহস পাচ্ছিলাম না। পূর্বের জীবনের সেই আনন্দ আর পাই না। সবকিছুই বিরক্তিকর লাগতে লাগল। অবশেষে ধর্মেকর্মে মন দিলাম। আমার এসব কাজ দেখে আমার স্ত্রী কখনও বকাঝকা করতে লাগল কখনও ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে লাগল। যা হোক মন আর আগেব মত আতঙ্কগ্রস্ত হ'ল না।

এর মধ্যে একটা মামলার ব্যাপাবে আমাকে মস্কো যেতে হ'ল। দিনের বেলা সব জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে সন্ধ্যে বেলা রওনা হ'লাম। বেশ খোশমেজাজেই মস্কো এলাম। যাত্রাপথে খারকোভের এক জমিদারের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। চাষাবাদ মহাজনী ব্যাপার এসব নিয়ে কথাবার্তা হ'ল। মস্কোয় কোথায় থাকা যায়-থিয়েটারটিয়েটাব কী দেখা যায়—এ সব নিয়েও কথাবার্তা হ'ল। কথাবার্তা শেষে আমরা স্থির করলাম ম্যাসনিট্‌স্‌কী স্ট্রীটে মস্কো হোসেটলরীতে গিয়ে আমরা দু'জনে আস্তানা নেব। ঠিক করলাম আমরা দুজনে একসঙ্গে ফাউসট দেখতে যাবো।

মস্কোতে আমরা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলের ঘর বারান্দা থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। হোটেলের চাকর মালপত্র নিয়ে এল। হোটেলের পরিচারিকা এসে একটা বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। বাতিটা প্রথম বেশ উজ্বল আলো দিচ্ছিল। কিন্তু তারপরেই আলোর ঔজ্বল্য কমে গেল। বাতিটাতি অবশ্য এভাবেই জ্বলে। পাশের ঘরে কার কাশির শব্দ পেলাম। বুড়ো মানুষের কাশি বলে মনে হ'ল। হোটেলের পরিচারিকাটি চলে গেল। চাকরটি জানতে চাইল সে আমার মালপত্র খুলবে কি না। বাড়ির শিখাটা উজ্জ্বল হল। এবার খাবার ঘরটার সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পেলাম। নীল রঙের কাগজে আঁটা দেয়াল। তাতে হলুদ ডোরাকাটা। ঘরের মাঝখানে একটা পার্টিশানমত। একটা জমকালো টেবিলে মাঝখানে। তার পাশে একটা সোফা একটা আয়না। জানালা আছে। ঘরটি বেশ ছোট। এসব দেখতে দেখতে আর্জামাসে যেমন আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়েছিলাম সেই রকম হ'ল। হা ঈশ্বর! এ ঘরে কী করে রাত কাটাবো!

হোটেলের চাকরটাকে কিছুক্ষণ ঘরে আটকে রাখতে চাইলাম। বললাম মালপত্র খুলে দাও তো ভালোই হয়। থিয়েটারে যাবে। কাজেই এখন আমাকে পোশাক পাল্টাতে হবে। চাকরটা আমার বাক্সপ্যাটরা খুলল। তখন

ওকে বললাম আমার সঙ্গে একভদ্রলোক এখানে এসেছেন। উনি আট নম্বর ঘরে উঠেছেন। তাঁকে গিয়ে বলো যে মিনিট খানেকের মধ্যে তৈরী হয়ে আমি আসছি। চাকরটা চলে গেল। আমি দ্রুত পোশাক পালটাতে লাগালাম। কিন্তু ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকাচ্ছিলাম না আমি ভয়ে। অবশ্য সেইসঙ্গে নিজের ওপরেও বিরক্ত হচ্ছিলাম আমি। এসব ছেলেমানুষি। কীসের ভয় আমার? ভূতটুতের? বাচ্চা ছেলে নাকি আমি যে ভূতের ভয় পাবো? না ভূতটুতের ভয় নয়। এই ভয়ের চেয়ে ভূতের ভয় অনেক ভালো। কোন ভয়ের চেয়ে?—না আমার নিজের চেয়ে। ছি—কী সব বাজে ভাবনা।

একটা শার্ট পরলাম—কড়া ইস্ত্রী করা। হাতার বুকে বোতাম আঁটলাম নতুন একজোড়া বুট পরলাম। পুরোদস্তুর সেজেগুজে খারকোভের সেই জমিদার ঘরে গেলাম। জমিদারটিও আমার জন্যে তৈরী হয়ে বসেছিলেন দু'জনে রওনা হলাম ফাউস্ট দেখতে।

রাস্তায় যেতে যেতে জমিদার সঙ্গীটি একটা দোকানে ঢুকলেন। মাথার চুলটায একটু ঢেউ খেলিয়ে নেবেন এই ইচ্ছে। আমিও একটা ফরাসী কেশ চর্চার দোকানে ঢুকলাম। ইচ্ছে মাথার চুল কাটবো। নাপিতের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ খোশগল্প করলাম। সেই দোকান থেকে বেবিয়ে এলাম। আর একটা দোকানে গিয়ে একজোড়া দস্তানা কিনলাম। এসবের মধ্যে আমি ভুলে রইলাম আমার হোটেলের ঘর, ঘরের পার্টিশান এসবের কথা।

থিয়েটার দেখার সময়টাও বেশ ভালোভাবেই কাটলো। থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে বহু জমিদারটি বলল—চলুন কিছু খাওয়া যাক। এসব খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমি খুব অভ্যস্ত নই। তবু এখুনি হোটেলে ফিরলে আবার সেই ঘর, সেই পার্টিশনেব সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সেই ভয়ে আমি খেতে রাজী হয়ে গেলাম।

হোটেলে যখন ফিরলাম তখন রাত একটা বেজে গেছে। খাওয়ার সময় দু' গ্লাস মদ খেয়েছিলাম আমি, এসব খাওয়ার ব্যাপারে আমি মোটেই অভ্যস্থ নই। তবু মদ খেয়ে মনটা বেশ খুশী হয়ে উঠেছিল।

অনুজ্বল আলো জ্বালা হোটেলে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের সেই ভ্যাপসা গন্ধ নাকে ঢুকল। ভয় পেয়ে বসল আমাকে। ভয়ে আমার শিড়দাঁড়া পর্যন্ত কেঁপে উঠল। কিন্তু উপায় তো নেই। বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করলাম। বিদায় নিলাম। আমার ঘরে এসে ঢুকলাম।

বলে বোঝাতে পারবো না কী ভাবে সারারাত কাটলো আমার। আর্জা-মাসে যে ভাবে রাত কাটিয়েছিলাম এই রাত কাটলো তার চেয়েও বিশ্রীভাবে। সকালের দিকে পার্টিশানের ও পাশের ঘর থেকে বুড়ো লোকটার কাশির শব্দ কানে এলো। তখনই আমার ঘুম এলো। তাও সেই বিছানায় শুয়ে নয়। অনেক চেষ্টা ক'রেও বিছানায় ঘুমুতে পারি নি। ঘুমোলাম ঘরের ছোট্ট সোফাটার ওপর।

কী যন্ত্রনায় মধ্যে দিয়ে সারা রাত কাটল। মনে হচ্ছিল আমার আত্মাটা যেন আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে চাইছে। আমি বেঁচে আছি এতদিন বেঁচে আছি—আরও বাঁচতে চাই—কিন্তু মৃত্যু আসতে চাইছে হঠাৎ জীবনের সবকিছুর শেষ। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে বেচে থাকাটা তো অর্থহীন। মৃত্যুরই বা অর্থ কী? যদি জানি মৃত্যু অবধারিত তাহলে এখনই নিজেকে মেরে ফেলি বা কেন? কিন্তু ভয় তাহলে মৃত্যু আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কিন্তু তাতেও তো ভয় আমার। আচ্ছা কেন মানুষ বেঁচে থাকতে চায়? মরবার জন্যে? বৃত্তকার একটা ধাঁধা যেন। এটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না আমি।

একটা বই নিলাম। পড়তে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের জন্যে মানসিক যন্ত্রণা ভুলে রইলাম। কিন্তু তারপরেই আবার সেই ভয় আতংক। দু'হাতে চোখ ঢেকে বিছানায় পড়ে রইলাম। এই ভাবে পড়ে থাকাটা আবার আরো যন্ত্রণার।

এ কি ঈশ্বরের বিধান? কিন্তু কেন? লোক বলে—প্রশ্ন নয়—প্রার্থনা ক'রে যাও। বেশ তাই হোক। আমি প্রার্থনা শুরু করলাম। আর্জামাসেও এই ভাবে প্রার্থনা করেছিলাম। ঠিক সেই ভাবেই প্রার্থনা শুরু করলাম। আর্জামাসে প্রার্থনা করেছিলাম অবোধ শিশুর মত। এবার করলাম সত্যিকার প্রার্থনার মত। অর্থপূর্ণ প্রার্থনা। মাথা নীচু ক'রে বলতে লাগলাম—ঈশ্বর-যদি তুমি সত্যি সত্যি থাকো তাহলে আমাকে বল—আমি এই পৃথিবীতে কেন এসেছি—? কী আমার পরিচয়? আমার জানা সব রীতিতেই প্রার্থনা করলাম। সব কথা বললাম। নিজের মনে ভেবেও অনেকিছু বললাম। অবশেষে বললাম—তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও।

আমি প্রতীক্ষায় রইলাম আমার প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার জন্যে। কিন্তু কোন উত্তর নেই। মনে হ'ল যেন উত্তর দেবার কেউ নেই। তারপর আমার

নিজের প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেই দিলাম।—তোমার জীবন তো ভবিষ্যৎ জীবনে তোমার বেঁচে থাকার জন্যে। এটা বুঝেও বুঝলাম না —এই যদি হবে তাহ'লে এই অনিশ্চয়তা আর যন্ত্রণা কেন? ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। যখন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে প্রশ্ন করি নি তখন তো এসবে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন আর বিশ্বাস করি না।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বললাম—যদি তোমার অস্তিত্ব থাকতো; তুমি প্রকাশিত হতে আমার কাছে, মানুষের কাছে। কিন্তু তোমার অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব আছে শুধু নৈরাশ্যের যা আমি মোটেই চাই না। এসব বলতে বলতে আমি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম। ক্রুদ্ধ হলাম আমি। ঈশ্বর আমার কাছে প্রকাশিত হোক, সত্য আমাব কাছে প্রকাশিত হোক, তিনিই আমার কাছে সত্য কে প্রকাশিত করুন—এ সবেব জন্যে মনেপ্রাণে আমি প্রার্থনা করেছি। যে যে পদ্ধতি আমার জানা ছিল তার সবই করেছি আমি। কিন্তু ঈশ্বর আমার কাছে প্রকাশিত হন নি। হঠাৎ মনে পড়ল বাইবেলের সেই কথা—প্রার্থনা কর প্রার্থনা করলেই দেওয়া হবে তোমাকে। কিন্তু কই? আমি তো প্রার্থনা করলাম কিন্তু কই সান্ত্বনা তো পেলাম না। পেলাম শুধু নীরবতা। হয়তো আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাই নি। হয়তো ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছি। "তুমি যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে এক ইঞ্চি স'রে যাও তিনি স'রে যাবেন এক মাইল দূরে।"

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি নি। বিশ্বাস না করেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি। তাই তিনি আমার কাছে প্রকাশিত হলেন না। আমি তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছি। তাঁর অপ্রশংসা করেছি। আসলে তাঁর ওপর আমি বিশ্বাস স্থাপনই করতে পারি নি।

পরের দিন, চাইলাম দিনের বেলায়ই সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে ফেলতে যাতে রাত্রে আর ঐ ঘরে থাকতে না হয়। সব কাজ শেষ করতে পারলাম না কিন্তু সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরে এলাম। আমার উদ্বেগ আর রইল না।

যখন আর্জামাসে গিয়ে ছিলাম তখন আমার জীবনের যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার মধ্যে আরো পরিবর্তন ঘটল মস্কোয় সেই হোটেলে রাত কাটাবার পর। আমি কেমন যেন সবকিছুর ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলাম। মাঝে মাঝে এই বিতৃষ্ণার ভার আসতো। আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। স্ত্রীর জেদ ধরল; বলল যাও ডাক্তার দেখিয়ে নাও। স্ত্রী আরো বলল ঈশ্বর আর ধর্মটর্ম সম্বন্ধে

আমি ইদানিং যা বলি এসবই আমার অসুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু আমি ভালো করেই জানি আমার সব দুর্বলতা আর অসুখের কারণ আমার মানসিক দ্বন্দ্ব। যে রকম জীবন আমি বরাবর যাপন করেছি সেই রকমভাবেই চললাম আর আমার এই মানসিক দ্বন্দ্বকে মনের গভীরে ঠেলে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম। প্রতি রবিবার আর বিশেষ ধর্মীয় পার্বনের দিনে গীর্জায় যেতে লাগলাম। কনফেশান আর কামউনিয়ান অনুষ্ঠানেও যেতে লাগলাম। পেনজা অঞ্চলে যখন গেলাম তখন উপবাস করতে আরম্ভ করলাম। প্রার্থনার সময়ও বাড়িয়ে দিলাম আসলে আমি কিন্তু এসব থেকে প্রতিদানের আশা করতাম না। যেন চুক্তিমত টাকা পাবো না জেনেও চুক্তিপত্র ছিঁড়ে না ফেলে যত্ন করে তুলে রাখার মত। উদ্দেশ্য শুধু প্রতিবাদ জানানো। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো করতাম কারণ বৈষয়িক কাজকর্ম আমি করতাম না। অবশ্য সেই সামর্থ্যও আমার ছিল না। সময় কাটাতে হবে তাই মাসিক পত্র পত্রিকা উপন্যাস এসব পড়তাম। কখনও অল্প টাকার বাজি রেখে তাস খেলতাম।

কখনো কখনো শিকার করতে যেতাম। শুধু এই সময়ই আমি আমার আগেকার সেই উৎসাহ আর শক্তি ফিরে পেতাম। শিকারের ঝোঁক আমার চিরকালের। এমন সময় আমার এক প্রতিবেশী নেকড়ে বাঘ শিকারের উদ্যোগ আয়োজন করছিল। আমি তার সঙ্গী হলাম।

শিকার করবার জায়গায় এলাম। বরফের ওপর চলাফেরার জন্যে স্কি পরে নিলাম। সকলেই। শিকারের ব্যাপারে সুবিধে করতে পারলাম না। কারণ নেকড়ে বাঘেরা আমাদের পাতা ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গেল। দূর থেকেই এসবের শব্দ শুনেছিলাম। বুঝলাম ব্যাপার সুবিধের নয়। তখন খরগোসের চলাচলের পথ ধরে খরগোস শিকার করতে এগিয়ে চললাম। একটা খরগোসও দেখতে পেলাম। কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে খরগোসটা যেন এক ছুটে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

তারপর আমি ফিরে আসতে লাগলাম। চারধারে উঁচু উঁচু গাছ। সে সবের মধ্যে দিয়ে। মাটিতে বেশ পুরু হয়ে পড়েছে বরফের স্তর। স্কি বরফে ডুবে যেতে লাগল। গাছগুলোর ডালপালাও চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তুষারের স্তর আরো গভীর হ'তে লাগল। মনে প্রশ্ন জাগল—এ কোথায় এসে পড়লাম? ঘন পুরু তুষার যেন সব কিছু এলোমেলো করে দিল।

হঠাৎ মনে হল আমি হারিয়ে গেছি। বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। অন্য শিকারীরাও অনেক দূরে। চারদিক নিস্তব্ধ। ক্লান্ত আমি। সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তা। একেবারে ঘামতে শুরু করলাম। এখন যদি থেমে পড়ি ঠাণ্ডায় জমে যাব। মরে যাব। চলতে গেলেও যেটুকু শক্তি শরীরে আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। অসহায় আমি চীৎকার করতে শুরু করলাম। কিন্তু কোথাও কোন শব্দ নেই। আমার চীৎকারের উত্তরে কারো কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে না। আবার ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু পথ হারালাম। চারদিকে শুধু বনজঙ্গল।

দিক নির্ণয় করতে পরছি না। আবার ফিরে চললাম। অবসাদ গ্রস্ত পা দু'টো কাঁপছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে আজার্মাসে আর মস্কোতে রাত কাটাবার সময় যেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলাম, ঠিক তেমনি আতঙ্কগ্রস্ত হলাম। আজকের আতঙ্ক যেন সেদিনের শতগুণে বেশী। দম আটকে আসতে লাগল। হাত পা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। মৃত্যু এগিয়ে আসছে?

কিন্তু মৃত্যু তো আমি চাই না। তাহ'লে কেন এই মৃত্যু? মৃত্যু কি? ঈশ্বরের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর চেয়ে ইচ্ছে হচ্ছিল। তাঁকে তিরস্কার করি। কিন্তু বুঝলাম অতটা সাহস আমার নেই। ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি চলে না। সেটা ঠিকও নয়। ঈশ্বর তার যা বলবার বলেছেন। দোষ আমারই। তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম। আর নিজের ওপর ঘৃণা হল।

আতঙ্কের ভাবটা আর রইলো না। আমি ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলাম। তারপর হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুটা এগোতেই দেখি বন থেকে বাইরে যাবার একটি রাস্তা। বনের ধার থেকে বেশি দূরে যাই নি আমি। কিছুটা হেঁটে বাইরের বড় রাস্তাটায় এসে পড়লাম। তখনও আমার হাত পা কাঁপছে। যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। কিন্তু আমার অন্তর তখন আনন্দে শিহরিত। তারপর শিকারীদের সঙ্গে মিলিত হলাম। বাড়ি ফিরে এলাম। তখনও মন আমার আনন্দে পূর্ণ। বুঝলাম এই আনন্দের উৎস রয়েছে আমার মনে। নির্জনে বসে সেই উৎসকে খুঁজে দেখতে হবে।

খুঁজে বেরও করলাম।

আমার পড়ার ঘরে ব'সে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম। যে পাপ

করেছি সে সব মনে ভাবতাম। খুব বেশী যে পাপ কাজ করেছি তা নয় তবু সে সব ভাবতে বিশ্রী লাগত।

তারপর থেকেই আমি নিয়মিত বাইবেল পড়তে শুরু করলাম। 'ওল্ড-টেস্টামেণ্ট' ভালো বুঝতাম না। তবে ভালো লাগত। 'নিউ টেস্টামেণ্ট'এ সংকলিত যীশুর বাণী। তা আমাকে আবিষ্ট করত। মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করে আমি সান্ত্বনা পেতাম। ঐ মহান পুরুষদের জীবনের মধ্যে আমি এমন আদর্শের সন্ধান পেতাম যে আদর্শ অনুসরণ করা আমার পক্ষে কিছুটা সম্ভব ব'লে মনে হ'ত।

এরপর থেকে সাংসারিক কাজকর্ম, জমিদারির তদারকি, হিসেবটিসেব রাখা এসব কাজে আর আমার মন রইল না। এসব চিন্তাই আমার অসহ্য লাগত। একটা কথা আমি বুঝেছিলাম যে আমি যা চাই তা এসব নয় অথচ আমি যে সঠিক কী চাই তাও বোধগম্য হ'ত না। শুধু এটুকু বুঝেছিলাম যে আমি যা চাই তা আমার জীবনে খুঁজে পাচ্ছি না। একটা সম্পত্তি বিক্রীর ব্যাপারে উপলব্ধি করলাম এই সত্যটি।

সংবাদ পেলাম কাছেই একটা খুব লাভজনক সম্পত্তি বিক্রী হ'তে যাচ্ছে। এই তালুকের চাষীদের জমি শুধু বাড়ির লাগোয়া শাকসব্জির ক্ষেত। তাদের অন্য জমি নেই। সুতরাং মাঠে গরু ছাগল চরানোর বদলে কাজ করতে হবে জমিদারের জমিতে। বিনা মজুরিতেই। গেলাম সেই তালুকে। সুলুক-সন্ধান ক'রে জানলাম কথাটা সত্যি। এত সুবিধেজনক ব্যাপার জেনে সেই আগের দিনগুলোর মত খুশী হ'য়ে উঠলাম।

সব দেখেশুনে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে আসছিলাম। পথে এক বুড়ীর সঙ্গে দেখা। তার কাছে পথের কথা জানতে চাইলাম। এই নিয়ে কথা বলতে বলতে তার সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলাম। কথাবার্তার মধ্যে বুড়ী বলল তার দরিদ্র অবস্থার কথা। সবই বলল। বাড়ি এসে স্ত্রীকে বলতে গেলাম কেন ঐ সম্পত্তিটা কেনা লাভজনক। তখনই হঠাৎ আমি কেন জানি লজ্জিত বোধ করলাম। নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ হ'তে লাগলাম। সবশেষে আমি ব'লেই বসলাম যে ঐ সম্পত্তি আমি খরিদ করতে পারবো না। কারণ ঐ সম্পত্তি খরিদ করলে আমার যে লাভ হবে সেই লাভ আসবে ওখানকার দরিদ্র চাষীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নেওয়া থেকে, তাদের দুঃখ দিয়ে।

এই কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ একটা সত্য যেন আমার কাছে স্পষ্ট হ'ল।

সেই সত্য হ'ল যে ঐ গরীব চাষীরা আমাদের মতই বাঁচতে চায়। তারাও তো মানুষ। আমার ভাই। বাইবেলের বাণীতে পাই, তারাও সেই স্বর্গীয় পিতার সন্তান। একটা কিছু অনেক দিন ধ'রে আমার মনকে কষ্ট দিচ্ছিল, সেটা যেন তখন হঠাৎ মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবির্ভূত হল নবজাত শিশুর মত।

এ সময় আমার স্ত্রী আমাকে ভর্ৎসনা করল। তাকে আমার কিছুই এসে গেল না। আনন্দে আমার মনপূর্ণ হ'য়ে গেল।

আমার মানসিক অসুস্থতার এই শুরু। সম্পূর্ণ পাগল হয়েছি এরও মাস খানেক পরে।

তখন সকাল। গীর্জার উপাসনায় গেলাম, প্রার্থনা করলাম, ধর্মোপদেশ শুনলাম। মনটা শান্ত হ'য়ে এল। এ সময় ওরা আনল পবিত্র রুটি। ক্রুশ চুম্বন করতে গিয়ে উপস্থিত আমরা পরস্পর ঠেলাঠেলি শুরু ক'রে দিলাম। তখনই চেয়ে দেখি গীর্জার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, শীর্ণকায় কিছু ভিক্ষুক। সহসা আমার মনে হ'ল—এ তো হওয়া উচিত নয় অথচ তাই হচ্ছে। এ সব যদি না থাকতো তাহ'লে পৃথিবীতে মৃত্যু, ভয় ব'লে কিছুই থাকতো না। আমার মানসিক দ্বন্দ্বও থাকতো না। কোন কিছুতেই আমি ভীত হতাম না।

সেদিন আমার অন্তরে যেন এক জ্যোতির আবির্ভাব ঘটল। সেই থেকে আমার আজকের এই অবস্থা। পৃথিবীতে যদি ভীতি আর মৃত্যু ব'লে কিছু না থাকে তাহ'লে সে সব আমার মধ্যেও নেই। যখনই সেই গীর্জার দরজায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে যে পঁয়ত্রিশটা রুবল ছিল তা সেই দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিলাম। তারপর আমি রাস্তার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে বাড়িতে চলে এলাম।

চীনের গল্প

বিয়ের ফুল

লি ফু ইয়েন

বিবাহযোগ্য পাত্র হিসেবে উই কুতার উপযুক্ত পাত্রী পাচ্ছিল না। অবশ্য পাত্রী সে না দেখছিল তা নয়। কিন্তু সেইসব পাত্রীর খুঁত নিজেই বের করছিল। বিয়ের সম্বন্ধও ভেঙে যাচ্ছিল তাই।

সেটা ৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। উই কু একদিন যাত্রা করল সিঙহোর উদ্দেশে। পথে পড়ে সাঙচেউ শহর। শহরের দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথে এসে ও এক সরাইখানায় আস্তানা নিল। সেখানেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে উই কুর পরিচয়। ভদ্রলোকের কাছ থেকে খোঁজ পাওয়া গেল একটি পাত্রীর। প্রসিদ্ধ প্যান পরিবারের মেয়ে। উই কুদের মতোই কুলীন বংশ।

ঘটক উই কুকে বলল সে যেন পরদিন সকালে লাংসিঙ্ মন্দিরে তার সঙ্গে দেখা করে। বনেদী বংশের মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী। তার সঙ্গে বিয়ে। উই কু সারারাত ভালো করে ঘুমুতেই পারল না। ভোর হয়েছে কি না হয়েছে, ও বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। দাড়ি কামাল। স্নান করল। বেশ দামী আর সুন্দর পোশাক পরে সেই ভোরেই উই কু বেরিয়ে পড়ল।

আকাশে আধখানা চাঁদ, জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়। তখনও অন্ধকার ভাব কাটেনি।

উই কু মন্দিরে পেঁছিল। দেখল সিঁড়ির ওপর বসে একজন বৃদ্ধ চাঁদের আলোয় একটা বই পড়ছে। বৃদ্ধের পাশে একটা থলে। এইরকম একটা অদ্ভুত সময়ে ও পরিবেশে বৃদ্ধ কী পড়ছে? ওর খুব কৌতূহল হলো। বৃদ্ধের পেছন থেকে ও বইটা দেখল। কিন্তু কী ভাষায় বইটা লেখা বুঝে উঠতে পারল না। অথচ উই কু প্রায় সমস্ত রকম প্রাচীন ও মৃত ভাষা এমনকি সংস্কৃত পর্যন্ত শিখেছে।

উই কু এবার এগিয়ে এসে বিনীত ভঙ্গিতে বৃদ্ধকে বলল—যে বইটা পড়ছেন তার ভাষাটা কী দয়া করে বলবেন?

বৃদ্ধটি হেসে বলল—আপনার জানা কোনো ভাষায় এটা লেখা নয়।

এই ভাষার নাম কি?

—আপনি এই পৃথিবীর জীব। এই বইয়ের ভাষা অলৌকিক জগতের।

—তাহলে আপনি কি প্রেতাত্মা?

—হ্যাঁ।

—এখানে কী করছেন?

আমার এখানে আসতে আপত্তি কি! এখন রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণ। এই যে লোকজন পথ দিয়ে যাচ্ছে তার অর্ধেকই প্রেতাত্মা। তবে আপনি দেখে মানুষ আর প্রেতাত্মাদের পার্থক্য বুঝবেন না। আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষদের ঠিকানা আমি সারারাত্র পরীক্ষা করি।

—ঠিকানা পরীক্ষা করেন কেন?

—বিয়ের ব্যাপারে।

উই কুর কৌতূহল বাড়ল। বলল—একটা ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাই। আমি কত চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার যোগ্য কোনো পাত্রীর সন্ধান পেলাম না। এখানে আমি সেজন্যেই এসেছি। এক ঘটক ভদ্রলোকের এখানে আসার কথা। তিনি প্যান পরিবারে এক পাত্রীর খোঁজ আমাকে দিয়েছেন। মেয়েটি নাকি খুব সুন্দরী, রুচিশীলা ও চরিত্রবতী। এখন প্রশ্ন, এই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কিনা?

—আপনার নাম-ঠিকানা বলুন? বৃদ্ধটি বলল।

উই কু নাম ও ঠিকানা বলল। বৃদ্ধ বইটার পাতা ওল্টাতে লাগল। এক জায়গায় থামল। কী যেন দেখল। বলল—এখানে আপনার বিয়ে হবে না।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ, এই বইটিতে সব লেখা আছে। আমি হিসেবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি যাকে বিয়ে করবেন তার বয়স এখন তিন বৎসর। মেয়েটি সতেরো বছরে পড়লে আপনার সঙ্গে বিয়ে হবে। আপনি চিন্তা করবেন না।

—তার মানে? আমাকে এখনও চোদ্দ বছর অবিবাহিত থাকতে হবে?

—তাই-ই হবে।

—এই প্যান পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না?

—না।

উই কু বৃদ্ধের কথায় বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা বুঝে উঠতে পারল

না। বলল—আচ্ছা, আপনার ঐ ব্যাগে কী আছে ?

খুশীর হাসি হেসে বৃদ্ধ বলল—লাল রেশমী সুতো। তারপর বলতে লাগল—দেখুন এই আমার কাজ। যে ছেলের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে তাদের নাম সব এই বইটাতে লিখে রেখেছি। সদ্যোজাত ছেলেমেয়েরা যখন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায় তখন আমি রাতের বেলা বেরিয়ে গিয়ে ওদের পাগুলো এই লাল রেশমী সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে দিই। খুব শক্ত করে গিঁটটা বেঁধে দিই যাতে কেউ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ না আনতে পারে। তাদের একজন হয়তো গরীব পরিবারে জন্ম নিল, অন্যজন ধনী পরিবারে, অথবা দু'জনের মধ্যে হয়তো হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব অথবা দুজনের দুই পরিবারের হয়তো সদ্ভাব নেই। কিছুই এসে যায় না তাতে, শেষ পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী হবেই। এ নিয়ম লঙ্ঘন করার সাধ্য কারো নেই।

—তাহলে মনে হয়, আমার ভাগ্যও বেঁধে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, বেঁধে দিয়েছি।

—যাকে আমার স্ত্রী হিসেবে সুতোয় বেঁধে দিয়েছেন সে এখন কোথায় ?

—সে ঐ বাজারের এক তরকারিওয়ালীর সঙ্গে থাকে। কাছেই। তরকারিওয়ালী প্রত্যেক দিন সকালে বাজারে আসে। আপনার যদি কৌতূহল হয় একটু বেলা হলে গিয়ে দেখিয়ে দেব।

সকাল হয়ে গেছে। সেই ঘটক ভদ্রলোক এল না। বৃদ্ধ বলল, দেখলে তো, তোমার বিয়ে দেবে যে ঘটক সে এল না।

এবার দুজনে মিলে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করল। উই কু খুব খুশি হলো বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে। বৃদ্ধ বলতে লাগল, এ কাজটা আমার খুব পছন্দ। এক টুকরো রেশমী সুতোর কী ক্ষমতা। আমি স্পষ্টই দেখি সব। ছেলেটা আর মেয়েটা নিজেদের বাড়িতে বড় হলো। দুজনেই পরস্পরের অপরিচিত। কিন্তু যখন সময় এল-চার চোখ মিলল—ব্যস্, পরস্পরে প্রেমে পাগল তখন। কোনো বাধাই তখন তারা মানবে না। তৃতীয় কোনো ছেলে বা মেয়ে যদি তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় সে সুতোয় পা বেঁধে হোঁচট খাবেই। সুতোয় এমনভাবে জড়িয়ে যাবে সে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকে না। কতবার যে এরকম ঘটতে দেখেছি।

কিছুদূরেই সেই বাজারটা! বৃদ্ধ বলল উই কুকে-চলো। আমার পেছনে পেছনে এসো। বৃদ্ধ ব্যাগটা হাতে নিল।

বাজারে এল ওরা। বৃদ্ধ একটা দোকানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। দোকানে বসে এক তরকারিওয়ালী। তার মাথায় কোঁকড়া চুল। বুকে একটি শিশুকে ধরে ও তরকারি বিক্রি করছে।

—ঐ যে কোলের মেয়েটি। ওকেই তুমি একদিন বিয়ে করবে। বৃদ্ধ বলল।

উই কু বৃদ্ধের ওপর ক্রুদ্ধ হলো। অভিশাপ দিল। বলল আপনি কী বলছেন? এটা ঠাট্টার ব্যাপার, তাই না?

—ঠাট্টা নয়। তোমাকে এটুকু ভরসা দিতে পারি মেয়েটি খুব সুলক্ষণা, সৌভাগ্যবতী। বিয়ে হলেও তোমার সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনবে। পরে পুত্রের গৌরবে মেয়েটি সমাজে সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য হবে।

সেই হাড়-বের করা অনাথ শিশুটির দিকে উই কু তাকাল। খুব মন খারাপ হয়ে গেল ওর। হয়তো বৃদ্ধটির সঙ্গে ও এ ব্যাপারে ঝগড়া তর্ক করত। কিন্তু ফিরে চাইতেই দেখল বৃদ্ধটি নেই। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ও সরাইখানায় ফিরে এল। ভাবতে লাগল বৃদ্ধের কথা ও বিশ্বাস করবে কি করবে না? আমি যথেষ্ট বিত্তবান—ও ভাবতে লাগল। কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার যদি বিয়ে না হয় তবে অপেরা দলের কোন সুন্দরী মেয়েকে রক্ষিতা করে রাখব। একটা নোংরা অনাথ শিশুকে বিয়ে করবো? কী বিচ্ছিরি হাস্যকর ব্যাপার। চিন্তায় চিন্তায় ও সারারাত ঘুমুতে পারল না।

পরদিন। সকালে এক চাকরকে সঙ্গে নিয়ে উই কু বাজারে গেল। চাকরকে ও বলেছিল-যদি ঐ বাচ্চাটাকে ছুরি মেরে হত্যা করতে পারিস তবে মোটা বকশিস পাবি। তরকারিওয়ালী শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে দোকানে তরিতরকারি বিক্রি করছিল। সুযোগ বুঝে চাকরটা শিশুটিকে ছুরি মেরে পালাল। শিশু ককিয়ে কেঁদে উঠল। তরকারিওয়ালী চ্যাঁচাতে লাগল-খুন। খুন! এক মুহূর্তে ওখানে ভিড় জমে গেল। উই কু আর চাকরটা এর মধ্যেই গা ঢাকা দিল।

—ঠিকমতো ছুরি চালিয়েছিস্ তো? উই কু জিজ্ঞেস করল। চাকরটা বলল—না, পারি নি ঠিকমত ছুরি চালাতে। যখন তাক করছি তখনই বাচ্চাটা পাশ ফিরল। তখনই ছুরি চালালাম। বোধহয় বাচ্চাটার চোখের ভুরুর কাছে ছুরিটা লেগেছিল।

উই কু তাড়াতাড়ি সেই শহর ছেড়ে পালাল। সকলেই ভুলে গেল এই ঘটনাটা।

এখন উই কু রাজধানীতে থাকে। একটা বিয়ের প্রস্তাব এল। কিন্তু কথা পাকাপাকি হবার আগেই ভেঙ্গে গেল। উই কু যেন মেনেই নিল ওর ভাগ্যে বিয়ে নেই।

তিন বছর পরে প্রসিদ্ধ তান পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হলো। বাগ্‌দান পর্যন্ত হয়ে গেল। মেয়েটি বিদুষী এবং অপরূপ সুন্দরী। উই কুকে পরিচিতরা অভিনন্দন জানাল। উই কু বিয়ের তোড়জোড় শুরু করল। এক সকালবেলা হঠাৎ খবর এল, সেই মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। মেয়েটি নাকি অন্য একটি পুরুষকে ভালোবাসত।

উই কু বিয়ের আশা প্রায় ছেড়েই দিল। ওর বয়েস এখন আটাশ। কুলীন বংশে বিয়ে করা সম্পর্কে এখন ও মত পাল্টেছে।

একটা গ্রামের এক মন্দিরের সামনে একদিন উই কু দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে একটা কৃষকের মেয়েকে দেখে ও প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। মেয়েটিরও একই অবস্থা। দুজনের বাগ্‌দান হয়ে গেল। উই কু রেশমী পোশাক আর মূল্যবান গয়না কিনতে রাজধানীতে গেল।

ওখান থেকে ফিরে এসে দেখল তার প্রেমিকা মারাত্মক রোগে শয্যাশায়ী। প্রায় এক বছর মেয়েটি রোগে ভুগল। তার মাথার চুল উঠে গেল। অন্ধ হয়ে গেল সে। মেয়েটি উই কুকে বলল—তুমি চলে যাও। তোমার যোগ্য কোনো সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হও।

সাত বছর কেটে গেল। উই কুর জীবনে আর একবার বিয়ের সুযোগ এল। পাত্রীটি শুধু তরুণী আর সুন্দরীই নয়—শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের অনুরাগিণীও। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বাধা নেই। বাগ্‌দান হয়ে গেল। বিয়ের তিন দিন আগে আবার এক অঘটন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা মসৃণ পাথরে পা পিছলে মেয়েটি পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হলো। উই কুর মনে হলো সবই ভাগ্যদেবীর পরিহাস।

অদৃষ্টে বিশ্বাস করতে শুরু করল উই কু। সে শিয়াংচাউ-এ চাকরি নিল। বিয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিল। দিনরাত কাজেকর্মে মেতে থাকে। বিয়ের কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না। চাকরিতেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিল। খুশি হয়ে স্বয়ং জেলাশাসক তার নিজের ভাইঝির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব

আনলেন।

উই কুর মুখে যন্ত্রণাকাতরতা ফুটে উঠল। ও জেলাশাসককে বলল-আমার অনেক বয়েস হয়েছে। এ বয়েসে বিয়ে করাটা ভালো দেখায় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জেলাশাসকের পীড়াপীড়িতে উই কুকে সম্মত হতেই হলো। কিন্তু কোনো আবেগ বোধ করল না ও এ ব্যাপারে। বিয়ের আগে পাত্রীকে একবার দেখলও না।

উই কুর বিয়ে হয়ে গেল।

মেয়েটি তরুণী এবং সুন্দরী। এতে উই কু খুশি হলো। ঘরগেরস্থালির ব্যাপারে মেয়েটি খুব পটু বলে মনে হলো।

উই কুর নববধূ কপালের ডানপাশটা সব সময় চুল দিয়ে ঢেকে রাখে। এতে বৌকে ভালোই দেখায়। কিন্তু উই কুর মনে বিস্ময়ও জাগে।

কয়েক মাস কাটল। দু'জনের ভাব-ভালোবাসা গভীর হয়েছে। উই কু একদিন জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা সব সময় কপালের একটা পাশ চুল দিয়ে ঢেকে রাখো কেন?

বৌটি কপালের ওপর থেকে চুলের গোছাটা সরাল। বলল, দেখ।

উই কু দেখল ভুরুর কাছে একটা ক্ষতচিহ্ন।

—কী হয়েছিল। উই কু জিজ্ঞেস করল।

—আমার যখন বছর তিনেক বয়েস আমার বাবা তার অফিসে কাজ করতে করতেই মারা গেলেন। একই বছরে মা ও ভাই মারা গেল। তখন আমার দাই আমাকে নিয়ে এল। তার কাছেই রইলাম। সাঙ্‌চেঙ্‌-এর দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথের কাছে বাবার অফিস ছিল। অফিসের সামনের বাগানে শাকসবজির চাষ হত। আমার দাইমা ঐ শাকসবজি এনে বাজারে বিক্রি করত। একদিন একটা লোক আমাকে বিনা কারণে খুন করতে চেষ্টা করল। দাই-মা এর কারণ বুঝতে পারল না। কারণ আমাদের সঙ্গে কারো শত্রুতা ছিল না। লোকটা আমাকে খুন করতে পারল না। আমার ভুরুর কাছে ছুরি মেরেছিল। সেই ক্ষতচিহ্ন ঢাকতেই আমি কপাল চুলে ঢেকে রাখি।

—আমিই সেই লোক। উই কু বলল।

তার মানে?

—সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত। ভাগ্যদেবীর হাতে আমরা সবাই খেলার পুতুল। তারপর ও স্ত্রীকে সমস্ত ঘটনা বলল। স্ত্রী বলল, যখন আমার

বয়েস ছয় সাত তখন আমার কাকা সাঙ্‌চেঙ্‌-এ এসে আমাকে খুঁজে বের করে। তারপর থেকে আমি কাকার কাছেই থাকি।

তাদের বিয়েটা দৈবনির্ধারিত একথা জেনে উই কুর স্ত্রী তাকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসতে লাগল।

কিছুদিন পরে তাদের একটি ছেলে হলো। বড় হয়ে সেই ছেলে তাউয়্যানের জেলাশাসক হয়েছিল। আর ছেলের জন্যে মাও কম যশস্বিনী হয়নি।

ওদিকে সাঙ্‌চেঙ্‌-এর জেলাশাসক উই কুর জীবনের এই অদ্ভুত ঘটনার কথা জানতে পারলেন ভাইঝির মারফৎ। তিনি উই কু যে সরাইখানাটায় কিছুদিন ছিল সেই সরাইখানার নাম দিলেন—'পরিণয় আবাস'।

ইতালীর গল্প

লাল রেনকোট

আলবার্তো মোরাভিয়া

আমি বেকারীর দুঃসহ অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্যে যে কোনোরকম কাজ পেলেই করেছি। কী করিনি ? ফেরিওলাগিরি করেছি, বাড়ির কেয়ার টেকারগিরি, রেস্তোরাঁর বয়গিরি, রাস্তায় ঝাড়ুদারি আইসক্রিম বিক্রি সব করেছি কিন্তু বাঁধা মাইনের চাকরি কপালে জোটেনি।

সেদিন বেকার আমি বড় রাস্তার মোড়ে চোখ কান খোলা রেখে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কতজনের কত কথা কানে আসছিল। ও শর্তসাপেক্ষে ছাড়া পেয়েছে—এই—ঐ সোনালি চুলের মেয়েটাকে দ্যাখ—মেয়েটা লাজিয়োর কাছে দাঁড়াতেই পারে না—এমনি সব কথাবার্তা কানে আসছিল। বেকার আমি অগত্যা সময় কাটানোর জন্যে এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে টি-ভি দেখতে লাগলাম। টি-ভি দেখছি, এমন সময় কনুইয়ে ধাক্কা খেয়ে তাকালাম। দেখি—নার্দোন। বন্ধু নার্দোন সৎ এবং ওর কখনও চাকরি যায় না।

কী করছিস আজকাল ? নার্দোন জিজ্ঞেস করল।

দেখছিসই তো।

না-না, চাকরি-বাকরি কী করছিস ?

কাজের চেষ্টায় আছি।

চল, একটা কাজের কথা আছে।

সামনের কাফেটায় ঢুকলাম দুজনে। কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে নার্দোন বলতে লাগল– শোন, একটা বেসরকারী ডিটেকটিভ অফিসে কাজ করছি। অফিসের নির্দেশমত বিশেষ বিশেষ লোককে অনুসরণ করাই আমার চাকরি। আজকে একটা কাজ চেপেছে। একটি মেয়েকে অনুসরণ করতে হবে। মেয়েটি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের রক্ষিতা। ভদ্রলোকের সন্দেহ মেয়েটি বিশ্বাসঘাতিনী। অন্য কোথাও মেয়েটি ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায়। এখন এই মেয়েটির গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে। কিন্তু আমার মুশকিল হয়েছে আজকেই আমার

প্রেমিকাটি এখানে আসছে। সন্ধ্যেবেলাটা একসঙ্গে কাটাতে হবে। তুই আজকে আমার নজরদারির কাজটা চালিয়ে দে। সেই রক্ষিতা মেয়েটি কোথায় থাকে, ওর বাড়ি সব আমি দেখিয়ে দেব। তোর কাজ শুধু ওকে অনুসরণ করা। কোথায় যায়—কী করে এসব দেখা। তোকে তিন হাজার লিরা দেব আর অন্য সব খরচা। নার্দোন বলল—মেয়েটি তরুণী এবং বেশ সুন্দরী। আমি রাজী হয়ে গেলাম। বললাম—পারিশ্রমিকের সঙ্গে আরো কিছু দিতে হবে। নার্দোন আমাকে তিন প্যাকেট সিগারেট দিতে রাজী হলো। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পরদিন আকাশ অন্ধকার করে আছে দেখলাম। বুঝলাম বৃষ্টি হবে। একটা ছাতা নিয়ে বেরোলাম। নার্দোনের নির্দেশমত ভিয়া আর্কিমেদে গিয়ে হাজির হলাম। তখন ঠিক বেলা দুটো। নার্দোন ওখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। রাস্তার ওপারের একটা বিরাট দরজা দেখিয়ে নার্দোন বলল—মেয়েটি এই বাড়িটায় থাকে। ঐ দরজা দিয়ে বেরোবে। মেয়েটি অসম্ভব কুঁড়ে। বেলা একটা অব্দি বিছানায় পড়ে থাকে। তারপর বেরোয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোককে এ কথা সে কথা বলে বুঝিয়ে দেয়। তাই ভদ্রলোকের সন্দেহ তবে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

নানা কথাবার্তা বলে আমরা সময় কাটাতে লাগলাম। নার্দোন ওর অফিসের বিচিত্র কাজকর্মের কথা বলতে লাগল। এক সময় হঠাৎ আমার কনুইয়ে গুঁতো মেরে বলল—ঐ দেখ,মেয়েটা বেরোচ্ছে, আমার ঠিক তখনই হাঁচি এল। মাথা নিচু করে হাঁচলাম। মাথা তুলে দেখি—মেয়েটি বাসস্টপের দিকে হাঁটছে। গায়ে আগুন-রঙা লাল রেনকোট। নার্দোন আমার হাতে তিন প্যাকেট সিগারেট গুঁজে দিল। বলল—যা, যদি অনেক রাত পর্যন্ত তোকে অনুসরণ করতে হয়, তবে আমাকে ফোন করিস। আমি তখন চলে আসতে পারবো। তোর তখন ছুটি।

ঠিক আছে। বলেই মেয়েটির পেছনে ছুটলাম। কিন্তু মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম না। কারণ তখনই বাসটা এসে স্টপে দাঁড়াল। মেয়েটি বাসে উঠল। সেই সঙ্গে অনেক যাত্রীও। সবাই উঠে গেছে তখন। সবশেষে আমি কোনরকমে লাফিয়ে পা দানিতে উঠলাম। বেশ ভিড়ের বাস। বাস চলল। ভেবে দেখলাম—এই ভিড়ে মেয়েটির কাছে যাওয়া প্রয়োজন নেই। কারণ ভিড় ঠেলে ওর কাছে পেঁছিতে পেঁছিতে ও হয়তো নেমে যাবে। কিন্তু এখানে

থাকলে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গেই নামতে পারবো। পাদানিতেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পিয়াজেল ফ্লামিনিয়োতে এলাম। লক্ষ্য রাখছি। কয়েকজন যাত্রী নামল। তারপরই সেই আগুন—রাঙা রেনকোট। মেয়েটি নামল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে ওর পিছু নিলাম।

মেয়েটি টাইবারের দিকে এগিয়ে চলল। আমিও পেছনে পেছনে চললাম। রেনকোটের মধ্যে দিয়ে মেয়েটির পেছনটা দেখতে পাচ্ছিলাম। বেশ পাকা শক্ত শরীর মেয়েটির। হাঁটার তালে তালে রেনকোটের মধ্যে দিয়ে ওর সুগঠিত নিতম্ব নড়ছিল। বেশ দ্রুত, দৃঢ় পদক্ষেপ ওর। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর পাশাপাশি সমান্তরালে এলাম। এবার দেখলাম মেয়েটিকে। ফর্সা। মাথায় কোঁকড়ানো সোনালি চুল রেনকোটের টুপির মধ্যে থেকে বেরিয়ে কাঁধে ছড়ানো। মুখটা সুন্দর হলেও একটু ভেতরে ঢোকানো। রেনকোটটা ওর বুকের কাছে উঁচু হয়ে আছে। পাথর কাটা মূর্তি যেন। এরকম একটা তেজী টগবগে মেয়েকে একটা প্রৌঢ় ভদ্রলোক সামলাবে কি করে?

দ্রুত পদক্ষেপে মেয়েটি লুনগোডিভেরের দিকে বাঁক নিল। সারি সারি বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে লাগল। একটা বেশ আধুনিক ঢঙে তৈরী ফ্ল্যাট বাড়ির দরজা দিয়ে ও ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমিও পেছনে পেছনে ঢুকলাম। ও গিয়ে লিফটের সামনে দাঁড়াল। আধুনিক নাচের বাক্সের মত লিফটটা নেমে এল। মেয়েটি লিফটে ঢুকল। আমিও ঢুকলাম। লিফটম্যান থাকে না এসব লিফটে। মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি কোন তলায় যাবেন? ওর নরম ছেলেমানুষের মত কণ্ঠস্বর ওর চেহারার বিপরীত। তাড়াতাড়ি বললাম সবচেয়ে ওপরের তলায়। মেয়েটি বোতাম টিপল। এখন খুব কাছাকাছি দুজনে। মেয়েটি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। চারতলায় মেয়েটি নেমে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে চারতলায় নেমে এলাম। তখনই দেখলাম মেয়েটি আট নম্বর ফ্ল্যাটটায় ঢুকছে। দরজাটা বন্ধ হলো। ফ্ল্যাটের বাইরের পেতলের ফলকে নাম লেখা—ইনোসেন্তি। একতলায় নেমে এলাম। বেফয়দা কিছুক্ষণ বাড়িটার কেয়ার-টেকারের খোঁজ করলাম। পেলাম না। বাইরে বেরিয়ে টাইবারের কাছে বাড়িটার ঠিক উল্টোদিকে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ালাম।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে তখন। ছাতাটা খুলে মাথায় দিলাম। আমি প্রথম সিগারেট ধরালাম। বুঝলাম, কিছুক্ষণ এভাবেই অপেক্ষা করতে হবে।

এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা বেশ কঠিন বুঝলাম। তিন হাজার টাকায় এ কাজ পোষায় না। এক নজর টাইবার নদীটার দিকে তাকিয়ে নিলাম। নদীটায় বান এসেছে। হলদে জল ফুঁসে উঠেছে। আকাশটা কালো। ওপরের হালকা সবুজ পাতাঅলা গাছগাছালি।

প্রায় তিন ঘণ্টা এভাবে কাটল। ততক্ষণে তিনটে সিগারেট খাওয়া হয়ে গেছে। এবার কেয়ার-টেকারকে পাওয়া গেল। লোকটা রোগাটে, তবে শক্তসমর্থ। ছাই রঙের একটা উর্দি আর উচুঁ টুপি পরা। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেঘলা আকাশটা দেখছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— আচ্ছা ইনোসেন্তি নামে কোনো উকিল কি এ বাড়ির কোনো ফ্ল্যাটে থাকেন? ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বলে চললাম—বয়েস প্রায় ষাট, মাথায় টাক, চশমা পরেন আর নাকের ডগায় একটা আঁচিল।

লোকটা সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—চারতলার আট নম্বর ফ্ল্যাটে ইনোসেন্তি নামে একজন থাকে। সে শক্তসমর্থ যুবক—বয়েস তিরিশ। ও খেলা পাগল, রেসিং কারই ওর নেশা। তারপর আঙুল তুলে রাস্তায় দাঁড়ানো একটা লম্বাটে রেসিং কার দেখিয়ে বলল—ওটা ইনোসেন্তির গাড়ি। গাড়িটা আগুন-রঙা লাল। মেয়েটির রেনকোটের মতো রঙ।

লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—আমি বোধহয় তাহলে ভুল করেছি। আবার রাস্তার ওপাশে পাঁচিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম যাতে কেয়ার-টেকারের নজরে না পড়ি। তিরিশ বছর বয়সের খেলা-পাগল যুবক! হুঁ, বেশ বাবা। এবারে বোঝা গেল কেন তুমি বেলা দুটোর সময় বাড়ি থেকে বেরও। বাঃ, খাসা!

আমি নোটবই বের করলাম। নাম-ঠিকানা সব লিখে রাখলাম। আবার প্রতীক্ষা। ঝিরঝির বৃষ্টি তখনও চলছে। ছাতায় মাথা ঢেকে সদর দরজার দিকে নজর রেখে চলেছি। কতক্ষণ? প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক তো হবেই। একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে কোনো খবরের কাগজ আনিনি যে পড়বো। শুধু রাস্তা দিয়ে দ্রুত ধাবমান গাড়িগুলো দেখছিলাম। আট নম্বর ফ্ল্যাটে এখন কী ঘটছে। আমি হতচ্ছাড়া এখানে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আর ওখানে না জানি কত লীলাখেলা চলছে। কত আদর-সোহাগ, চুম্বন, মিঠে মিঠে কথা, ল্যাপটালেপটি, মদখাওয়া, আরও কত কি। এই বিশ্রী আবহাওয়াতেই তো প্রেম জমে। জানলার কাচ নামানো, প্রায়

অন্ধকার। বিছানায় গভীর আলিঙ্গনে দুজন, বাইরে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ। কী কপাল ওদের! আর আমার কাজটা কী জঘন্য।

প্রথম সিগারেটের প্যাকেটটা শেষ। আমি এবার কিছুটা জায়গা জুড়ে পায়চারি করতে লাগলাম। শুধু ঐ মেয়েটি আর যুবকটির কথাই ভাবছিলাম ভীষণ রাগ হলো হঠাৎ। নোটবইটা বের করে লিখলাম—আর গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন নেই। মেয়েটি সম্পূর্ণ বিকেল একটি যুবকের ফ্ল্যাটে কাটিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণ আছে—এটুকুই যথেষ্ট।

হে ভগবান সাড়ে সাতটার সময় সেই লাল রেনকোটের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মেয়েটি দ্রুত এগিয়ে চলল। বেশস্বস্তির সঙ্গে আমি ওকে অনুসরণ করতে লাগলাম। এতক্ষণের প্রেমলীলাতেও মেয়েটি ক্লান্ত হয়নি। ও শহরের কেন্দ্রস্থলে যাওয়ার একটা গাড়ীতে লাফিয়ে উঠল, আমিও উঠলাম ঠিক পেছনে। বাসটায় ভিড় ছিল। আমি ঠিক ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বোধহয় ওর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষিটা একটা বেশি হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি সেই ছেলেমানুষি গলায় বিরক্তির সঙ্গে বলল, দয়া করে একটু সরে দাঁড়ান। আমি যথাসাধ্য পেছনে সরে এলাম। হুঁ, ছেনালি। ইনোসেন্সির বেলায় কোনো দোষ নেই আমার বেলায়ই যত…। তা ছাড়া তোমাকে তো সোনা যে কেউ পয়সা দিয়ে কিনতে পারে।

অবশেষে মেয়েটি নামল পিয়াজা কলোন্নায়। আমি পেছনে আছি। একটা গলিতে ঢুকল ও। তারপর একটা পুরনো বাড়িতে ঢুকে পড়ল। আমি দরজার বাইরের এক গাদা নামের ফলক পড়তে লাগালাম। বুঝলাম—ভেতরে নাচের স্কুল আছে, হোটেল আছে পোশাকের দোকান আছে। বাড়ীটা খুব ভালো নয় এটা বুঝলাম। মাঝে মধ্যে অনেক সুন্দর মেয়ে আসছে ঢুকে পড়ছে বাড়িটায়। কখনও যুগলে। সামনের ঘরের শেষের দিকে একটা কাচের ঘরে এক বুড়ি বসেছিল। সেই এই বাড়ির কেয়ার টেকার। তাকে এ মেয়েটির বর্ণনা দিয়ে বললাম সোনালি চুল এমন কোনো মেয়ে কি এখানে আসে? বুড়িটা আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। বলল—বাপু হে, কত মেয়েই তো আসে। কী করে বলবো?

কাজেই আবার প্রতীক্ষা। এ ছাড়া উপায় কি। এর মধ্যে একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। পকেটে পান রুটিও ছিল। অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখানে অনেক লোকজনের চলাচল। দেখে দেখে সময় কাটছে। মাঝে মাঝে

লাল রেনাকাট পরা মেয়েটির কথা ভাবছিলাম ওপর থেকে বোঝা যায় না মেয়েটির ক্ষেত্রে এরকম গভীর ব্যাপার কিছু আছে। শুধু ইম্রোসেস্তি নয়, আরো কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে এর মধ্যে। ভগবান জানে সে ব্যাপার কী?

শেষ পর্যন্ত মেয়েটি বেরিয়ে এল। আমিও পিছু নিলাম।

মেয়েটি উল্টোদিকের বাসে চাপল। আবার আগের জায়গায় ফিরে এল। আবার ইম্রোসেস্তির ফ্লাট বাড়িটায় ঢুকে পড়ল। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখন প্রায় নটা বাজে। তোড়ে বৃষ্টি এল। দমকা বাতাস ছুটেছে। বৃষ্টি আছড়ে পড়েছে মুখে। তখন আমি নার্দোনে, ওর এই গোয়েন্দাগিরির কাজ, রেনকোট পরা মেয়ে, সব কিছুকে শাপ শাপান্ত করছি। শালা আমি এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আর ওরা নিশ্চয়ই খাবারের টেবিলের সামনে এসে প্রেম করছে। আদুরে গলায় বলছে—এটা খাও সোনা, মদটুকু খাও লক্ষ্মীটি—এসব করেছে। তারপর শুরু হবে প্রেমের খেলা। ধুস্ শালা—নিকুচি করেছে। ন্যায়বিচার বলতে শালা কিছু নেই।

তারপর এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে একটা কাছাকাছি গ্যারেজে গেলাম। ওখান থেকেও দরজার দিকে নজর রাখতে পারছিলাম। তখন মাঝরাত। নার্দোনকে টেলিফোন করলাম। বললাম—এখানে খুব ফুর্তিফার্তা চলছে। খানাপিনা মজা লোটা সবই চলছে। এখন তুই আয়—নইলে এসব ছেড়ে ছুড়ে আমি চলে যাবো। নার্দোন বলল—আসছি। প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে ও এসে হাজির হলো। তাকে আমার নোটবইয়ে টোকা মন্তব্যগুলোসহ পাতাগুলো ছিঁড়ে ওকে দিলাম। কয়েকটা মন্তব্যও করলাম সেই সঙ্গে। তারপর বাড়ি ফিরে সোজা বিছানা নিলাম।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। নার্দোনের সঙ্গে দেখা হয়নি। ও আমার গোয়েন্দাগিরির জন্যে তিন হাজার লিরা দেবে বলেছিল। তাও যখন পেলাম না তখন আমি ওকে টেলিফোন করলাম। নার্দোন আমাকে আর্কেডে আসতে বলল। সেখানে যেতেই ওর সঙ্গে দেখা হলো। ও আমাকে দেখেই বলে উঠল অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে আমাকে প্রায় ডুবিয়েছিলি। আমি এ কথার কারণ জানতে চাইলাম। ও বলল—আমি যে মেয়েটিকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, তুই তাকে অনুসরণ করিসনি—অন্য কাউকে অনুসরণ করেছিলি।

অসম্ভব।

উঁহু, তাই সম্ভব হয়েছে। তুই যে মেয়েটির পিছু নিয়েছিলি সে একজন নার্স?

হ্যাঁ, একজন পাস করা নার্স।

কিন্তু ইনোসেন্সি? সেই যুবকটি?

ব্যাপারটা কী হয়েছে জানিস? ইনোসেন্সির বুড়ী মা ভীষণ অসুস্থ। মেয়েটি তাকেই সেবাযত্ন করছিল। খানাপিনা প্রেমলীলে করতে যায়নি। মরার আগে পর্যন্ত বুড়ির সেবাশুশ্রূষা করছে ও। বেলা তিনটে নাগাদ বুড়ি মারা যায়। তখন মেয়েটি বিছানার কাছ ছেড়ে ওঠে।

আমি হতবাক।

মেয়েটি কোথায় থাকে জানিস? নার্দোন বলে চলল—যে বাড়িটা তোর ভালো জায়গা নয় বলে মনে হয়েছিল, সেই বাড়িতে বেশ সাজানো গোছানো একটা ঘরে ও থাকে। যাকগে, তোকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুই পাক্কা গোয়েন্দার মত কাজ করেছিস।

আমি বেশ রেগে গেলাম। মনে হলো আমি যেন মাথায় একটা ঘা খেয়েছি। কিন্তু জানতে কৌতূহল হলো এরকম একটা ভুল করলাম কী করে। তারপর হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। সেই রক্ষিতা মেয়েটির মুখটা তখন আমি ভালো করে দেখতে পাইনি। ও বাসে উঠলে পেছনে আমিও উঠেছিলাম। তখন ভিড়ের মধ্যে সেই একই রকম আগুন-রঙা রেনকোট পরা নার্সটির দিকে আমার নজর পড়েছিল। আর আমিও একটা একরোখা ষাঁড়ের মতো ঐ রেনকোট দেখে নার্সটার পেছনেই ধাওয়া করলাম।

তুই এসব জানলি কী করে? আমি জিগ্যেস করলাম।

এসব আমি ঐ নার্সটার কাছ থেকেই জেনেছি। তুই ভুল মেয়ের পেছনে ছুটেছিস দেখে আমিই আগ বাড়িয়ে নার্স মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলাম। গোয়েন্দাগিরির সব ব্যাপারটা ওকে বললাম।

তখন মেয়েটি সব কথা আমাকে বলল। যে লোকটা আমার পিছু নিয়েছিল তার কথা আমার মনে আছে। বাসের মধ্যে অভদ্র আচরণ করায় তাকে সরে যেতে বলেছিলাম। এই কথা বলে নার্দোন বলল, সত্যি তোর কাছে এটা আশা করিনি। গোয়েন্দাগিরি একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে পারিস-জনহিতকর কাজ।

আমি সজোরে প্রতিবাদ জানালাম—মেরীর দিব্যি—কথাটা মিথ্যে।

দ্যাখ, পুরুষের শিকারী স্বভাব—নার্দোন বলে চলল—তোর প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল মেয়েটি ভদ্রঘরের না। এসব আগে থেকেই ভেবে নেওয়া ভালো নয়। যাক গে, এই নে এক হাজার লির‍্যা আর এক প্যাকেট সিগারেট। এর বেশী আর কিছু দেওয়া চলে না।

জাপানের গল্প

ওতোমির কুমারীত্ব

র‍্যুনোসুকে আকুতাগাওয়া

১৮৬৮ সালের ১৪ই মে দুপুরের একটু পরে এডো শহরে একটা নোটিশ সাঁটা হলো। তাতে লেখা—আগামীকল্য প্রত্যুষে রাজকীয় বাহিনী তোই পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত 'সোগিনতাই' আক্রমণ করিবে। অসামরিক জনসাধারণ যেন য়ুনো অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যে কোনো স্থানে সম্ভব আশ্রয় গ্রহণ করে।

মাইচোমে অবস্থিত মুদিখানাঅলা মাসেৌব কোগয়ার পরিতক্ত্য বাড়িটার রান্নাঘরের কোণায় একটা সামুদ্রিক খোলের সামনে গুটিসুটি মেরে বসে ছিল একটা বেড়াল। কেঠোর পিঠের মত ওটার গায়ের রঙ। বাড়িটার জানালা দরজা এমন শক্ত করে আঁটা হয়েছিল যে একেবারে দিনের বেলায়ও বাড়ির ভেতরটা ছিল অন্ধকার আর শান্ত। একমাত্র শব্দ ছিল বৃষ্টিপাতের। কয়েকদিন ধরেই এই বৃষ্টি চলছে। কখনো কখনো মুষলধারে বাড়িটার ছাতে বৃষ্টি পড়ছিল। যখনই শব্দটা বাড়ছিল তখনই বেড়ালটা হলদেটে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল, চোখ দুটো থেকে অশুভ আলোর দ্যুতি ঘরটায় বেরিয়ে আসছিল। ঘরটা এত অন্ধকার ছিল যে স্টোভটাকেও আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। যখন বেড়ালটা বুঝল যে অবস্থার কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে না শুধু বৃষ্টিপাতের শব্দ ছাড়া তখন ওটা স্থির হয়ে দাঁড়াল। চোখদুটোকে করল সুতোর মতো সরু।

বারবার এইরকম করতে করতে ওটা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কারণ অল্পক্ষণের মধ্যে ওটা খোলা চোখ একেবারে বন্ধ করে ফেলল। থেকে থেকে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। তিনটে বাজে···চারটে বাজে···বৃষ্টির শব্দের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে চলল গোধূলির দিকে।

যখন পাঁচটা বাজল, বেড়ালটা হঠাৎ গোল গোল চোখ করে তাকাল— তারপর সরু করল চোখের দৃষ্টি যেন কিছু একটা ওটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বৃষ্টি থেমে গেল। আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। শুধু রাস্তায় চলাচলকারী সিডন গাড়ির গাড়োয়ানদের চীৎকার ছাড়া। কয়েক সেকেন্ড

নীরবতার পর হঠাৎ রান্নাঘরটা স্বল্প আলোকিত হলো। প্রত্যেকটি জিনিসই দেখা যেতে লাগল—স্টোভ, ঢাকনা-ছাড়া পাত্রে চকচকে জল, রান্নাঘরে রক্ষিত পবিত্র বেদী, স্কাইলাইট খোলার দড়ি। বেশ অস্বস্তির সঙ্গে বেড়ালটা তার বড় শরীরটা তুলল। তারপর বাইরের দরজার দিকে তাকাল। দরজাটা তখন সবেমাত্র খোলা হয়েছে।

শুধু বাইরের নয়, ভেতরের কাগজের দরজাটাও খুলল এক ভিখিরী। একেবারে জলেচুবোনো ইঁদুরের মতো ওর অবস্থা। ওর গলায় একটা পুরোনো তোয়ালে জড়ানো। সেই তোয়ালে জড়ানো গলাটা ও বাড়াল। চুরি করে মনোযোগের সঙ্গে শুনতে চেষ্টা করল শান্ত বাড়িটার কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে কি না। বাড়িটায় জনপ্রাণী নেই এটা নিশ্চিত বুঝে ও রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। ওর জলে ভেজা নতুন খড়ের বর্ষাতিটা চকচক করে উঠল। কান নেড়ে বেড়ালটা কয়েকপা গুটিয়ে গেল। সেই সময় বেড়ালটার দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়ে ভিখিরীটা কাগজের দরজাটা পেছনে বন্ধ করল আর গলায় জড়ানো তোয়ালেটা খুলে ফেলল। ওর আ-ছাঁটা মাথার চুল লম্বা। ও মুখে কয়েকটা কাগজের আঠা লাগানো ব্যাণ্ডেজ। যদিও লোকটা খুবই নোংরা তাহলেও বেশ সুগঠিত শরীর।

পুষি, পুষি—ও মৃদুস্বরে ডাকল। টপ টপ করে জল ঝরছিল ওর মাথার চুল আর মুখ থেকে। মাথার চুল মুখ মুছল ও। বেড়ালটা কানদুটো নাড়ল যেন ওর গলার স্বরটা চিনতে পেরেছে। কিন্তু একই জায়গায় বেড়ালটা বসে রইল আর মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধভাবে ভিখিরীটার দিকে তাকাতে লাগল। এরমধ্যে ভিখিরীটা গায়ের বর্ষাতিটা খুলে ফেলল। বেড়ালটার সামনে মেঝেয় বসল পা দুটো আড়াআড়ি করে। পা এত কাদামাখা যে ওর হাঁটু অব্দি পায়ের রঙ দেখাই যাচ্ছে না।

কেমন আছিস রে পুষি? ও জিজ্ঞাসা করল। নিজের মনেই হেসে নিয়ে বেড়ালটার মাথায় আস্তে আস্তে চাপড় দিতে দিতে ও বলল—কারুক্কেই এখানে দেখছি না। ওঁয়ারা তোকে বিপদে ফেলে পালিয়ে গেছে। এক সেকেণ্ডের জন্য মনে হলো বেড়ালটা গুটিগুটি উঠে দাঁড়াচ্ছে লাফ দেবার জন্য। কিন্তু ওটা লাফ দিয়ে সরে গেল না। বরং বসেই রইল। কিন্তু ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি সরু করতে লাগল। ভিখিরীটা এবার বেড়ালটার মাথায় মৃদু চাপড় দেওয়া বন্ধ করে একটা তেলতেলে পিস্তল বের করল। সেই গোধূলির মৃদু

আলোয় পিস্তলের ট্রিগারটা পরীক্ষা করতে লাগল। ভিখিরীটা পরিত্যক্ত একটা বাড়ির রান্নাঘরে বসে এই যুদ্ধের হুমকির পরিবেশে পিস্তল নাড়াচাড়া করেছে এটা নিঃসন্দেহে একটা অস্বাভাবিক মজাদার দৃশ্য। তবু ও চোখ দুটো সরু করে, পেছনটা উঁচু করে বেড়ালটা উদাসভাবে বসে রইল যেন ও গোপন সবকিছুই জানে।

এই পুষি—ভিখিরীটা বেড়ালটাকে বলল—কালকে এই তল্লাটে গুলি বৃষ্টি হবে রে। যদি তোর গায়ে গুলি লাগে তুই মরবি। কী কাণ্ডটাই না হবে! তুই বাড়ি ছেড়ে বেরোস না—মেঝের নীচে লুকিয়ে থাকিস। বুঝলি—আমরা বন্ধু—কিন্তু এটাই বোধহয় আমাদের শেষ দেখা। কথাটা ও পিস্তলটা পরীক্ষা করতে করতে বেড়ালটাকে মাঝে মাঝে বলতে লাগল—কালকের দিনটা তোর আমার দুজনের পক্ষেই খারাপ। কালকে আমিও মরে যেতে পারি। যদি আমি অক্ষতও থাকি আমি তোর জন্যে স্তূপাকার রাবিশ ঘাঁটতে যাবো না। তুই খুব খুশি হবি—তাই কি না।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির শব্দ জোরালো হলো। মেঘ এত নিচে জমে এসেছে যে ঘরের ছাতের টালিগুলো আবছা হয়ে গেছে। গোধূলির যে আলো এতক্ষণ ছিল তা কমে এল—আগের চেয়ে ম্লান হয়ে গেল। ভিখিরীটা পিস্তলটা পরীক্ষা করা শেষ করে এবার মুখ নিচু করে ওটাতে গুলি ভরতে লাগল।

—আমি যখন চলে যাবো তখন কি তোর মনে দুঃখটুঃখু হবে? ভিখিরীটা বলে চলল—না। লোকে বলে বেড়ালেরা তিন বছরে দয়ামায়াও ভুলে যায়। মনে হয় তোকেও বিশ্বাস নেই—যাকগে ওটা কিছু না—কিন্তু আমিও যখন চলে যাবো…

হঠাৎ ভিখিরীটা চুপ করে গেল। বাইরের দরজার ওপাশে ও কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ও ভাবল পিস্তলটা রেখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজার কাছে কেউ এসেছে। যখনই ও ফিরে তাকাল তখনই পেছনের দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে গেল। চিন্তার চেয়েও দ্রুত ও আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হলো আর একটু পরেই ভিখিরী আর এক আগন্তুক পরস্পরের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল।

আগন্তুক মেয়েটি ভিখিরীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। মেয়েটি যুবতী। খালি পা। হাতে একটা ছাতা। মেয়েটির তখনই একবার ইচ্ছে হলো, বাইরের বৃষ্টির মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু

প্রথম বিস্ময়ের রেশ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ও সাহস বজায় রাখল। রান্নাঘরের মৃদু আলোয় ও ভিখিরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বোবা বিস্ময়ে ভিখিরীটা মেয়েটির কাছে এসে ওকে লক্ষ্য করতে লাগল। কিমোনো পোশাকের মধ্যে ওর হাঁটু উঁচিয়ে রইল। ওর দৃষ্টিই বুঝিয়ে দিল ও নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। কিছুক্ষণ দুজনেই নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—তুমি শিৎকো– তাই না ? মেয়েটি একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ওহ্, আমাকে মাফ কর—দাঁত বের করে হেসে ভিখিরীটা বলল। কয়েকবার মেয়েটির দিকে ওর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—ভীষণ বৃষ্টি। বাধ্য হয়ে তোমাদের অনুপস্থিতিতে এই বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। আমি ছিঁচকে চোর নই—নিশ্চিত থাক।

—আমি সত্যি অবাক হয়ে গেছি। যদি তুমি ছিঁচকে চোর না-ও হও তোমার ধৃষ্টতা অনেকদূর এগিয়েছে– বিরক্তির সঙ্গে মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল। তারপর ছাতা থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললল– এখন বেরোও এখান থেকে আমি ভেতরে যাবো।

—হ্যাঁ তোমার হুকুমের দরকার নেই। আমি চলে যাবো। এখনও তোমরা কোথাও আশ্রয় নাওনি ?

হ্যাঁ, আশ্রয় নিয়েছি। কেন নয় ? কিন্তু তাতে কী হয়েছে ?

—তাহলে তুমি কিছু ফেলে চলে গিয়েছিলে ? এখন তাই এখানে এসেছো। ওখানে বৃষ্টি চলেছে বোধহয়।

যেন এখনও রেগে আছে এই ভঙ্গিতে কথাটার কোনো উত্তর না দিয়ে মেয়েটি রান্নাঘরের মেঝেয় বসে পড়ল। নিজের নোংরা পা দুটো সাবান জলে ধুতে লাগল। তখন দু পা আড়াআড়ি করে আরামে বসে-থাকা ভিখারী স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিব দিকে তাকিয়ে রইল আর খসখসে দাড়িঅলা থুতনিতে হাত বুলোতে লাগল। মেয়েটি গোলগাল। গায়ের রং তামাটে। গেঁয়ো গেঁয়ো চেহারা। নাকে ব্রণ। পরণে ঘরে তৈবি পোশাক। যুবতী ঝিয়েরা যেমন পরে। ওর প্রাণবন্ত ভঙ্গি আর শরীরেব আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।

এই ডামাডোলের মধ্যে তুমি যখন ফিরে এসেছো তখন নিশ্চয়ই খুব দরকারী কিছু ফেলে গেছ —ভিখিরীটা বলতে লাগল– কী ফেলে গেছ ? এ্যাঁ ? ওতোমি সান ?

—নিজের চরকায় তেল দাও। প্রথমেই এখান থেকে বেরোও—আমি বলছি। ওতোমির কথা একেবারে চাঁচাছোলা। ওতোমি গম্ভীরমুখে ওর দিকে তাকাল। বোঝা গেল ও অন্য কিছু ভাবছে।

—শিংকো—ওতোমি বলল, তুমি জানো আমাদের পুষিটা কোথায় ?

—পুষি ওটা তো এক্ষুণি এখানে ছিল—চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ভিখিরীটা বলল—ওহ্ কোথায় যেতে পারে ?

ওদের অলক্ষ্যে বেড়ালটা তখন শেল্‌ফ-এর ওপর বেয়ে উঠেছে। গুটিসুটি বসে আছে একটা মাটির পাত্র আর লোহার পাত্রের মাঝখানে। শিংকো ওটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওতোমি দেখল, সঙ্গে সঙ্গে ওতোমি হাতলঅলা ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলল আর ভিখিরীর উপস্থিতিটা ভুলে গিয়ে মেঝেয় উঠে দাঁড়াল। উজ্জ্বলভাবে হেসে ও সেলফে-বসা বেড়ালটাকে ডাকল। শিংকো ওর কৌতূহলী দৃষ্টি বেড়ালটা থেকে ওতোমির দিকে ফেরাল।

—ও মেয়ে—এই বেড়ালটাকেই কি তোমরা ফেলে গিয়েছিলে ?

—কেন নয় ? পুষি—পুষি। নেমে আয়। ওতোমি ডাকল।

শিংকো হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল। ওর হাসির শব্দ বৃষ্টির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। খুব আশ্চর্য হয়েও ওতোমি আবার বিরক্ত হলো। ওর গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। ও চেঁচিয়ে বলল—তুমি হাসছো কেন ? বেড়ালটা রেখে গিয়ে পর্যন্ত কর্তামা খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। সর্বক্ষণ কাঁদছেন। কর্তামার জন্যে দুঃখ হলো। তাই না আমি সারা রাস্তা বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ফিরে এসেছি···

—ঠিক আছে। আমি আর হাসবো না—তবু শিংকো হেসে চলল। ওতোমির কথা থামিয়ে দিয়ে শিংকো বলে উঠল—আমি আর হাসবো না। কিন্তু ভেবে দেখ, কালকেই যুদ্ধ শুরু হবে। তখন তুচ্ছ দু একটা বেড়াল—মজার ব্যাপার—যে কেউ তাই ভাববে। তুমি এখানে আছো তবু তোমাকে বলছি—তোমার কর্তামা যুক্তিটুক্তি মানেন না। আর স্বার্থপরও। এরকম স্ত্রীলোকের কথা আমি আগে শুনিনি। প্রথমতঃ পুষিটাকে খুঁজে বের করার জন্যে···

চুপ কর। ওতোমি শাসানির দৃষ্টি মেলে আর্তস্বরে বলে উঠল—তুমি আমার কর্তামার বদনাম দিচ্ছো—এটা আমার ভালো লাগছে না।

যেমন আশা করা যায়, ওতোমির শাসানিতেও ও চমকে গেল না। উল্টে ও

ওতোমির দিকে কড়া চোখে তাকাল। ওতোমির কিমোনো পোশাক আর পেটিকোট ভিজে ওর গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। ওর নরম কুমারী শরীরের নগ্নতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিংকো ওতোমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে হেসে হেসে কথা বলে চলল—

সব কথা ছেড়ে—উনি কেন তোমাকে পুঁথির খোঁজে এখানে পাঠালেন বলতে পারো? পুরনো শহরের চারপাশের লোক এর মধ্যেই অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। পোড়ো জমির মতো শূন্য বাড়িগুলো পড়ে আছে। নেকড়ে বাঘেরা বেরিয়ে আসবে না ঠিক। কিন্তু বলা যায় না তোমার কি ভয়ানক বিপদ হতে পারে।

ওতোমি বলল—মিছিমিছি তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তাড়াতাড়ি বেড়ালটা ধরো। আমার ধারণা এর মধ্যেই যুদ্ধ লাগবে না। তাহলে আর বিপদের ভয় কীসের?

বাজে বকো না। শিংকো বলল—একটা যুবতী মেয়ের একা একা এখানে চলে আসা—এটা যদি বিপদের না হয় তবে বিপদ কাকে বলে। কিছুটা বা গম্ভীরভাবে কিছুটা বা হাস্যোচ্ছলে শিংকো বলতে লাগল—আসল কথায় আসি, এখানে আমরা মাত্র দুজন। যদি আমার মজা করবার ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি কী করবে?

ওতোমির চোখে কোনো ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু গাল দুটো আরো লাল হয়ে উঠল।

কি শিংকো, তুমি আমাকে শাসানি দিচ্ছো? ওতোমি চেঁচিয়ে বলল। ও শিংকোর দিকে এগিয়ে এল যেন ওই শিংকোকে শাসানি দিচ্ছে।

—শাসানি? শিংকো উত্তর দিল—পদবীঅলা অনেক তা-বড় তা-বড় লোকেরা বাজে, বেতমিজ। আমি তো একটা ভিক্ষুক। শাসানি দেওয়ার চেয়েও আমি বেশি কিছু করতে পারি। যদি সত্যি আমার কোনো মজা করবার ইচ্ছে হয়…

ও কথা শেষ করবার আগেই মাথায় একটা জোর ঘা খেল। সেটা বোঝবার আগেই দেখল ওতোমি মারবার জন্যে ছাতা তুলছে।

—আর কথা বলো না। আবার ওতোমি শিংকোর মাথায় ছাতার বাড়ি মারল। শিংকো ছাতার ঘা এড়াবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু তার আগেই ও কাঁধে প্রচণ্ড ঘা খেল। ওদিকে বেড়ালটা একটা লোহার কেটলি ফেলে

দিল। যে সেলফে পারিবারিক গৃহদেবতার মূর্তিটা ছিল সেখানে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাইন গাছের ডাল আর তেলের প্রদীপ সেলফ থেকে শিংকোর ওপর পড়ল। নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই বারবার ওতোমির ছাতার মার খেতে লাগল।

—মর তুই। মর তুই-চিৎকার করে কথাটা বলতে বলতে ওতোমি ওকে ছাতা-পেটা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শিংকো ওতোমির ছাতাটা কেড়ে নিতে পারল।

ছাতা ছুঁড়ে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে শিংকো ওতোমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছোট কাঠের মেঝেতে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। এই ধস্তাধস্তির মধ্যে ছাতে আরো জোরে বৃষ্টিপাত শুরু হলো। বৃষ্টির শব্দ বেড়ে গেলে গোধূলির আলো আরো কমে যেতে লাগল। মার খেয়ে, আঁচড় খেয়ে ভিখিরীটা শরীরের শক্তিতে ওতোমিকে নিস্তেজ করে ফেলল। হিংস্রভাবে চেপে ধরল। বারবার চেষ্টা করে যখনই ভিখিরীটা ওকে কায়দা করতে পারল তখনই দ্রুতবেগে বাইরের দরজার দিকে সরে গেল।

—শালী কুত্তী! গড়িয়ে-পড়া কাপড়টা ধরে ও ওতোমির দিকে রাগত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল।

ওতোমির মাথার চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। ঐ অবস্থাতেই ও মেঝের ওপর বসে পড়ল। হাতে তখন একটা ক্ষুর ধরা। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ ওরা পরস্পরের চোখের দিকে নজর রাখল। তারপর কষ্ট করে হেসে শিংকো পকেট থেকে পিস্তল বার করল।

ইচ্ছে করে পিস্তলের নলটা ওতোমির বুকের দিকে লক্ষ্য করে শিংকো বলল —এবার তোমার খুশিমতো লড়াই করো।

যদিও ওতোমি ওর দিকে অনুশোচনার দৃষ্টিতে তাকাল—কিন্তু কোনো কথা বলল না। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে শিংকো পিস্তলের নলটা আরো ওপরের দিকে তুলল। ও কিছু ভেবেই এটা করল বোধহয়। পিস্তলের নলের ঠিক সামনেই বেড়ালটার হৃসদেটে রঙের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

—ঠিক আছে? ওতোমি সান? ও জিজ্ঞেস করল। কথাটায় যে হাসির ভাব ছিল তা ওতোমিকে বিরক্ত করবার জন্যেই।

—যদি আমি গুলি চালাই বেড়ালটা মরে ধপাস করে পড়ে যাবে। শিংকো প্রায় ট্রিগরে টানতে গেল—তোমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। কী?

রাজী ?

—না-না। ওতোমি চীৎকার করে উঠল—শিংকো, গুলি করো না।

—জানি তাহলে তুমি খুব দুঃখু পাবে।

— দয়া করো—গুলি করো না।

ওতোমির মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন এল। ওর চোখে চিন্তার ভাব নেমে এল। অল্প অল্প কাঁপতে থাকা ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ওর সুন্দর দাঁতগুলো দেখা গেল। অর্ধেক ব্যঙ্গ আর অর্ধেক বিস্ময়ের সঙ্গে ভিখিরীটা পিস্তলের নল নামাল। ওতোমির মুখে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল।

—ঠিক আছে, বেড়ালটাকে রেহাই দিলাম। বদলে...বিজয়ীর মতো শিংকো ঘোষণা করল—বদলে আমি শুধু তোমাকে চাই।

ওতোমি চোখ সরিয়ে নিল। সেই সময় ওতোমির অন্তস্থলে সবরকম অনুভূতির খেলা চলছিল—ঘৃণা, ক্রোধ, বিরক্তি আর দুঃখ। ওর এই মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে শিংকো ওর পাশ দিয়ে হেঁটে ওর পেছনে গেল —কাগজের ঠেলা-দরজাটা খুলল।

শোবার ঘর রান্নাঘরের চেয়েও অন্ধকার। এই ঘরে পরিষ্কার ড্রয়ারগুলো দেখা গেল। কানা উঁচু জ্বলন্ত কাঠকয়লার পাত্র দেখা গেল। একেবারে ফাঁকা ঘরটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে—সব মালপত্র নিয়ে বাড়ির লোকেরা চলে গেছে। ওতোমির পেছনে দাঁড়িয়ে শিংকো ওতোমির অল্প ঘামে ভেজা গলাটা দেখল। ওতোমি এটা বুঝতে পারল। পেছন ফিরে বেঁকে ও শিংকোর মুখের দিকে তাকাল। ওর মুখে আগের সেই সজীব রং ফিরে এল। যেন দোটানায় পড়ে গেছে এমনি ভঙ্গিতে শিংকো অদ্ভুতভাবে চোখ পিট্‌পিট্ করে বেড়ালটার দিকে পিস্তল তাক করল।

—না। বলছি গুলি করো না। শিংকোকে থামাবার জন্য ওতোমি হাতের ক্ষুরটা ফেলে দিল।

—তাহলে তুমি ওঘরে যাও। মৃদু হেসে শিংকো বলল।

—ওঃ তুমি নোংরা। বিরক্তির সঙ্গে ওতোমি গজগজ করতে করতে বলল। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে ও দ্রুতপায়ে শোবার ঘরে ঢুকল—অসভ্য মেয়েদের মতো। শিংকোকে কেমন অবাক হয়ে গেছে মনে হলো। এভাবে ওতোমি রাজী হয়ে গেল? ভাগ্যের কাছে হার মানল? এর মধ্যে বৃষ্টি পড়ার শব্দ অনেকখানি কমে গেছে। তাছাড়া—মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অস্তগামী সূর্যের আলো ফুটে

উঠল। এতক্ষণ যে রান্নাঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল সেটা একটু অলোকিত হলো। রান্নাঘরে কান পেতে দাঁড়িয়ে শিংকো শোবার ঘরে কাপড় চোপড়ের খসখসানি শুনতে পেল। ওতোমির সুতীর পোশাক খোলা, হয় তো ওর মাদুরে শুয়ে পড়ার শব্দ। তারপর শোবার ঘর একেবারে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বাহ্যত কিছু ইতস্ততঃ করে শিংকো স্বল্পালোকিত শোবার ঘরে ঢুকল। দেখল ঘরের মাঝখানে ওতোমি চিত হয়ে অনড় শুয়ে আছে। মুখ জামার হাতায় ঢাকা। যে মুহূর্তে শিংকো ওকে দেখল সেই মুহূর্তে দ্রুতপায়ে ফিরে এল। ওর মুখে এক অদ্ভুত অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি। সেটা যেন মনে হচ্ছিল বিরক্তি আর লজ্জার। যে মুহূর্তে ও রান্নাঘরে ফিরে এল তখন থেকেই শোয়ার ঘরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ও হাসতে লাগল।

—ওতোমি সান—আমি তোমাকে বিরক্ত করছিলাম, ও উচ্চস্বরে বলল—নাও, এবার দয়া করে এ ঘরে চলে এসো।

কয়েক মিনিট পরে ওতোমি বেড়ালটাকে বুকের কাছে ধরে হাতে ছাতা নিয়ে শিংকোর সঙ্গে খুব খুশির ভঙ্গিতে বকর বকর করতে লাগল। শিংকো একটা পাতলা মাদুরে বসে ছিল।

—শিংকো এখনও ওর হতবুদ্ধিকর অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

ও বলল—ও মেয়ে—তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো ?

—কী জিজ্ঞেস করবে ?

—মানে বিশেষ কিছু না—ও কথার মারপ্যাঁচের সঙ্গে বলল—দেখ একটি পুরুষের কাছে একটি মেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে এটা একটা বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার। তুমি ওতোমি সান…একটা বেড়ালের জীবনের বিনিময়ে…। যা হোক-তোমার পক্ষে সেটা খুবই ঝুঁকি নেওয়া ওতোমি সান—তাই কি না ?

ও এক মিনিটের জন্যে চুপ করল। ওতোমির সারা মুখ হাস্যোজ্জ্বল হলো। ও কোন উত্তর দিল না। বুকের কাছে ধরা বেড়ালটাকে আদর করতে লাগল।

—তুমি বেড়ালটাকে এত ভালোবাসো ? শিংকো জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, বেড়ালটাকে আমি ভালোবাসি—ও অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল।

—ঠিক আছে। তুমি যে তোমার কর্তার কাছে খুব বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ

কর এই মহল্লায় তোমার সেই খ্যাতি আছে। তোমার কি এই ভয় ছিল যে তুমি কর্তামার কাছে খুব দুঃখিত হবে যদি বেড়ালটা মারা যায়।

— আমি পুষিকে ভালোবাসি। আমার কর্তামার কথাটাও ভাবি আমি। কিন্তু আমি একদিকে মাথাটা অল্প ঝুঁকিয়ে ও এমন ব্যবহার করল যেন ও অনেকদূরে তাকিয়ে আছে—মানে কীভাবে বলবো ? যে কোন কারণেই হোক আমার মনে হলো আমি ওভাবে কাজটা করবো ব্যস্।

কয়েক মিনিট পরে শিংকো একা অন্যমনস্কভাবে রান্নাঘরে বসেছিল। পুরানো পোশাকের মধ্যে দিয়ে বের করা হাত দুটো হাঁটুতে রাখা। চক্চকে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওর চারপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। স্কাইলাইটের দড়িটা, সিঙ্কের ওপর জলের পাত্রটা—একে একে দৃষ্টির সামনে থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগল। য়ুনোর এদিক ওদিক ছড়ানো মন্দিরের ঘণ্টাগুলো বাজতে লাগল। বৃষ্টি আর মেঘের মধ্যে দিয়ে ওগুলোর গম্ভীর ধ্বনি ছড়াতে লাগল। শব্দ শুনে যেন অবাক হলো শিংকো। ওর চারিদিকের গভীর নৈঃশব্দের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর জলের জায়গার কাছে গিয়ে একটা বড় হাতলঅলা হাতায় জল ভরল।

মিনমোতোর বনেদী বাড়ীর ছেলে আমি আজকে একটা ধাক্কা খেলাম। এ সব বিড়বিড় করতে করতে ও জল খেতে লাগল।

সেই বিশেষ দিনটিতে য়ুনোর অন্তর্গত তাকেনোদাইতে তৃতীয় জাতীয় মেলার উদ্বোধন উৎসব। য়ুনো পার্কের প্রবেশপথের চারদিকে প্রায় সব চেরীফুল ফুটেছে। কাজেই য়ুনোর সাজানো রাস্তা প্রচুর ভিড়ে সরগরম। য়ুনোর দিক থেকে গাড়ি আর হাতে টানা রিকশার স্রোত নেমে আসছে। উদ্বোধন উৎসব থেকে ফিরছে সবাই। এই গাড়িগুলোর।

১৮৮৯ সালের ২৬ শে মার্চ শিংকো ওতোমিকে দেখল। স্বামী আর তিন সন্তান সঙ্গে নিয়ে ওতোমি য়ুনোর সাজানো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

আরোহীরা সব মান্যগণ্য ব্যক্তি।

জামার হাতার কাছে সবচেয়ে বড় ছেলেটিকে ধরে, কোলে পাঁচ বছরের ছেলেটিকে নিয়ে ওতোমির স্বামী পথচারী আর গাড়ির ভিড়ের পাশ কাটিয়ে আসছিল। ওতোমি মেয়েটির হাত ধরে ছিল। স্বামীটি বেশ উদ্বেগের সঙ্গে পেছনে ওতোমির দিকে তাকাচ্ছিল। প্রত্যেকবারই উজ্জ্বল হাসিমুখে ওতোমি স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য কুড়ি বছর কেটে গেছে। সে

সময়টা নিশ্চয়ই ওতোমির মধ্যে পরিপক্কতা এনেছে। কিন্তু ওর চোখ দুটি আগের মতোই পরিষ্কার আর উজ্জ্বল। ১৮৭০ সাল নাগাদ ও বর্তমান স্বামীকে বিয়ে করেছে। স্বামীটির প্রথমে ইয়োকোহামায় একটা ঘড়ির দোকান ছিল। এখন সেটা টোকিওর গিঞ্জা স্ট্রীটে।

ওতোমি ঘটনাক্রমে চোখ তুলে তাকাল আর শিংকোকে দেখতে পেল। দুই ঘোড়ায় টানা গাড়িতে, শিংকো আয়েস করে বসে আছে। গাড়িটাও ঘটনাক্রমে সেখানে এসেছিল। ওতোমিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল শিংকোর বুক। বুকটা নানা সম্মানসূচক ব্যাজে, অনেক ছোট বড় সোনালি ফিতে আর ডোরাকাটা কাপড়ের টুকরোয় আর ময়ূর পুচ্ছের নিচে চাপা পড়ে গেছে। যাই হোক না কেন কোনো সন্দেহ নেই ওতোমির দিকে তাকিয়ে থাকা এই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ধূসর দাড়িঅলা মুখটিই অতীতের সেই ভিখিরীর। নিজের অজান্তেই ওতোমি চলার গতি শ্লথ করল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ওতোমি আশ্চর্য হলো না। যে কোনো ভাবেই হোক ও জানত যে শিংকো ভিখিরী নয়। হয়তো এটা ওতোমি শিংকোর ভাষাভঙ্গি আর সঙ্গের পিস্তল দেখে বুঝেছিল। ও একদৃষ্টিতে শিংকোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ইচ্ছে করেই হোক আর দৈবাৎই হোক শিংকোও ওকে লক্ষ্য করছিল। সেই সময় কুড়ি বছর আগেকার বেদনাদায়ক স্মৃতি ওর স্পষ্ট মনে জাগল। সেই অতীতের একটি দিনে ওতোমি নির্লজ্জভাবে বেড়ালের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিজেকে ওর হাতে সঁপে দেবে বলে মনঃস্থির করেছিল। তখন কী উদ্দেশ্য ছিল ওতোমির? ও বলতে পারতো না। সেই পরিস্থিতিতে শিংকো ওর শরীর ছোঁবার জন্যে নিজে মনঃস্থির করতে পারল না। অথচ ও কিন্তু নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। শিংকোর কী উদ্দেশ্য ছিল? ওতোমি তাও বলতে পারত না। যদিও ওতোমি সেটা বলতে পারেনি তবু ওর পক্ষে সেটা স্বাভাবিক ছিল। শিংকোর গাড়িটা পার হয়ে ওতোমির মনটা সব ভাবনা থেকে মুক্ত হলো।

যখন গাড়িটা চলে গেল—মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে ওতোমির স্বামী ওর দিকে তাকাল। স্বামীর দিকে উল্লাস আর আনন্দের সঙ্গে তাকিয়ে ওতোমি হাসল যেন কিছুই ঘটে নি।

রুমানিয়ার গল্প

বাজীকরের মৃত্যু

আলেকজান্দ্রু সাহিয়া

গ্রাম থেকে গ্রামে ধুলোটে পথে পথে ধুঁকতে ধুঁকতে ঘুরে বেড়ায় চাকা টাল খাওয়া ছাইঅলা একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

ছাইরঙা ঘোড়াটা বেশ বড়সর পাঁজরের হাড় উঁচিয়ে আছে, চোখ দিয়ে সব সময় জল পড়ছে ঘোড়াটার গায়ে অজস্র আলি মারা সাজ, চলছে নিজে তালে উদাসীন।

গাড়িটা মিহেল ঘের্লাসের। ঘের্লাসে বাজীকর। কৃষকদের আনন্দ আর উত্তেজনার খোরাক সে।

গ্রামের সরু পথে যখনই তার গাড়িটা দেখা যায় তখনই খবরটা বাজের আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে—বাজীকর ঘার্লেস এসেছে! চারদিক থেকে কাচ্চাবাচ্চার দল ছুটে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে ওর কাছে, চীৎকার করে গাড়িটাকে উৎসাহিত করতে থাকে যতক্ষণ না গ্রামের মাঝখানে কোন সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ছইয়ের নীচ থেকে মিহেল ঘের্লাস বেরিয়ে আসে। ওর চওয়া কাঁধটা একটু ঝুঁকোনো, মুখ বুড়োটে আর বলি রেখাময়। লজ্জিত ভাবে সে তার ফেল্টটুপীটা মাথা থেকে খুলে ফেলে। মাথা নীচু করে অভিবাদন জানায়।

আনন্দে অধীর হ'য়ে বাচ্চারা তাকে চীৎকার ক'রে স্বাগত জানায়—এসো ঘের্লাস! তোমার তলোয়ারগুলো দেখাও—একবার আমাদের ও গুলো দেখতে দাও।

জাদুকর মিষ্টি ক'রে হাসে. বাচ্চাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। সাবধানে এসে দাঁড়ায় যাতে বাচ্চাদের মধ্যে কারো গায়ে ধাক্কা না লাগে। গাড়িটার পেছন থেকে একগোছো খড় টেনে বের করে। ঘোড়াটাকে খেতে দেয়। ঘোড়াটার ভেজা চোখে আদরের চাপড় দেয়।

লোকজন তখনও আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা গাঁয়ের লোক সেখানে এসে জড়ো হয়। ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। দর্শকদের আগ্রহ লক্ষ্য করে ঘোর্লাস তখনই খেলা শুরু করে।

মঞ্চ বলে কিছু নেই। কাজেই ঘের্লাস একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়ায়। কাঁচ দেখতে নাক দিয়ে বের করে উজ্জ্বল রঙীন ফিতে, আংটি ডিম, ধাতুর মুদ্রা। তারপর হাত দিয়ে যাদুর ভঙ্গী ক'রে ওর দোমড়ানো টুপি থেকে বের করে দু'টো সাদা পায়রা।

কৃষকরা প্রচণ্ড খুশী হয়। প্রাণপন জোরে হাততালি দেয়, তারস্বরে চীৎকার করে—"সাবাস ঘের্লাস—সাবাস বুড়ো ঘের্লাস।"

এসবের শেষে ঘের্লাস তার সবচেয়ে মনোগ্রাহী খেলাটা শুরু করে খেলা হল তিনটে তলোয়ার গেলা।

যে মুহূর্তে ঘের্লাস ওর কোমরের বেলটএ গোঁজা চকচকে তিনটে তলোয়ার বের করে—রোদে ঝলসে উঠছে সেগুলো তখনই তার খেলার দর্শকরা চুপ হ'য়ে যায় উদ্বেগের সঙ্গে জাদুকরের কাণ্ডটা দেখে।

খেলাটার শুরুতে ঘের্লাস তলোয়ার তিনটে কৃষকদের মাথার ওপর দিয়ে শুন্যে ঠং ঠং শব্দ করে ঘুরিয়ে নেয়। তারপর একটা একটা ক'রে তলোয়ার গিলতে থাকে। যখন শেষ তলোয়ারটা মুখে পোড়ে—মুখটা হাইতোলার মত হাঁ ক'রে ঘের্লাস সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, দু'দিকে দুহাত তুলে দেয় দেখতে লাগে যেন মোটা মাথা ক্রুশের হত। এইভাবে ও কয়েকমিনিট থাকে শুন্যে যেন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়।

খেলার শেষে চাষীরা নিজেদের খেয়ালখুশী এবং সামর্থ্যমত কম অঙ্কের মুদ্রার যাদু টুপীতে ছুঁড়ে দেয়।

ঘের্লাসের জীবনে বরাবর এরকম ছিল না। প্রায় এগারো বছর আগে, ও তা বড় তা সব পৃথিবীর সেরা জাদুকরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বতা করত। সমস্ত য়ুরোপের সব সার্কাসের ব্যবস্থাপক ও ম্যানেজাররা ওকে অকল্পনীয় পারিশ্রমিকে দলে নিত। বড় বড় শহরের দেয়ালে পোস্টার লাগানো হ'ত। তাতে যতটা বড় ক'রে সম্ভব ঘের্লাসের ছবি থাকত। ঘের্লাসের তখন ছিল একেবারে উড়নচণ্ডে। কাজেই বৃদ্ধ বয়সে যে ঝামেলা পড়তে হ'তে পারে একথা ও ভাবতোই না।

বছরের পর বছর কেটে গেছে। ওকে করেছে দুর্বল আর রোগার্ড। তারপর ঘেলাস একদিন বৃদ্ধ দরিদ্র আর একা হয়ে গেল। এখন আর কেউ ওর ফিতে আর পায়রার খেলা নিয়ে ভাবে না। তিনটে তলোয়ার বাঁট পর্যন্ত গিলে ফেলার খেলা বিদেশী ভদ্রলোক দর্শকদের ঘৃণার উদ্রেক করে। কাজেই ও একদিন পরিত্যক্ত হ'ল। ফিরে এলো নিজের বাড়ীতে।

মফঃস্বল শহরগুলো গ্রামাঞ্চল ওকে প্রচণ্ড উৎসাহে বরণ ক'রে নিল। নতুন ক'রে ঘের্লাসের গৌরবের দিন শুরু হ'ল। অবশ্য এই গৌরব এখন সস্তা, গেঁয়ো আর অর্থহীন। ঘের্লাস এখন উন্মুক্ত জায়গায় ওর খেলা দেখায়, ওর ক্লান্ত ঘোড়া আর টাল খাওয়া চাকার গাড়ির পাশে। আগে থেকে ওর আগমন ঘোষণা করে পোস্টায় পড়ে না। এভাবেই ওর রুজিরোজগার চলে।

কিছুদিন আগে ঘের্লাস একটা গ্রামে এল। এই গ্রামে এর আগে ও আসে নি। তাই চাষীরা প্রচুর সংখ্যায় এসে জড়ো হল। ওর বিস্ময়কর বাজীকরের খেলার কথা চাষীরা অন্যদের কাছ থেকে শুনেছিল। তাই স্বচক্ষে দেখতে এল।

ঘের্লাস ওর পুরোনো চেয়ারটায় দাঁড়াল। চাষীদের মাথা ছাড়িয়ে খেলা দেখানো শুরু করল। ও খুব খুশী হল। গ্রামাঞ্চলে খেলা দেখানো শুরু করা থেকে ও এত উদ্দীপনা আর কোন গ্রামে দেখে নি। ওকে এই উদ্দীপনা মনে করিয়ে দিল ওর সেই পুরানো সার্কাসের গৌরবময় মুহূর্ত গুলোও মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখাতে লাগল।

প্রথম থেকেই দর্শক জনতা উল্লাসধ্বনি তুলল—"ভালো বুড়ো ঘের্লাস। তেজী মরদ।'

তাদের উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেল যখন ঘের্লাসের তিনটে তরবারি রোদে ঝলসে উঠল। তারপর তরবারি তিনটে ওর মুখ গহ্বরে অদৃশ্য হল নতুন করে বাহবা ধ্বনি উঠল।

হঠাৎ জনতার কলরব ছাপিয়ে কর্কশ চীৎকার শোনা গেল—"মিথ্যেবাদী। এই জাদুকর লোক ঠকাচ্ছে। ওর তরবারিগুলো আসল নয়। ও যদি আমার বেয়নেট গিলতে পারে তবেই ওকে আমার বিশ্বাস করবো।

—'ঠিক ঠিক। ও আমাদের সার্জেন্টের বেয়নেট গিলুক। ও আমাদের ঠকিয়ে পয়সা নিচ্ছে। ঘের্লাস ঠগ।"

শ'য়ে শয়ে চাষী বিদ্রোহের ভঙ্গীতে বলে উঠল। গাঁয়ের সার্জেন্ট ভীরের

মধ্যে দিয়ে ঘের্লাসের চেয়ারের কাছে এল। বলল—

মিহেল ঘের্লাস আমি বলছি যদি তুমি চাও যে আমরা তোমায় বিশ্বাস করি তবে তোমাকে আমার বেয়নেট গিলতে হবে, তোমার ঐ তারের টুকরো নয়। তোমার মত লোকদের আমি মেলায় দেখেছি - দর্শকদের ঠকিয়ে পয়সা কামায়। কিন্তু এখানে আমি গ্রাম কর্তৃপক্ষের লোক তাই তোমাকে লোক ঠকাতে দেব না।"

ঠিক ঠিক। ঘের্লাস জোচ্চোর। ওর লজ্জিত হওয়া উচিত। জঘন্য বুড়ো জাদুকর। ধিক্।' জনতার মধ্যে থেকে শোনো গেল।

জনতা বেড়ালের ডাক ডাকল, মারমুখো হ'য়ে ঘের্লাসের দিকে এগিয়ে গেল।

জাদুকরে হতবুদ্ধিকর দৃষ্টি জনসমুদ্রের ওপর দিয়ে ঘুরে এল। এরকম পরিস্থিতিতে ঘের্লাস আগে কখনও পড়ে নি। ওরা ওকে গালাগাল দিচ্ছেন কেন? ওরা যে ওকে ঠগ বলছে কেউ কি ওদের মধ্যে পারবে তলোয়ার গিলতে? সার্জেণ্ট কি পারবে? নিশ্চয়ই পারবে না। ও ভাবল ও কি ওদের চ্যালেঞ্জও করবে অথবা তরবারিগুলো ওদের হাতে দেবে পরীক্ষা করবার জন্যে। ওকে অপদস্থ করতে কে সাহস করবে ঐ তরবারিগুলো গিলতে?

এমনকি ওর ঘোড়াটাও মনে হ'ল আশ্চর্য হয়েছে। কাম বাড়ল ঘোড়াটা।

অবশেষে জাদুকর ডান হাতে তলোয়ার তিনটে তুলে ধরল. সে বলল— এগুলো তলোয়ার, হতে নিয়ে পরখ ক'রে দেখুন। চল্লিশ বছর যাবৎ এগুলো আমি আমার গলায় ঢোকাচ্ছি। কাউকে কক্ষনো ঠকাই নি। আমি সৎ।" তারপর ও তরবারিগুলো দর্শকদের হাতে দিতে গেল, কিন্তু দর্শকেরা ওর কথা শুনবে না। কেউ তরবারি গুলো ছুঁলো না, তরবারি-গুলো ওদের মাথার ওপরে শূন্যে রইল।

সার্জেট উত্তর দিল "তোমার তলোয়ারের ব্যাপারে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। আমরা চাই যে তুমি আমার বেয়নেট গেলো। তারপর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো।"

দর্শকজনতা আবার চীৎকার করে উঠলো ঠিক। ও সার্জেণ্টের বেয়নেট গিলুক। ও আমাদের ঠকিয়ে পয়সা লুটছে।

জাদুকর ঘের্লাস দেখল যে ওর অস্তিত্বই বিপন্ন. ওর এত বছরের খ্যাতি

চিরদিনের জন্যে অপমানের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। তলোয়ার তিনটে কোমরের বেল্টে গুঁজল ও। এই তলোয়ারগুলো ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। ও কাঁপা কাঁপা হাতে সার্জেন্টের বেয়নেটটা নিল।

ও সন্দেহের ভঙ্গীতে বেয়নেটটা শূন্যে ঘুরিয়ে নিল, বেয়নেটটা রোদে ঝলসে উঠল না। এটা তেলা তেলা। ঘার্লেস জামার হাতায় ওটা মুছে নিল।

সার্জেন্ট ঠাট্টার ভঙ্গীতে হাসল। বিমূঢ়ের মত দর্শকজনতা অপেক্ষা করতে লাগল।

চেয়ারে বসা জাদুকরকে মনে হ'ল টলছে। ঘের্লাস দু আঙুলে বেয়নেটটা ধরল। তারপর গলায় ঢোকাতে লাগল, অর্ধেকটা গেলার পর, ও তাড়াতাড়ি বেয়নেটটা বের করে নিল। আবার ওটাকে জামার হাতায় মুছে নিল। তারপর সবটা গলার মধ্যে দিয়ে পুরে দিল। শুধু বাঁটটা আর যেখানে বাঁধা হলুদ ফিতেটা বাইরে রইল। ওর থুতনিতের ওপর হলুদ ফিতেটা ঝুল ছিল ও হাত দুটো ছড়িয়ে দিল একটা ক্রুশের ভঙ্গীতে রইল। আহত পানীর মত কেঁপে উঠল। পাখীটা যেন ওড়বার চেষ্টা করছে।

ঝড়ের শব্দের মত সাবাস ধ্বনি উঠল, পাগলের মত চাষীরা চীৎকার করে উঠল "সাবাস ঘের্লাস। ঘের্লাস যুগ যুগ জীও।"

একটা হতাশার ভঙ্গী ক'রে ঘের্লাস বেয়নেটের বাঁটটা ধরল আর যে মুহূর্তে ও বেয়নেটটা বের ক'রে নিল সঙ্গে সঙ্গে ওর গলা থেকে গল্ গল্ ক'রে রক্ত উঠে এল।

ও কথা বলতে চাইল। করুনভাবে ওতোতলাতে লাগল। তারপর জাদুকর ঘের্লাস সার্জেন্টের বেয়নেটের কাছে মাটিতে পড়ে গেল। পাশেই ওর মঞ্চ অর্থাৎ ছোট্ট একটা চেয়ার।

আফ্রিকার গল্প

দ্বিপ্রহর

লুই হনওয়ানা

মাদালা কোমর ভেঙে নুয়ে আছে। দুটো হাতও নীচের দিকে নামানো, প্রায় মাটি ছুঁয়েছে হাত দু'টো। দুপুরের ঘণ্টা বাজল। মাদালা মাথা তুলল। দেখল কয়েক পা দূরে ওভারশিয়ারসাহেব দাঁড়িয়ে আছে। সার সার ভুট্টাগাছের মাঝটায়। পরনে সবুজ মেশানো সাদা প্যাণ্ট। মাদালা কিন্তু সোজা হ'য়ে দাঁড়াল না। শুধু ঘণ্টা বাজলেই কাজে বিরতি দেওয়া চলবে না। সাহেবের মৌখিক আদেশ চাই। মাদালা দু'হাত হাঁটুতে রাখল। অপেক্ষা করতে লাগল সাহেবের হুকুমের জন্যে।

চড়া রোদ পিঠে এসে পড়ছে। আদুর পিট। পুড়িয়ে দিচ্ছে যেন শরীরটাকে। পায়ের কাছে একটা তেলালো পাথর। পাক চুইয়ে টপ্ টপ্ ঘাম পড়ছে পাথরটায়। মাদালা সময়ের হিসেব করতে করতে ভাবল সাহেবের মনটা বোধহয় আজকে ভালো নেই। দেখল কয়েক পা দূরেই সাহেব দাঁড়িয়ে। একেবারে নড়াচড়া নেই, একটু এগিয়ে গেল মাদালা। দেখল ফিলিসনকে। কালো কুচকুচে শরীর। বেঁটে। ভুট্টোগাছগুলোর অর্দ্ধেক ওর উচ্চতা। ফিলিসনও নিশ্চয়ই সময় গুনছে কখন দ্বিপ্রহরের বিরতি হবে।

মাদালার পিঠে ব্যথা। ব্যথাটা এখন চাগাড় দিচ্ছে। এই দ্বিপ্রহরের কর্মবিরতির সময়টুকু ওদের দিনারের সময়। কথাটা আসলে 'ডিনার'। মাদালার মত শ্রমিকরা বলে দিনা। এই সময়ই পিঠের ব্যথাটা যেন বাড়ে। মাথা ঘুরাইয়া বার বার মাথা নোয়ানো আবার তোলা। এতে মাদালার কাঁধদুটো টন্ টন্ করছে। তবু কাজ। চারপাশের আগাছা তুলতে লাগল। অভ্যেস হয়ে গেছে। যন্ত্রের মত হাত বাড়িয়ে দেয়। মুটো ক'রে আগাছার গোড়াটা ধরে। তারপর সজোরে উপড়ে ফেলে। খুবই ছোট আগাছা। তবু টেনে তুলতে গিয়ে হাঁটুটা কন্‌কনিয়ে উঠল। ওপড়ানো আগাছার শেকড়গুলো মাদালা নাকের কাছে ধরল। শেকড়ে জড়ানো মাটির চড়াগন্ধ। গন্ধটা

মাদালাকে সজীব করল যেন। শেকড়গুলো মুখ ঠোঁটের কাছে চেপে ধরল। শুঁকতে শুঁকতে তাকালো তুলে ফেলা আগাছার গর্তটার দিকে। প্রচণ্ড গরম। ভাপ বেরুচ্ছে না। ভোরবেলা কিন্তু ভাপ বেরোয় মাটি থেকে। তখন রাতের শিশিরের জলে মাটি বেশ ভেজা থাকে। তখন মাদালা কাজ করতে ক্লান্তি বোধ করে না। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেকড় ওপড়ানো গর্তগুলো থেকে গরম গরম ভাঁপ বেরোয়। দুপুরের প্রচণ্ড গরমে সেটাও আর থাকে না।

যে আগাছাটা মাদালা তুলল সেটা ও মাটিতে ফেলে দিল। কান পাতল কিছু শোনার জন্যে। কোন শব্দ নেই। শুধু ভুট্টাগাছগুলোর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়াব শব্দ ছাড়া।

শরীরটার পেশী টান করে আর একটা আগাছা ধরে টান দিল মাদালা। পরপর সাতটা আগাছা শরীর পেছনে হেলিয়ে টেনে তুলল। কিন্তু ওভারশীয়ার সাহেবের হাঁক শুনল না। তবে কি সাহেবের হাঁক ও শুনতে পায় নি? আবার কান পাতল। মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনল না।

আবার আগাছা তুলতে গেল। কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা চাগিয়ে উঠল। তবু আগাছা তুলল। হঠাৎ একটা আগাছা উপড়ে ফেলা গর্ত থেকে একটা বড়সড় কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে এল। হাতের কাছে কিছুই নেই। বিছেটাকে মারতে পারল না মাদালা। ও বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হ'ল যখন ভাবল যে ঐ বিছে কামড়ালে দিন তিনেক কী অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়। চতুর্থ দিন অক্কাপাওযাও বিচিত্র নয়। অত যন্ত্রনা সহ্য করবাব সাধ্য মাদালার আজকের শরীরের নেই।

ভোরবেলা আগাছাগুলোয় গঙ্গাফাড়িং লাফিয়ে বেড়ায়। কিন্তু উত্তপ্ত এই দুপুরে দেখা যায় শুধু বিছে, গিরগিটি কখনসখনও সাপ। খেতে কাজ করছিল সেদিন পিতারোসি। মরল সাপের কামড়ে। পিতারোসিকে একমাত্র মাদালাই চিনতো। কিন্তু পিতারোসির বৌকে সবাই অল্পদিনের মধ্যেই চিনে ফেলল। বিধবা হ'ল বৌটা। তারপর দিশি মদের দাম পেলে সেই বিধবাটা যে কারো সঙ্গে শুতে যেত। প্রথমে একটু দাম বাড়িয়েছিল। কিন্তু মদের নেশা। সেটা যাবে কোথায়। সেই নেশাব জন্যেই দর কমাল। মদ খেয়ে মাগীটার হুশ থাকতো না। তখন ক্ষেত মজুররা যে কেউ লম্বা ঘাসের জঙ্গলে ওকে নিয়ে যেতে পারতো। তবে ওসবের সময় মাগীটা নাকি

ঘুমিয়েই থাকতো। পুরুষটা যখন ওকে ছেড়েদিত তখন নাকি ওর সাড় আসতো।

মাদালা তো এখন বুড়ো। সেই শুধু বিধবা বৌটার সঙ্গে জড়ায় নি। অবশ্য পিতারোসিকেও তো একমাত্র মাদালাই চিনতো।

মাদালা আরো বার দু'য়েক আগাছা তুলল। হাঁটুতে দুহাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইল। সূর্য যেন মাথার ঠিক ওপরে নেমে এসেছে। শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। এতক্ষণেও কি ওভারশিয়ার সাহেব দুপুরের খাওয়ার ছুটি দেবে না?

হঠাৎ পেটটা ব্যথায় মুচ্ড়ে উঠল, এতক্ষণ সাহেবের হাঁকের অপেক্ষা করতে করতে ব্যথটা ভুলে ছিল। এবার শরীরটা টান টান ক'রে ব্যথাটা সইয়ে নিতে চাইল। একটাযন্ত্রনা কাঁধের কাছে শিরাউপশিরায় ছড়িয়ে পড়ল। থর্ থর ক'রে ওর শরীরটা কেঁপে উঠল। হাতে ধরা পাতাগুলো হাতে পিষে গেল। একটা কটুগন্ধ নাকে লাগল। পেটের যকৃৎটা যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু মাদালা মুখে কোন শব্দ করল না। শালার সাহেব এখনও খাওয়ার ছুটি দিল না। দিনানের ঘণ্টা বাজল। রোদের ছায়া আরো লম্বা হল। এখন সাহেব হাঁকার দিল না। ওপাশের একটা ডাল ধরতে ধরতে মাদালা এসব ভাবল।

একটা আগাছা ঝোপ টেনে তুলতে গিয়ে মাদালা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আবার পেটে তীব্র যন্ত্রনা। ওর পা দু'টো মাটিতে আছড়াতে লাগল।

ঝুরঝুরে মাটির ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে যন্ত্রনটা কমল। ও চোখ বুজে রইল। আরো কমুক ব্যথাটা। শরীরের ঝামেলাটা কমল। আবার আগাছা তুলতে ও হাত বাড়াল। হাঁটু গেড়ে ব'সে তুলছিল আগাছাটা। নিজেই বিড়বিড় ক'রে বলল হাঁটু গেড়ে ব'সে আগাছা তোলা তো আবার সাহেবের বারণ।'

এবার যে আগাছাগুলো তুলেছে সেগুলো পর পর সাজিয়ে গুনতে লাগল।

এক—দুই—তিন—আবার একগোছা আগাছা তুলল।

ভীষণ ক্লান্ত মনে হ'ল নিজেকে। হাঁটুর ওপর চিবুক রাখল। তারপর কুণ্ডুলী পাকিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ব্যথাটা অনেকটা কমেছে। আগাছার একটা পাতা চিবুতে লাগল।

—চল্‌রে সব খেতে চল। সাহেবের হাঁক শুনল। আরো ক'টা আগাছা মাদালা চট্‌পট্‌ তুলে ফেলল। কপাল থেকে ঘাম চুঁইয়ে পড়ল চোখে, জ্বালা করে উঠল। আঙুল দিয়ে ঘাম মুছল। কিন্তু এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়াল না পাছে সাহেব ভাবে যে কাজ বন্ধ করার জন্যে ও তৈরী হয়েই ছিল। মাথা তুলল আস্তে। কেমন ঝিমঝিম করে উঠল মাথাটা।

এরমধ্যে নগুইআনা আর মুথাকাতি মাথা তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দে'খে সাহেব ব'লে উঠল—কাম শুরুর সময় তো গা চুলকিয়ে মরলি—আর এখন খুব তাড়া না? শালা বেজন্মারা। চাবকে পিঠে দাগ ফেলে দেব।'

ফিলিমোন সবেমাত্র মাথাটা তুলতে যাচ্ছিল সাহেবের চেল্লানি শুনে আবার মাথা নোয়াল। কিন্তু মাদালকে দেখে আবার মাথা তুলল। সাহস পেল। তাকালো সোজা সাহেবের মুখের দিকে। ওকে দেখে তানদানে, জিমো মুথাম্বি সোজা তাকালো সাহেবের দিকে।

জিমো যেন ঘামে নেয়ে উঠেছে। ওর কাল্‌চে মাটির মত শরীরে পেশীর নড়াচড়া দেখল মাদালা।

—নে চল্‌ শালারা, চিকাফোতে (টিফিন খাওয়ার জায়গা) চল্‌। ওভারশিয়ার সাহেব হেঁকে বলল। একটা বই পড়ছিল সে। বইটা শব্দ করে বন্ধ করল। বইয়ের মলাট দেখল। আপনমনেই বলল—যত্ত সব বেবুশ্যের কেচ্ছা, আর কিছু লেখা যায় না? যত্ত সব।

ওভারশিয়ার সাহেব এগিয়ে চলল। পেছনে নিঃশব্দে ক্ষেতমজুররাও চলল। চারপাশে ভুট্টার গাছ। কেমন মসৃণ। রোদ চম্‌কাচ্ছে পাতাগুলো। আর সবাই বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে ক্ষেতের সবুজের মধ্যে ওদের প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। মাদালাব মনে হ'ল ওরা যেন সবুজের ঢেউ ঠেলে এগোচ্ছে। মাদালা একটুক্ষণ দাঁড়াল। মনে মনে বলল, সাহেবদের ক্ষেত যেন সবুজ সমুদ্র। দূরে তাকাল। ভুট্টার মসৃণ পাতায় সূর্যালোকের ঝিলিক চোখে লাগল। চোখ সরাল। তবু সমুদ্র আলাদা। তার ব্যাপার স্যাপারও অন্য রকম।

খাবারের চালাঘরে সবাই এসে জড়ো হল। আগেও অনেকে এসেছে। তাদের খাওয়া হয়ে গেছে। ছায়ার এদিক ওদিক ব'সে আছে। কেউ ওরমধ্যেই ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

একটা চালার নীচে গিয়ে মাদালা বসল। যারা আগেই ওখানে বসেছিল

তারা মেয়েছেলে নিয়ে কথা বলছিল। মাদালাকে আসতে দেখে অন্য ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে লাগল। একজন জিজ্ঞাসা করল, মাদালা ভাই তোমার দলের খবর বল। উত্তরটা মাদালা সঙ্গে সঙ্গে দিল না। উত্তর খুঁজছে ও। লোকটা বলল, মাঠে কী কড়া রোদ। 'তা ঠিক' মাদালা বলল। লোকটা বলল এর ওপর ঘাড়ে চেপে আছে ও শালা সাহেব। সারাক্ষণ। মাদালা এবার লোকটার দিকে তাকাল। অল্পবয়সী ছোকরা। ছোকরা তখনও বলেই চলেছে শালা ওভারশিয়ার হাড় হারামজাদা। ও শালা ইচ্ছে করে দেরীতে ছুটি দেয়। পিঠটাকে একটু টান করবো তারও উপায় নেই। ছোকরা উৎসাহের সঙ্গে সবাইকে বোঝাতে লাগল মাঠের কড়া রোদে কাজ করা কী কষ্টকর।

মাদালাদের থেকে দূরে ছায়ায় বসে আছে ওভারশিয়ার সাহেব। বসেছে একটা প্যাকিং বাক্সে। সামনে টেবিলের মত আর একটা বাক্স। গোগ্রাসে খাবার গিলছে, সেই সঙ্গে ঢোকে ঢোকে মদ। মাদালাকে মাসের শেষে অর্থাভাবে সঙ্গীদের সঙ্গে মদ ভাগাভাগি করে খেতে হয়। ওভারশিয়ারের তো সে সব নেই। বউ যা মদ পাঠায় মাঝে মাঝে তার তলানি বোতলে থাকে। ওরা লোভে ঠোঁট চাটে।

জিমো ডাকল- মাদালা খেতে চল। ছায়ার মধ্যে ব'সে আছে বিভিন্ন দলের ক্ষেতমজুরেরা, মাদালা তাদের অনেককেই চেনে। ওরাও মাদালাকে চেনে। ওরা কুশল জিজ্ঞেস করে। জিমো বলল, ওভারশিয়ারটা ছিল তাই বলিনি। তোর মেয়ে এসেছে।

মাদালার মেয়ে মারিয়া তখন বাবার কাছে এল।

মারিয়া বলল, গুড আফটারনুন বাবা। মাদালা বলল, বাড়ির সবাই কেমন আছেরে। জিমো বলল, মারিয়া ঐ চালার নীচে ছায়ায় বসে বাপবেটিতে কথা বল। জিমো মারিয়াকে স্নেহ করে। কিন্তু মারিয়া অনেকের সঙ্গেই শোয়। কাজেই ওর আর বিয়েটা হচ্ছে না।

বাড়িতে সবাই ভালো বাবা। তোমার কাছে এমনি এলাম। মারিয়া বলল। সব ক্ষেত মজুরই মারিয়ার দিকে লোভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর পোশাকের নীচের শরীরটা টানছে যেন ওদের।

গুড আফটারনুন মারিয়া। কেউ কেউ বলল। মারিয়াও উত্তর দিল। তবে কারো দিকে না তাকিয়ে।

মাদালা আর মারিয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সব পুরুষের

দৃষ্টির আঁচ মারিয়া গায়ে পাচ্ছে। এইজন্যে অস্বস্তিও বোধ করছিল।

মাদালা তোর কি খিদে নেই? জিমো বলল, সময় বেশি নেই। ওভারশিয়ার যদি দ্যাখে মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিস্, নে খেয়ে নে।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ওভারশিয়ার এদিকে এল। ওদের দেখল। বলে উঠল আবে, মারিয়া নয়? এখানে কী ব্যাপার? মাদালাকে পঠাচ্ছিস? আরে ওটা তো বাহাত্তুরে বুড়ো। এখন কি জিমোর দিকে নজর।

না, জিমোকে আমি পঠাতে চাইনি। মারিয়া পোর্তুগীজ ভাষায় বলল। বেশ মজা পেল ওভারশিয়ার সাহেব। বলল, ওর সঙ্গে শোয়ার ইচ্ছে নেই?

মারিয়া কোন উত্তর দিল না. মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

জিমো বলল. খাবি চল্ মাদালা। না খেলে মাঠে খাটবি কী করে?

মাদালা সে কথায় কান দিল না। সাহেবের কথায় মারিয়ার মুখের প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইল। মারিয়া অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে মারিয়া বলল. বাবা মনে হয় তোমার এখন খেতে যাওয়া উচিত। তারপর সহজ হবার ভঙ্গীতে বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল

মাদালা মারিয়ার কাছে এগিয়ে এল। মারিয়ার গভীর কালো চোখে কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল না। বলল. মনে হয়. কেন মনে হয় তোর। বাবার নীরস গলার স্বর শুনে মারিয়া দ্রুত একটু সরে গেল মাদালার দিকে পিঠ ফেরাল বলল. এমনি মনে হল আর কি

মাদালা ওকে এক ঝটকায় নিজের দিকে ফেরাল। ওর চোখে চোখ রেখেও কিছু বুঝল না।

খেতে যাও না বাবা। মারিয়া আদেশের ভঙ্গীতে বলল

আমার খিদে নেই। মাদালা চটে উঠে বলল

মারিয়া কোন কথা বলল না

তুই খাবি না? মাদালা বলল।

আমি খেয়েছি। এক বন্ধু খাওয়াল

ওটুকুতে আর কী হয়। চল্ আমাদের দলের সঙ্গে খাবি

না-না পেট পুরে খেয়েছি। যাও তুমি গিয়ে খেয়ে এস। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

জিমো তাগাদা দিল-চল্ ও তো ঠিক কথাই বলছে মাদালা রাজী হ'ল

এবার। বলল, যাচ্ছি চল্। তুই এখানেই বস্ মারিয়া পালিয়ে যাস নে।

মাদালা সেদ্ধ ছাতু আর ঝোল নিতে লাগল। সবাই নিঃশব্দে খাচ্ছে।

খেতে খেতে মাদালা মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। নজরে রেখেছিল। ওর মধ্যেই ওভারশিয়ার সাহেব মারিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে।

মারিয়া কথা বলছিল মুখ নীচু করে। মাটির দিকে চোখ রেখে।

কী কথা বলছে ওরা ? এটা বুঝতে না পেরে মাদালার অস্বস্তি আর যায় না। সাহেব নিশ্চয়ই কোন কুপ্রস্তাব করছে। সাহেব বেশ চটেই ছিল মারিয়ার ওপর। তবে ওর মধ্যেই মাঝে মধ্যে মন ভোলানো কথা বলছিল মারিয়াকে। একটা সিগারেট ধরাল সাহেব। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। পোড়া কাঠিটা নাড়তে নাড়তেই কথা চালাতে লাগল।

এক সময় ওভারশিয়ার ওখান থেকে গোলাঘরের দিকে চলে গেল। মারিয়া কিন্তু এতক্ষণ মুখ তোলেনি।

মাদালার খাওয়া হয়ে গেছে। আঙ্গুল চাটল। প্যান্টে হাত মুছল। মাথার চুলে আঙ্গুল চালাল। তারপর উঠে দাঁড়াল। সঙ্গীরাও তাই করল।

একটা দল চলে গেছে। মাদালা আগের জায়গায় এসে বসল। সেই ছোকরাটা তখনও ওখানে বসে আছে। মাদালাকে দেখে হাসল। চতুর হাসি। বলল, মাদালা তোমার মেয়ে তো সাহেবের সঙ্গে গল্পগাছা করছে। একজন মন্তব্য করল. অবুঝের মত কিছু বলা উচিত নয়। মাদালা নৈঃশব্দ সহ্য করতে পারছিল না। হাতের কাছে আগাছার একটা ঝাড় দেখল। কিছুটা ওপড়ানো। তারপর মাদালা একটানে ওটা তুলে ফেলল। জিমো কাছে এসে বলল, মাদাল তোর ভালোর জন্যে কিছু করতে দিবি ? মাদালা নিরুত্তর।

আলপথ দিয়ে ওভারশিয়ার সাহেব চলেছে। পেছনে মারিয়াও আছে। ওর মাথা হেঁট করা। মাদালা ওদের দুজনকে দেখল। কী এক আক্রোশে আগাছা ওপড়ানোর জন্য ওর হাত নিশ্‌পিশ্ করতে লাগল।

সবুজ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে মারিয়া যাচ্ছে। ভুট্টার চারাগাছগুলো ওর হাঁটু ছাড়ায় নি। দূরে সাহেব দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে আছে মারিয়ার দিকে। মারিয়া থামে।

বল্ না কী করলে খুশী হোস্ ? জিমো বলল।

মাদালা দেখল সাহেব মারিয়ার কাছাকাছি এল। হঠাৎই সাহেব

থামল।

আবার হাঁটতে লাগল। নদী পেরোবে বুঝি? জিমোকে কী বলবে মাদালা? কোন কথাই মনে আসছে না।

সাহেব মারিয়াকে কী ইশারা করল। মারিয়া বুঝল না বোধহয়। মাদালার হাতের মুঠোয় আগাছার ঝাড়। কিন্তু কবিজ অবশ।

মাঠের সবুজ সমুদ্র সাহেব আর মারিয়া ডুব দেয়। ওদের আশেপাশের ভুট্টাগাছগুলি নড়ে ওঠে। জিমো বলল—মাদালা ওদিকে তাকাস্ না। জিমোর গলা যেন একটু কেঁপে ওঠে। মাদালা শরীরের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করে।

আবছা সবজে ছায়ায় মারিয়াকে শোয়ানো হ'য়েছে। মারিয়া সাহেবের মুখের দিকে একবারও তাকাল না। শুধু ছাড়াবার জন্যে পা দুটো ছট্‌ফট করে। ওর কাঁধে বলিষ্ঠ হাতের ছাপ। ওর মুখে পুরুষের নিঃশ্বাস। একটু ধস্তাধস্তি হয়। মারিয়ার পোশাক খুলে যায়। গায়ে ঠাণ্ডা ছোঁয়া। যেন জল। ও কেঁপে ওঠে। শরীরটা কুঁকড়ে যায়। নগ্ন উরুতে পুরুষ স্পর্শ। কর্কশ সোহাগ।

এবার মাদালা চারপাশে তাকাল, ওর দিকে কারো চোখ নেই। তবে ক্ষেত-মজুররা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যেখান থেকে মাদালাকে দেখা যায়। সেই ছোকরাটা দুর্বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক নিঃশব্দ। শুধু মাঝে মাঝে যোশের কাশি শোনা যাচ্ছে।

ওদিকে কামার্ত সাহেবের মুখ এক পলক দেখল মারিয়া, সাদা মুখটায় সবুজে রঙ ধরেছে। মারিয়ার ঠোঁট একটু খোলা। পুরুষের শ্বাস ঢুকছে মুখের মধ্যে দিয়ে শরীরে। একটা ঘূর্ণিঝড়ের দোলায় নিজেকে সঁপে দেয় মারিয়া।

মাদালার হাত যেন কল্পনার আগাছাগুলোর পাতা পিষ্ট করে। একটা ফোঁপানি ওঠে ওর গলায়। জিমো বলে—কাঁদছিস্ কেন? কাঁদিস্‌না।' আরো অনেকে এগিয়ে আসে। সব দলের লোকেরাই ভীড় ক'রে আসে। মাদালাকে ঘিরে ধরে। কল্পনার আগাছাগুলোকে মাদালা আদর করে।

কর্কশকণ্ঠে ওভারশিয়ারসাহেব জিজ্ঞেস করে—'হ্যাঁরে মারিয়া—তুই এখানে এসেছিলি কেন? সাহেবের শরীরের চাপের নীচে মারিয়া হাঁপায়। অনেক দূর থেকে যেন সাহেব কথা বলছে।

—এসব করেন কেন ?' মারিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

—অ—।

—বলুন কেন ?' মারিয়া ঝাঁকুনি দেয় সাহেবকে।

ম অ।' সাহেবের নিস্তেজ হাত মারিয়ার বুকে। এবার সাহেব দ্রুত উঠে পড়ে। বলে—'মজা পাস্‌ নি মনে হচ্ছে।' প্যাণ্ট ঠিক করতে করতে বলে—'নে ওঠ্‌। খেল্‌ খতম।'

মাঠে আবছা আলো। সেই আলোয় জ্বলে ওঠে মারিয়ার চোখ। মারিয়া বলে—'এভাবে ভাল লাগে না। রাত্তিরে ভালো লাগে।' হঠাৎ মারিয়া আতংকগ্রস্ত হয়। বলে—'কিন্তু মাদালার চোখে পড়েছে সব। আপনি কথা দিয়েছিলেন রাতের বেলা সব হবে।'

নে উঠে পড় ছুঁড়ি। এখুনি পয়সা দিচ্ছি যা।' সাহেব বলল। মারিয়া এতক্ষণে শরীরের নীচের মাটির কাঠিন্য অনুভব করল।

সবুজ সমুদ্রের ঢেউ থেকে প্রথম মাথা তুলল সাহেব। দু'হাতে ভুট্টাগাছ সরাতে সরাতে ক্যাম্পে চলল সাহেব। মারিয়াও মাথা তুলল। সবুজ সমুদ্রের ওপর দিয়ে ব'য়ে—যাওয়া হাওয়ায় বিলাপের ধ্বনি উঠল। পোশাক থেকে মাটি ঝাড়ল। ক্যাম্পে ফিরে গেল। সব মজুরেরা মারিয়াকে পথ ক'রে দিল। তখনও চারদিক নিশব্দ। মারিয়া গন্ধ পায় সবুজ সমুদ্রের ?

সেই ছোকরার মুখের চেহারা বদলে গেছে যেন। মুখে আর বিদ্রুপের হাসি নেই। ঝরে পড়ছে ঘৃণা। কোনরকমে বলল—'মাদালা—ক্ষেতে—বড্ড চড়া রোদ।'

হ্যাঁ রে—বড় তেজ রোদের, শরীর মন দুইই পোড়ায়।' কিছু বলতে হয় তাই মাদালা বলল।

কিন্তু তবু নীরবতা ভাঙতে পারল না মাদালা। মারিয়া তখনও মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে। ক্যাম্পের লোকেরাও তাই। এবার অনেক কষ্টে যেন সেই ছোকরাটা বলল—'মাদালা, আমরা কি কিছুই করতে পারি না ? মাদালা তুমি বলো। আজকে একটা হেস্তনেস্ত হ'য়ে যাক। যদি মারে মারুক—মরণকে কী ভয় ?' সকলের মুখ থেকেই সমর্থনের গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। মাদালা তাকিয়ে ওদের রাগ-চাপা মুখ দেখে। ছোকরাটা বলল—'চোখের সামনে তো দেখলে—বেজম্মা তোমার মেয়েকে নিয়ে কী করল। কিছু বলো মাদালা —বলো কিছু।' মাদালার মন প্রায় মরে গেছে তখন।

তখন গোয়ালঘরের কাছে সাহেব মারিয়াকে খুঁজছে। দেখল মারিয়াকে। ওর কোলে একটা রুপোর মুদ্রা ফেলে দিল। বলল—নে তোর পাওনা। সাহেবের চোখেমুখে আত্মতৃপ্তি। মারিয়া হাত বাড়াল। মজুরদের মধ্যে কার কাশির শব্দ শোনা গেল। মারিয়া হাত সরিয়ে নিল। দু'হাত বুকে আড়াআড়িভাবে রাখল।

—কীরে কী হ'ল তোর? সাহেব বিস্মিত।

মারিয়া দেয়ালে ভর দেয়। মুখ সরিয়ে নেয়। মাদালার চোখে বিষন্ন দৃষ্টি।

মারিয়া চোখ বোঁজে। শান্তস্বরে সাহেবকে বলে—সাহেব কেন এটা করলে? কেন?' সাহেব কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল। বলে—'ছুঁড়ি তোর হ'ল কী? টাকা পয়সার দরকার নেই? না নিতে শরম লাগে এ্যাঁ?' মারিয়া কোন কথা বলে না।

সাহেব বলে—'ও—ওরা জেনে ফেলবে যে তুই একটা বেশ্যা।'

তাই ভয়? মারিয়া দু'হাতে নিজের শরীর আরো চেপে ধরে। গলায় ফোঁপানি। বলে—'মাদালা দেখছে যে।'

—তা'তে কী হয়েছে?' সাহেব কাঁধ ঝাঁকায়।

—মাদালা আমার বাপও। মাটিতে থুতু ফেলে মারিয়া। নিজের ওপরেই রাগ হয়। সবাই নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে সাহেবের মুখের দিকে, খুঁটিয়ে দেখে। সাহেব গলা চড়িয়ে বলে—

—কী বললি? উত্তেজিত সাহেবের মুখ চোখ লাল। বলে—'আমি জানতাম না সত্যিই জানতাম না—তোর একটা মেয়ে আছে। বেশ সুন্দর মেয়ে—আরে আমি তো ওর বন্ধু।'

সকলের নৈঃশব্দ যেন বিস্ফোরিত হ'তে চায়।

—মাদালা শোন, সাহেব বলে—'আজ আর তোকে কাজ করতে হবে না। মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প কর।

মাদালার চোখের দৃষ্টি বিষাদগ্রস্ত। কম্পিত আগাছা টেনে তোলার জন্যে হাত নিশ্‌পিশ করে ওঠে। সাহেব নীরবতা সহ্য করতে পারে না। মিটমাটের আশায় ওদের দিকে তাকায়। ভগ্নকণ্ঠে ব'লে ওঠে, শালা গব্বোস্রাব।

সকলেই চুপ, কিন্তু অনমনীয়। সাহেব একটু আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে বলে ওঠে 'গব্বোস্রাব', চেঁচিয়ে বলে, পয়সা নে মাদালা মেয়েকে নিয়ে খানাপিনা কর গে। মাদালার শরীরে উৎসাহিত হবার কোন চিহ্ন দেখে না। মাদালার মাথা

নীচু। গবেবাগ্রাব মাদালা। কথাটা বলে সাহেব গোলাঘরের পেছনে চলে যায়।

সেই যুবকটির উচ্চ কণ্ঠস্বরে এবার নীরবতা ভেঙে যায়—'দেখলে তো মাদালা, তোমার মেয়েকে কী করলো লোকটা ? আমরাও দেখলাম। ওর কথা আর সবই নীরবে সমর্থন জানায়। মারিয়া এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। মাদালার মাথা আরো ঝুঁকে পড়ে।

সাহেব ফিরে এল, হাতে এক বোতল মদ। গলায় জোর দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, দেড়টা বেজে গেছে, মাঠে চল সব, কাজে লাগ, কই চল সব। নদীর ধার সাফ কর, বাঁধাকপির পোকা বাছ, গরুগুলোকে জল খাইয়ে আন, চল মাঠে চল সব।

সবাই দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে মাদালা কল্পনায় আগাছার পাতা পেষে হাতে।

—কী রে কী বলছি শুনলি না ? ঘণ্টা বাজল, ফিনার সময় খতম, খেঁচিয়ে ওঠে সাহেব, মাদালা উঠে দাঁড়ায়।

— কথা কানে যাচ্ছে না ? কাজে লাগ শুয়োরের বাচ্চারা যা।

সাহেব গলা ফাটিয়ে বলে।

মাদালা সাহেবের হাত থেকে মদের বোতলটা নিল।

সব ক্ষেতমজুররা মাদালার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছোকরাটি একটু এগিয়ে এসে ডাকে 'মাদালা'।

মাদালা সকলের দিকে তাকায়, কেমন একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে সেই দৃষ্টিতে বোতল খুলল ও, ময়লা লাল মদ ঢালল মুখে, ঢকঢক করে। উপচে পড়া মদ ওর দাড়ি ভিজিয়ে দিল, ঘাড় পর্যন্ত চুইয়ে পড়ল, সাহেব হেঁকে উঠল, 'কাজে লাগ, শালা বেজম্মরা।

এবার সবাই নড়েচড়ে উঠল. নৈঃশব্দ ভেঙে যায়, মারিয়া ভীতচোখে সব দেখে, সাহেব খালি বোতলটা নিয়ে ঘোরায়, বলে ওঠে শালা বেজম্মার দল, কালা আদমি. সেই ছোকরাটি মাদালার পায়ের কাছে থুতু ফেলল। বলল, কুত্তা, কুত্তাকাহিকা, এই অপমান মাদালা গায়ে মাখে না, পেছন ফেরে, পা চালায় ক্ষেতের দিকে, পেছনে নগুইআনা ফিলিমোন।

সকলের দিকে তাকায় জিমো, বলে—'চল রে,' সাহেব চেঁচিয়ে বলে, 'জলদি কুইক', জিমোর পিছু পিছু সবাই কাজে নেমে পড়ে।

ছোকরাটার মাথায় পড়ল বোতলের ঘা, বোতল ভেঙে চৌচির। ছোকরাটা

অনড় দাঁড়িয়ে রইল, আর একটা বোতলের ঘা, মাথা ফেটে রক্ত ছুটল, সাহেব ওর মুখে পায়ের বুট চেপে ধরল, বুনো জানোয়ারের মত সাহেব চীৎকার করে উঠল, 'শালা বেশ্যার বাচ্চা।'

ওদিকে মাদালা শরীর ঝোঁকাল, একটা আগাছার ঝোপ ধরে টান মারল, দেখল গোড়াটা কত শক্ত। তারপর একটু পেছনে বেঁকে মারল টান, আগাছার ঝোপ মাটি থেকে উঠে এল, আগে যে আগাছাগুলো তুলে সার সার সাজিয়ে রেখেছিল, তার পাশেই এই আগাছাটা সাজিয়ে রাখল, মাথা উঁচু করে দেখল চারদিকে—কর্মরত সবাই জিমো, ফিলিমোন, নগুইআনা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক থেকে. কাজে হাত লাগাল আবার।

মানুষগুলো যেন মাছ, সবুজ সমুদ্রে মৃদু হাওয়া ঢেউ তোলে, ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, ভেঙে পড়ে, কোথা থেকে শোনা যায় শাঁখের আওয়াজ, সমুদ্রের শাঁখ।

———